A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

টোটেম ও টাবু

ভাষান্তর

ধনপতি বাগ

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

টোটেম ও টাবু

ভাষান্তর

ধনপতি বাগ

সুবর্ণরেখা ॥ কলিকাতা

Bengali Translation of Sigmund Freud's *Totem and Taboo*.

প্রথম প্রকাশ—১৯৯৩

প্রচ্ছদ : বিমল মজুমদার

মূল্য : ৫০·০০ টাকা

ইন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক সুবর্ণরেখা, ৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড কলিকাতা ৭০০০০৯
হইতে প্রকাশিত। শান্তিরাম দত্ত কর্তৃক মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০, ডক্টর ডি. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র
ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ
স্মরণে

নিবেদন

আমার পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র মশায়ের আদেশ এবং নির্দেশ পেয়ে 'টোটেম ও টাবু'-র অনুবাদ শুরু করি ১৯৫০ সালে। পরবর্তীকালে চিত্ত[১] পত্রিকায় এটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই কাজটি শিক্ষিত সমাজে উচ্চ প্রশংসিত হয়। এই অনুবাদ 'চিত্ত'-র পাঠকসমাজের মধ্যেই থেকে যায় বহুদিন।

এরপর নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিকের আগ্রহাতিশয্যে এবং সুবর্ণরেখার অধ্যক্ষ ইন্দ্রনাথ মজুমদারের আনুকূল্যে এই পুস্তকটি প্রকাশের চেষ্টা চলে কিছু-দিন থেকে। যাঁরা ডঃ সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনোবিজ্ঞান তথা মনঃসমীক্ষণ সাহিত্যের পাঠক তাঁদের কাছে অনেক বিষয় বেশ দুরূহ লাগে। এই দুরূহতা অনেকটা সহজ হবে যদি 'টোটেম ও টাবু'[২] পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে পড়ার চেষ্টা করেন। এই পুস্তকটিতে ডঃ ফ্রয়েড তাঁর কঠিন তত্ত্বগুলির মূল অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। আমি অনুবাদক হিসাবে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি তাঁর বক্তব্যকে সঠিক রেখে সহজ করে প্রকাশ করার। এ কাজে আমি বিশেষ করে ডঃ মিত্র ও ডঃ সিংহ এই দুই অভিজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায্য নিয়েছি। পরিভাষা যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত, সেইগুলি যথেষ্ট না হওয়াতে আমাকে অনেকগুলি তৈরী করে নিতে হয়েছে, এবং সেগুলি অধ্যাপকদের সম্মতি অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশনার কাজে বিশেষ করে পাণ্ডুলিপি তৈরীতে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি অনু-লেখিকা শ্রীমতী উজ্জলা উপাধ্যায় এবং সম্পাদনায় শ্রীঅনাথনাথ দাস-এর কাছে। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিনীত

ধনপতি বাগ

---

১. ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা। ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতির মুখপত্র; ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত।

১. New York-এর Modern Library প্রকাশিক "The Basic writings of Sigmund Freud" Dr. A. A. Brill কর্তৃক মূল জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুদিত পুস্তক থেকে গৃহীত।

প্রথম অধ্যায়

বর্বরের আচার-ভীতি

ক্রমোন্নতির পথে যে সমস্ত ধাপ আদিম অধিবাসীরা অতিক্রম করেছে সেই সবের মাধ্যমেই আমরা তাদের জানতে পারি। যেমন জড় পদার্থের মধ্যে যাবতীয় স্মারক-চিহ্ন, তাদের ব্যবহৃত নানা প্রকারের সরঞ্জাম, তাদের শিল্প ও তাদের ধর্ম, এবং যে দৃষ্টিতে তারা জীবনকে দেখেছে—তা-ও। এ-সবের কতকগুলি আমরা প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি, আবার কতকগুলি জানতে পেরেছি নানা পুরনো কাহিনী, পৌরাণিক গল্প বা রূপকথার মাধ্যমে এবং তাদের চিন্তাধারার অবশিষ্টাংশ যা আজও আমাদের আচার ব্যবহার ও সামাজিক প্রথার মধ্যে বেঁচে রয়েছে, তা থেকে। এ ছাড়া একদিক থেকে তারা আজও আমাদের সমসাময়িক। কেননা, পৃথিবীতে এখনও এমন মানুষ আছে যাদের সম্পর্ক আমাদের চেয়ে আদিযুগের মানুষের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ, এবং যাদেরকে আমরা প্রাথমিক মানবের সোজাসুজি অধস্তন পুরুষ ও প্রতিনিধি ব'লে চিনতে পারি এইভাবে আমরা তথাকথিত বর্বর ও আধা-বর্বর জাতিকে তফাত করতে পারি। তাদের মানসিক জগৎ আমাদের মধ্যে এক অদ্ভুত কৌতূহল জাগ্রত করে। কেননা, তাদের মনোজগতের মধ্যে আমরা আমাদের মনোজগতের ক্রমোন্নতির পর্যায়গুলিকে সুরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাই।

এই ধারণা যদি নির্ভুল হয় তবে লোকশ্রুতি-বর্ণিত আদিম মানবের মানসিকতার সঙ্গে, মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিকৃতমন বা নিউরটিক ব্যক্তির মানসিকতার তুলনা করলে অসংখ্য মিল পাওয়া যাবে; এবং যেসব বিষয় অল্পবিস্তরভাবে আমাদের পরিচিত তাদের সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত হবে।

অস্ট্রেলিয়া নবীনতম মহাদেশ। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় কারণেই আমি অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদের সঙ্গে নিউরটিক ব্যক্তিদের তুলনা করব। জাতিবিদ্যা-বিশারদগণ এই মহাদেশের আদিম জাতিদের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত ও অ-মানুষ বলে বর্ণনা করেছেন। এই দেশের সংরক্ষিত প্রাণিজগতের বৃত্তান্ত থেকে আমরা আজ পর্যন্ত যা জেনেছি তার চেয়ে পুরনো ইতিবৃত্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

অস্ট্রেলিয়ার এই আদিবাসীদের এক অদ্ভুত জাত বলে গণ্য করা হয়। এদের সব-চেয়ে নিকট অধিবাসী মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া ও মালয়বাসীদের সঙ্গে এদের আকৃতিগত বা ভাষাগত কোনো বিষয়েই মিল নেই। এরা বাড়িঘর, এমনকি স্থায়ী কুঁড়েঘরও তৈরি করতে পারে না। এরা চাষ-আবাদ করতে জানে না, কুকুর ছাড়া অন্য কোনো গৃহপালিত পশুও পোষে না; এমনকি এরা মৃৎশিল্পও জানে না। এরা নানাধরনের পশু শিকার করে এবং মাটি খুঁড়ে শিকড় তোলে। ওই সব পশুর মাংস ও গাছের মূল খেয়েই এরা জীবন ধারণ করে। রাজা বা সর্দারের প্রচলন এদের মধ্যে নেই। নিজেদের দলীয় সবকিছু বিষয়ই দলের বয়োজ্যেষ্ঠরাই একসঙ্গে বসে স্থির

করে দেয়। উচ্চস্তরের কোনো কিছু পূজার দ্বারা এরা যে কোনো ধর্ম পালন করে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এদের মধ্যে যারা গভীর অরণ্যে বাস করে জলের অভাবে তাদেরকে তীরভূমিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি দুঃখকষ্ট সহ্য করে থাকতে হয়।

এই সব হতভাগ্য উলঙ্গ নরখাদকরা যে তাদের যৌনজীবনে আমাদের মতো নীতি-রক্ষা করে চলবে বা যৌন-আবেগ সম্বন্ধে খুব বেশি সংযম রক্ষা করবে, এমন আশা আমরা নিশ্চয় করি না। কিন্তু জানা গেছে যে তারা অজাচারীয় (incestuous) যৌনসম্বন্ধ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং এ-সম্বন্ধে খুব কঠিন নিয়ম পালন করা উচিত বলে মনে করে। সত্যি বলতে কি, এদের সমগ্র সামাজিক কাঠামোটাই গড়ে উঠেছে এই উদ্দেশ্যকে উপলক্ষ করে; কিংবা, এই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সমস্ত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা টোটেম ব্যবস্থার অনুশাসনেই চালিত হয়ে থাকে। এরা ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দল নিজ নিজ টোটেমের নামে পরিচিত। এখন দেখা যাক, টোটেম বলতে ঠিক কী বোঝায়। টোটেম কোনো প্রাণী হবে, এটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। টোটেম ভক্ষণীয় কিংবা খুব নিরীহ জীব থেকে শুরু করে ভয়ঙ্কর এবং ভীতিকারক প্রাণীও হতে পারে। ক্বচিৎ কোনো গাছ বা প্রাকৃতিক শক্তিও (বৃষ্টি, জল) টোটেম হয়। এই টোটেমের সঙ্গে গোষ্ঠীর একটা অদ্ভুত রকমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। টোটেমই গোষ্ঠীর আদি পুরুষ। সেই-ই দৈবশক্তি স্বরূপ ও গোষ্ঠীর রক্ষাকর্তা। পৃথিবীতে টোটেমই পাঠায় অবতার এবং অন্যান্য বিষয়ে ভয়ংকর হলেও সে তার বংশধরদের চেনে এবং তাদের কোনো ক্ষতি করে না। তেমনি টোটেমের বংশধররাও পবিত্র দায়ে বদ্ধ থাকে; তারা তাদের টোটেমকে হত্যা বা ধ্বংস করবে না, তার মাংস খাবে না বা তাকে অন্য কোনো ভোগের বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। এরূপ নিষেধের কোনো ব্যতিক্রম হলে শাস্তির ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে থাকে। টোটেমের স্বভাব কেবল একটা জন্তু বা জীবের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, পরন্তু বংশের প্রত্যেক সভ্যের মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। মাঝে মাঝে উৎসব হয়। নৃত্য এই উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। টোটেমের সভ্যতা তাদের টোটেমের চাল-চলন এবং বৈশিষ্ট্যকে নকল করে এই নাচের মধ্যে রূপ দেয়।

টোটেম হচ্ছে বংশানুক্রমিক; হয় মায়ের বংশ থেকে, নয়তো বাপের বংশ থেকে পাওয়া। সম্ভবত মায়ের দিক থেকেই প্রথমে শুরু হয়ে থাকবে এবং পরে পিতৃবংশ তার স্থান দখল করে থাকবে। অস্ট্রেলিয়াবাসীদের সমস্ত সামাজিক রীতিনীতির ভিত্তি হচ্ছে তাদের টোটেমের প্রতি অনুরক্তি। এই অনুরক্তি একদিকে যেমন জাতি-সম্পর্কেরও বেশি, অন্যদিকে তেমনি রক্ত-সম্পর্কেরও বাড়া[১]।

টোটেম ছোট-বড় কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় আবদ্ধ থাকে না। এর বংশধরেরা

১. Frazer, Totemism and Exogamy, Vol. I, Page 53.
'রক্ত-সম্পর্কে চেয়েও টোটেম-সম্পর্ক জোরালো।'

পরস্পর আলাদা হয়ে এবং অন্যান্য টোটেমের লোকদের সঙ্গে মিলে মিশে বন্ধুভাবে বাস করতে পারে[২]।

টোটেম প্রথার যে-দিকটা মনঃসমীক্ষকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে সেই দিকটার বিষয়ে এখন সবশেষে আমরা আলোচনা করব। টোটেম প্রথার চলন যেখানেই আছে সেইসব জায়গায় প্রায় সর্বত্রই একটি নিয়ম প্রচলিত আছে—সেটা হচ্ছে, একই টোটেমের ব্যক্তিরা পরস্পর যৌন-সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারবে না ; অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিবাহ হতে পারবে না। এইখানেই বহির্বিবাহের (exogamy) সঙ্গে টোটেমের সম্বন্ধ।

দৃঢ়তার সঙ্গে পালিত এই নিয়মটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতক্ষণ পর্যন্ত টোটেমের প্রকৃতি বা গুণাবলি সম্বন্ধে যা জানা গেল তার সঙ্গে এই কঠোর নিয়মের কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। সেইজন্য বোঝা যায় না, এরূপ নিয়ম কেমন করে টোটেম ব্যবস্থার মধ্যে স্থান পেল। সেইজন্যই যখন দেখি কোনো অনুসন্ধানী ধরে নেন যে প্রথমে বহির্বিবাহের সঙ্গে—এর উৎপত্তি ও তাৎপর্য উভয়ের সঙ্গেই—টোটেমের কোনো সম্পর্কই ছিল না, পরে যখন বিবাহ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের প্রয়োজন হয়েছে, তখন এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র—গভীরভাবেই মোটেই যুক্ত নয়—তখন আমাদের বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। সে যাই হোক, টোটেম ব্যবস্থা ও বহির্বিবাহের সঙ্গে সম্পর্ক আছেই এবং সে সম্পর্ক বেশ দৃঢ়।

এই নিষেধের আসল অর্থ কী আরও একটু আলোচনা করে দেখার চেষ্টা করা যাক।

ক. এই নিষেধের অন্যথা করলে তার শাস্তির ব্যবস্থা গতানুগতিক নিয়মের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় না, যেমন নাকি টোটেমের অন্যান্য নিষেধ (যথা, টোটেম-প্রাণী হত্যা না করা) সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে সমস্ত গোষ্ঠী একসঙ্গে তার প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়। এ যেন এমন একটা বিপদ যা সমস্ত গোষ্ঠীকে আচ্ছন্ন করতে পারে,

---

২. আরও কিছু ব্যাখ্যা এবং আলোচনার সীমার কথা না বলে টোটেম ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার এইখানেই শেষ করা যায় না। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে জে. লঙ্ নামে এক ইংরেজ সর্বপ্রথম উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে টোটেম বা টোটাম কথাটি জেনেছিলেন। আস্তে আস্তে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে এবং এ-বিষয়ে প্রচুর সাহিত্য জমে ওঠে। আমি বিশেষ করে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জে. বি. ফ্রেজারের Totemism and Exogamy পুস্তকের চার খণ্ডও অ্যান্ড্রু ল্যাঙ্ সাহেবের বই (The Secret of Totem. 1905) প্রবন্ধগুলির কথা উল্লেখ করছি। স্কটল্যাণ্ডবাসী জে. ফারগুসন ম্যাক্‌লেনান মানুষের প্রাচীন ইতিহাসের জন্য টোটেম প্রথার বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করেছিলেন (Fortnigtly Review. 1869-70), এ প্রশংসা তারই প্রাপ্য। অস্ট্রেলিয়ার বাইরে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে, পলিনেশিয় দ্বীপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে, পূর্ব ভারতে এবং আফ্রিকার নানা জায়গায় টোটেমীয় সংস্থা ছিল, এবং এখনও দেখা যায়। আজও টিঁকে আছে এমন বহু চিহ্ন ও স্মারক যাদের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা খুব শক্ত। সেগুলিকে প্রমাণ করে যে, আদিম আর্যদের মধ্যে এবং য়ুরোপের সেমিটিক জাতিদের মধ্যেও টোটেম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এর থেকেই বহু গবেষক মনে করেন টোটেম ব্যবস্থা মানবীয় বিকাশের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় স্তর, যা প্রত্যেক জাতিই তার ক্রমবিকাশের পথে অতিক্রম করেছে।

তাহলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ কী করে টোটেমকে পেল? অর্থাৎ কেমন করে সে তার বংশধরদের (অধস্তন পুরুষদের) কোনো একটি পশুর মারফৎ সামাজিক রীতিনীতি এবং যৌন

যার দ্বারা সমগ্র গোষ্ঠীর অকল্যাণ হতে পারে ; অতএব তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার সমস্ত দায়িত্ব সকলের। ফ্রেজার সাহেবের পুস্তকের[৩] কয়েকটা লাইন পড়লে বোঝা যায় যে, যাদের আমরা আমাদের মান অনুযায়ী দুর্নীতিপরায়ণ বলে থাকি সেই অসভ্য জাতিরাই এরূপ নিয়ম ভঙ্গের জন্য কত কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে।

'অস্ট্রেলিয়াতে নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর কোনো লোকের সঙ্গে রতিক্রিয়ার জন্য শাস্তি হচ্ছে প্রাণদণ্ড। স্ত্রীলোকটি স্থানীয় কোনো দলভুক্তই হোক বা যুদ্ধবিগ্রহকালে অন্য কোনো গোষ্ঠী থেকে অপহৃতই হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না। যে অপরাধী পুরুষটি,ঐ স্ত্রীলোকটিকে পত্নী হিসাবে ব্যবহার করবে তাকে তার জ্ঞাতিরা খুঁজে বার করবে এবং হত্যা করবে। স্ত্রীলোকটির পক্ষেও বিধান তাই। যদিও, যেসব ক্ষেত্রে অপরাধীরা পালিয়ে গিয়ে কিছুদিনের জন্য লুকিয়ে থাকতে পারে সেই সব ক্ষেত্রে তাদের অপরাধ উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। নিউ সাউথ ওয়েল্সের তা তা থি (Ta Ta Thi) জাতির মধ্যে যদি ক্বচিৎ এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে পুরুষটিকে হত্যা করা হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে একেবারে মেরে ফেলা হয় না। তবে মৃতপ্রায় না হওয়া পর্যন্ত তাকে হয় প্রহার করা হয়, নয়তো বর্শাবিদ্ধ করা হয় ; কখনো-বা উভয় প্রকার শাস্তিই দেওয়া হয়ে থাকে। কেন একেবারে মেরে ফেলা হয় না, তার যুক্তি স্বরূপ বলা হয় যে, হয়তোবা সে পুরুষটি কর্তৃক পীড়িত হয়ে কুপথে আসতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি সাময়িক প্রেমের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞার কড়াকড়ির শেষ নেই। এই বিধি-নিষেধের কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে 'অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় বলে ধরা হয় এবং তার পরিণাম হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড' (Howitt)।

জীবনের বিধিনিষেধের (যা আমরা পরে জানতে পারছি) গঠন করতে শেখাল ? এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন রকমের অনেক সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়েছে। এই সবের আলোচনা পাঠক Wundt লিখিত Voelkerpsychologie (Vol. II ; Mythus and Religion) আলোচনা গ্রন্থে দেখতে পাবেন।

শীঘ্রই আমি টোটেমীর সমস্যাকে একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করব, যেখানে মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতির প্রয়োগ করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। (এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

টোটেমীর সিদ্ধান্তগুলি শুধু যে পরস্পর-বিরোধী তা নয়, এ সম্বন্ধে তথ্যাবলি আমরা যেভাবে উল্লেখ করলাম, সাধারণভাবে এরূপ মন্তব্য করা চলে না বললেই হয়। যেসব মন্তব্য জোর দিয়ে বলা হয়েছে তার মধ্যে এমন কোনো মন্তব্য আছে কিনা সন্দেহ, যেখানে ব্যতিক্রম বা মতদ্বৈত নেই। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, সবচেয়ে আদিম ও গোঁড়া জাতও, কোনো এক অর্থে, এত প্রাচীন এবং তার পিছনে এত বেশি অতীত রয়েছে যেজন্য তাদের ভিতরের যা কিছু আদিমত্ব ছিল তার খুব বেশি উন্নতি এবং বিকৃতি ঘটে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। এই জন্য যে সমস্ত জাতির মধ্যে এখনও এর অস্তিত্ব দেখা যায় সেখানে টোটেম ব্যবস্থা নানাভাবে লুপ্ত ও বিভক্ত হতে চলেছে। দেখা যায় এদের টুকরো-টাকরা অংশ অন্য সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্থার মধ্যে চলে গেছে। কিংবা হয়তো পূর্ব রূপই বজায় আছে, তবে তার আসল প্রকৃতির অনেক বদল হয়েছে। এখন মুশকিল হচ্ছে এই যে, অতীতের অভিজ্ঞাপক হিসাবে কোন্‌টা এর বিশ্বাসযোগ্য রূপ এবং কোন্‌টাই বা এর পরবর্তীকালের বিকৃত রূপ তা ঠিক করা খুব সহজসাধ্য নয়।

৩. Frazer, l.c, p. 54.

খ. সাময়িক প্রেমের ক্ষেত্রে—যেখানে সন্তান জন্মের প্রশ্ন নেই—ঐ একই কড়া শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা যে শুধু ব্যবহারিক সুবিধার কথা ভেবে অবলম্বন করা হয়েছে, তা মনে হয় না।

গ. টোটেম পুরুষানুক্রমিক ব্যবস্থা। বিবাহের দ্বারা তার বদল হয় না। এতএব এই নিষেধের ফলাফল—যদি মাতৃ-বংশগতির (**maternal heredity**) কথাই ধরা যায়—সহজেই অনুমেয়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে—পুরুষটি এমন গোষ্ঠী-ভুক্ত, যার টোটেম হচ্ছে ক্যাঙারু, সে বিয়ে করল এমন স্ত্রীলোককে যার টোটেম হচ্ছে এমু। তা হলে মাতৃবংশগতি অনুসারে তাদের পুত্রকন্যা সকলকেই টোটেম হবে এমু। টোটেম নিয়ম অনুযায়ী, মা এবং বোন প্রত্যেকের সঙ্গে ছেলের অজাচার-সম্পর্ক; কেননা, তারা সকলেই এমু-টোটেমভুক্ত। অতএব এ ক্ষেত্রে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হতেই পারে না[৪]।

ঘ. কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, শুধু মা এবং বোন সম্পর্কে অজাচার সম্পর্ক দূর করা ছাড়াও টোটেমের সঙ্গে জড়িত বহির্বিবাহ (**exogamy**) আরো কিছু কাজ করে থাকে। কোনো লোকের পক্ষে তার দলের যে-কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব তো বটেই, এ ছাড়া এমন বহু স্ত্রীলোক আছে যাদের সঙ্গে কোনো রক্ত-সম্পর্ক নেই অথচ রক্ত-সম্পর্ক থাকলে যেরূপ ব্যবহার করা দরকার সেইরূপ ব্যবহার করতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ অসাধারণ কঠোর শাসনের, যার সঙ্গে সভ্যজাতির নিয়মের তুলনা হতে পারে না, কোনো উপযুক্ত মনোবিদ্যক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এর থেকে আমরা এই বুঝব যে, পূর্ব-পুরুষরা টোটেমের (ঐ প্রাণীর) কার্যাবলিতে খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করতেন। একই টোটেম-সম্ভূত প্রত্যেক লোকই জ্ঞাতি, অর্থাৎ একই পরিবারভুক্ত। এবং এই পরিবারের সবচেয়ে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতির সঙ্গেও যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে এক বিরাট বাধা বর্তমান।

অতএব এই অসভ্যদের আচার-ব্যবহার থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাদের অজাচার-ভীতি বা অজাচার সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা অসাধারণ রকমের প্রকট। এর সঙ্গে আবার যুক্ত রয়েছে রক্ত-সম্পর্কের পরিবর্তে টোটেম-সম্পর্ক প্রচলনের এক অদ্ভুত প্রথা, যেটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়। কিন্তু এই বৈষম্য নিয়ে আমাদের বেশি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এবং টোটেম-নিষেধের অন্তর্ভুক্ত সত্যিকারের অজাচারকে একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের মনে করা উচিত।

---

৪. কিন্তু পিতা, যার টোটেম ক্যাঙারু তার অন্ততপক্ষে এই নিষেধবিধি অনুযায়ী কন্যাদের সঙ্গে অজাচারিতা করার স্বাধীনতা আছে; কেননা, কন্যার টোটেম হচ্ছে এমু। পৈতৃক উত্তরাধিকার অনুযায়ী কী হয় দেখা যাক। পিতার টোটেম হচ্ছে ক্যাঙারু। অতএব এক্ষেত্রে পুত্র-কন্যাদের টোটেম হবে ক্যাঙারু। তখন কন্যাদের সঙ্গে পিতার হবে অজাচার সম্পর্ক, অতএব নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এক্ষেত্রে পুত্রের সঙ্গে মাতার অজাচারিতা টোটেম রীতিবিরুদ্ধ হবে না। টোটেম রীতির এই ফলাফল দেখে মনে হয় পৈতৃক উত্তরাধিকারের চেয়ে মাতৃক উত্তরাধিকার পুরানো। কেননা, পুত্রের অজাচার-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যে টোটেম নিষেধবিধি সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়েছে এ-কথা ধরে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

পারিবারিক সম্পর্কের স্থলে টোটেম-সম্পর্ক যে কীভাবে স্থাপিত হল সে এক রহস্য। এর সমাধান সম্ভবত টোটেমের ব্যাখ্যার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বিবাহ-বন্ধন, রক্ত-সম্পর্ক ও তারই সঙ্গে অজাচার নিষেধের গণ্ডির বাইরে যেটুকু যৌন-স্বাধীনতা আছে তা এতই অনিশ্চিত যে, এ সম্বন্ধে নিষেধবিধির আরও কারণ থাকতে পারে, সে কথা আমরা স্বীকার করতে পারি না। অতএব নারীর উপর পুরুষের দাম্পত্যাধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন যেসব সামাজিক নিয়ম ও প্রমোদানুষ্ঠানাদি অস্ট্রেলিয়ার প্রথায় স্বীকৃত সেগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ করা নিশ্চয়ই অবান্তর হবে না।

অস্ট্রেলিয়ার এই সব জাতি ও আরও অন্যান্য টোটেম-জাতির ভাষার ব্যবহারের মধ্যে যেসব প্রথার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে, যার কথা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝানোর জন্য যে সমস্ত সম্বোধনবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলি দুজন ব্যক্তির মধ্যে আসল সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে ঠিক করা হয় না। পরন্তু, এই সম্বোধনবাচক শব্দগুলি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তার জ্ঞাতি বা দলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এল. এচ. মর্গান সাহেবের মতো এগুলি 'শ্রেণীবিভাগ' (classiflying) তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। তার অর্থ, কোনো লোক যে শুধু তার পিতাকেই পিতা বলে তা নয়, যে-কোনো লোক তার মাতাকে বিবাহ করতে পারত এবং তার জন্মদাতা হতে পারত, তাকেই পিতা বলে থাকে। তেমনি শুধু গর্ভধারিণী মাকেই মা বলে না, পরন্তু জাতির আইন-কানুন অমান্য না করে যার পক্ষে তার মা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাকেই মা বলে থাকে। ভাই এবং বোন শুধু যে নিজের জন্মদাতার সন্তানদেরই বলে থাকে তা নয়; যে সমস্ত ব্যক্তি পিতৃদলের অন্তর্ভুক্ত তাদের ছেলেমেয়েদেরও ভাই বা বোন বলে অভিহিত করে থাকে। এরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। অতএব, দুজন অস্ট্রেলিয়াবাসী যে জ্ঞাতি নামে পরস্পরকে সম্বোধন, তার, আমাদের ভাষার নিয়মানুযায়ী যে অর্থ, তাদের ক্ষেত্রেও যে সেইরূপ রক্ত-সম্পর্ক সূচিত করবেই এমন কোনো কথা নেই। তাদের সম্পর্ক যত না দৈহিক তার চেয়ে বেশি সামাজিক। এই শ্রেণীবিভাগতন্ত্রের হদিশ খুব সম্ভবত আমাদের শিশু-নিকেতনগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। এই অবস্থায় শিশু প্রত্যেক পুরুষকে 'কাকা', 'মেসো' (uncle) ইত্যাদি, এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোককে 'মাসিমা', 'পিসিমা' (aunt) ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে। কিংবা, আমরা যখন বলি **'Brothers in Apollo'** বা **'Sisters in Christ'** তখন একটা আরোপের ভাব নিয়ে ঐ অর্থই প্রকাশ পায়।

এই ভাবাগত রীতি, যা খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা খুব সহজ হয়ে যাবে, যদি আমরা রেভারেণ্ড এল. ফিসন উল্লিখিত সংঘ-বিবাহ (**Group marriage**) প্রথার কথা স্মরণ করি। এই নিয়মকে উপরোক্ত বিবাহ-প্রথারই শেষ পর্যায় ও শেষ চিহ্ন হিসাবে ধরা যেতে পারে। সংঘ-বিবাহ প্রথার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একদল লোক একদল স্ত্রীলোকের উপর বৈবাহিক অধিকার ভোগ করে॥ এই সংঘবিবাহ-প্রসূত সন্তান-সন্ততির, যদিও তারা বিভিন্ন মাতার সন্তান, তবুও পরস্পরকে ভাই-বোন সম্বোধন করার অধিকারী হয়। এবং এরা দলের প্রত্যেক পুরুষকেই বাবা বলে সম্বোধন করে থাকে।

অনেকেই এই উপসংহারে আপত্তি করেছেন। উদাহরণ স্বরূপে বি. ওয়েস্টার-মার্কের **মানব বিবাহের ইতিহাস** (*History of Human Marriage*) পুস্তকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু যাঁদের মত সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলে ধরা হয়, তাঁদের অভিমত হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জ্ঞাতিনামের সূত্রপাত সংঘবিবাহ প্রথা থেকেই। স্পেনসার (Spencer) এবং গিলেন[৫] (Gillen)-এর মতে উরেবুন্না (Urabunna) ও ডিয়েরি (Dieri)-র অধিবাসীদের মধ্যে যে এখনো সংঘবিবাহ প্রচলিত রয়েছে তা প্রমাণ করা যায়। অতএব প্রমাণ হয় যে, ব্যক্তিগত বিবাহ প্রচলিত হবার আগে সংঘবিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং এখনও ভাষা ও সামাজিক প্রথার মধ্যে এর নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

যদি ব্যক্তিগত বিবাহ সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আমরা এই সব আদি জাতিদের মধ্যে যে অত্রাচার বর্জনের বিষয় লক্ষ করেছি তার আপাতবুদ্ধির কারণ বুঝতে পারব। বংশের বাইরে বিবাহের বাধ্যবাধকতা ও একই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তির মধ্যে যৌন-সম্পর্ক নিষিদ্ধতা দলীয় অত্রাচার নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে হবে এবং এই টোটেমীয় বহির্বিবাহ পরে নিশ্চিত নিয়ম হয়ে গিয়েছে ও সেই সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে তার নিশ্চিত উদ্দেশ্যকে।

অস্ট্রেলিয়ার বর্বরদের বিবাহের কঠিন অনুশাসনের কারণ এখন আমরা বুঝেছি বলেই বিশ্বাস। কিন্তু আসল অবস্থাটা প্রকাশ পেলে আরও আশ্চর্য রকমের গোল-মেলে বলে মনে হবে। কারণ অস্ট্রেলিয়াতে খুব কম জাতি আছে যারা টোটেম-নিষেধ ছাড়া আর কোনো নিষেধ মানে। এরা প্রায় সকলেই এমনভাবে সংগঠিত যে এদের দুটো ভাগে বিভক্ত করা চলে। এই ভাগকে বিবাহ-শ্রেণী বা ফ্রাট্রিজ (phratries) বলা হয়। দুই ভাগের প্রত্যেক বিবাহদলই বংশের বাইরে বিবাহ করে এবং টোটেম-দলকে দলভুক্ত করে। সাধারণত প্রত্যেক বিবাহদল দুইটি উপদল বা sub-phratries-এ বিভক্ত হয়। সুতরাং সমস্ত জাতিটি চারটি উপদলে ভাগ হয়ে পড়ে। এইভাবে উপদলগুলি টোটেমদল ও বিবাহদল বা phratries-এর মধ্যে পড়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার আদি জাতিদের দল সংগঠনের ব্যাপারটা বেশ জটিল, তাই একটা বিশেষ ছক এখানে দেওয়া হল—

বিবাহদল (Phratries)

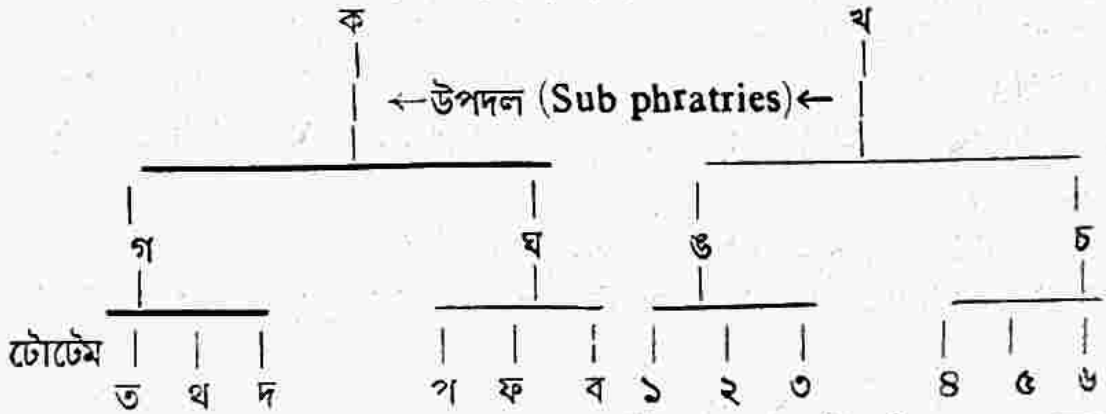

বারোটি টোটেমদলকে চারটি উপদল এবং দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

৫. The Native Tribes of Central Australia (London, 1899.)

সব ভাগগুলি বহির্বিবাহাশ্রয়ী[৬]। 'গ'-উপদলটি 'ঙ'-উপদলের সঙ্গে এবং 'ঘ'-উপদলটি 'চ'-উপদলের সঙ্গে বিবাহাশ্রয়ী হতে পারে। এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা খুবই স্পষ্ট। বিবাহ ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দের উপর এবং যৌন- স্বাধীনতার উপর আরো একদফা অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়। যদি মাত্র বারোটি টোটেমদল থাকত এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে প্রত্যেক দলে একই সংখ্যক ব্যক্তি বর্তমান তাহলে কোনো দলের প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে ১½ জন স্ত্রীলোককে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দুটো প্রধান দল থাকার জন্য এই সম্ভাবনা কমে গিয়ে –½ বা ½ হয়ে যাচ্ছে। 'ত' টোটেমের কোনো পুরুষ কেবলমাত্র '১' থেকে '৬' টোটেমের নারীকে বিয়ে করতে পারে। উপ-দলগুলি থাকার জন্য এই সম্ভাবনা ১½ বা ¾ এ নেমে যায়। 'ত' টোটেমের কোনো পুরুষ বিবাহের জন্য কেবলমাত্র ৪ থেকে ৬ টোটেমদলের নারীদের মধ্যে তার পছন্দকে আবদ্ধ রাখতে বাধ্য।

বিবাহ ব্যবস্থার জন্য কোনো কোনো জাতির মধ্যে আটটি পর্যন্ত শ্রেণীবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা মোটেই পরিস্ফুট নয়। কেবলমাত্র দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থা টোটেমীয় বহির্বিবাহের মতোই এক উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট; এমনকি তার চেয়েও বেশি তৎপর বলা যেতে পারে। টোটেমীয় বহির্বিবাহ-ব্যবস্থাকে একটি পবিত্র আইনের তুল্য মনে হয়—যদিও কেউ জানে না কবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল—তাই এই ব্যবস্থা, বিশেষ প্রথায় এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু বিবাহ-শ্রেণীর গোলমেলে অনুশাসনগুলি তাদের উপশ্রেণীর শর্তাবলী সমেত মনে হয় যেন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। টোটেমের দৃঢ়তা কমে যাওয়ার জন্য মনে হয় তারা আবার নূতন করে অজাচার-নিষেধের কাজ গ্রহণ করেছে। এবং আমরা এও জানি যে, টোটেম যখন জাতির অসমাপ্ত সামাজিক কর্তব্য ও নৈতিক অনুশাসনের মূল ভিত্তি, তখন বিবাহ-নির্বাচন ব্যাপারটা একবার নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলে শ্রেণীবিভাগের গুরুত্ব সাধারণত আর থাকে না। কেননা বিবাহ ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রিত করাই এই শ্রেণীবিভাগে ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

বিবাহ ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগের আরও উন্নত পর্যায়ে দেখা যায় যে, সেখানে যেন স্বাভাবিক এবং দলীয় অজাচার-নিষেধের গণ্ডির বাইরে যাওয়ার ঝোঁক রয়েছে। এবং ক্যাথলিক ধর্মে যেমন ভাই-বোনের বিবাহের নিষিদ্ধতার সীমা জ্ঞাতি ভাই-বোনের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছে এবং তাদের জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞাতি-সম্পর্কের স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি এই ব্যবস্থাতেও আরো দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা আছে[৭]।

বিবাহ-শ্রেণীর উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য এবং তার সঙ্গে টোটেম প্রথার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বিষয়টি খুবই জটিল মনে হবে এবং শেষ পর্যন্ত কোনো

---

৬. টোটেমের সংখ্যা সুবিধামত বেছে নেওয়া হয়েছে।

৭. Article 'Totemism' in 'Encyclopedia Britannica, eleventh edition, 1911 (A. Lang).

মীমাংসাও হবে না। সুতরাং সে আলোচনার মধ্যে দিয়ে কোনো লাভ নেই। অস্ট্রেলিয়াবাসীরা ও আদি জাতিরা অজাচার নিবারণে যে কী পরিমাণ কৃতযত্ন হয়েছে কেবল সেইটুকু দেখালেই আমাদের আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট হবে।[৮] এই অসভ্য জাতিরা যে অজাচার বিষয়ে আমাদের চেয়েও অধিকতর সুবেদী, সে-কথা বেশ জোর দিয়েই বলা চলে। তাদের লোভপরবশতা আমাদের চেয়ে বেশি, এবং সেইজন্যই তাদের পক্ষে অজাচার শাসনের ব্যবস্থা ব্যাপকতর হওয়া প্রয়োজন।

যে সমস্ত বিধিব্যবস্থার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সেইগুলির উপর নির্ভর করেই এদের অজাচার ভীতি ক্ষান্ত হয় না। মনে হয় উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি কেবল দলগত অজাচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। আমরা যাদের নিকট-আত্মীয় বলি, তাদের সঙ্গে ব্যক্তির ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ করে এমন কতকগুলি প্রথা বা বিধিনিষেধও এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই প্রথাগুলির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট এবং এগুলি ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। নিকট-আত্মীয় বা আত্মীয়ার নৈকট্য পরিহার করাই এই সব বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য। এই বিধি-নিষেধগুলি অস্ট্রেলিয়ার টোটেম জাতির বাইরে বহু দূর দেশেও সুপরিচিত। অবশ্য বলে রাখা দরকার যে, এবিষয়ে যে প্রভূত উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে তার কিয়দংশ মাত্র এক্ষেত্রে পরিবেশন করা যাবে।

মেলানেশিয়ায় ছেলেদের পক্ষে মা ও বোনের সান্নিধ্য সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে নিষিদ্ধ। যেমন, নিউ হেব্রাইডস-এর লেপারস্ দ্বীপে ছেলে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর মা'র বাড়ি ছেড়ে সরাইখানাতে (clubhouse) চলে যায়। সেইখানেই সে নিয়মিত আহারাদি করে ও নিদ্রা যায়। এর পরেও সে বাড়ীতে আসতে পারে এবং খেতে চাইতে পারে, তবে তার বোন যদি বাড়ীতে থাকে তাহলে না-খেয়েই তাকে ফিরে যেতে হবে। আর বোন যদি বাড়ির ধারে পাশে না থাকে তাহলে সে দোরগড়ায় বসে খেতে পারে। যদি ভাইবোনে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায় তাহলে বোন দৌড়ে পালাবে, কিংবা ঘুরে দাঁড়াবে ও নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে। যদি ভাই বোনের পদচিহ্ন কোথাও চিনতে পারে তাহলে সে-চিহ্ন সে অনুসরণ করবে না। বোনের বেলায়ও ঐ একই নিয়ম। ভাই কখনো বোনের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করবে না ; এমন কি চলতি কথার মধ্যে নামের আংশিক শব্দও যাতে উচ্চারণ না-করে ফেলে সে-বিষয়ে অবহিত থাকবে ! এই 'এড়িয়ে চলা' শুরু হয় বালকের বয়ঃসন্ধি উৎসব হওয়ার পর থেকে,এবং এই নিয়ম সারা জীবন কঠোরভাবে পালিত হয়ে থাকে। মা ও ছেলের মধ্যে ব্যবধান বয়ঃবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়তে থাকে, এবং এ বিষয়ে মা'র দায়িত্বই বেশি। মা যদি ছেলের জন্য কোনো খাবার জিনিষ নিয়ে আসে তাহলে সে-খাবার সরাসরি ছেলেকে নিজে পরিবেশন না-করে পাত্রটি ছেলের সামনে মাটিতে নামিয়ে দেয়। মা-ছেলের ঘরোয়া সম্পর্কে সম্বোধন না-করে মা ছেলের প্রতি ভদ্রতা-সূচক সম্বোধন ব্যবহার করে। নিউ ক্যালিডোনিয়াতেও এই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। এখানে যদি ভাইবোনে

---

৮. Storfer হালফিল এই বিষয়টির উপর তাঁর পুস্তিকায় (monograph) বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; পুস্তিকাটির নাম—Parricide as a Special Case. Papers on Applied Psychic Investigation, No. 12 Vienna, 1911).

কোথাও দেখা হয়, বোন দৌড়ে বনের মধ্যে পালিয়ে যায়, আর ভাই বোনের দিকে ঘাড়টি না-বেঁকিয়ে সোজা এগিয়ে বনে চলে যায়[৯]।

নিউ ব্রিটেনের গেজেলি উপদ্বীপে বোনেরা বিয়ের শুরু থেকে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয়। এমনকি তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না। তবে ভাইকে উদ্দেশ করতে হলে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে[১০]।

নিউ মেকলেনবার্গে কোনো কোনো জ্ঞাতি ভাইবোনেরা এইরূপ নিষেধাবলির শাসনে এসে পড়ে। ভাইবোনের পক্ষেও অবশ্য ঐ নিষেধ প্রযোজ্য। তারা পরস্পরের কাছে এগিয়ে এসে হাত মেলাতে পারে না। একে অন্যকে উপহার দিতে পারে না। তবে কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলতে পারে। বোনের সঙ্গে অজাচার সম্পর্কের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড[১১]।

এই নিষেধাবলি ফিজি দ্বীপে বিশেষভাবে কঠোর। সেখানে রক্ত-সম্পর্কের ক্ষেত্র পেরিয়ে শ্রেণীভুক্ত বোনদের ক্ষেত্রেও ঐ নিয়ম চলে থাকে।

আবার এই অসভ্য অধিবাসীদের মধ্যে পবিত্র রতি উৎসবের (orgy) সময় যখন নিষিদ্ধ-সম্পর্কের মধ্যেই আসঙ্গলিপ্সা দেখা যায় তখন সেটা আমাদের কাছে খুবই অস্বাভাবিক মনে হয় ; কিন্তু এই দুই পরস্পর-বিরোধী ঘটনার সাহায্যে নিষেধাজ্ঞা-গুলির তাৎপর্যই স্পষ্ট হবে[১২]। সুমাত্রা দ্বীপের বাত্তাস জাতির মধ্যে দেখা যায় সকল প্রকার নিকট-সম্পর্কীয়দের মধ্যেই সান্নিধ্য পরিহার করা বিধি। যেমন কোনো বাত্তাবাসীর পক্ষে বোনকে নিয়ে সান্ধ্য-ভোজে যাওয়াটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। অন্য লোক উপস্থিত থাকলেও ভাই-বোনের একত্র উপস্থিতিতে ভাই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করবে। আত্মীয়দের একজন বাড়িতে প্রবেশ করলে অন্যজন বাড়ি থেকে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করবে। বাপের পক্ষে মেয়ের সঙ্গে একা এক গৃহে থাকা এবং মায়ের পক্ষে ছেলের সঙ্গে অনুরূপ অবস্থান অসম্ভব। যে ওলন্দাজ ধর্মযাজক এই সব প্রথা লিপি-বদ্ধ করেছেন তিনি বলেছেন যে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সব প্রথা খুব দৃঢ়মূল। একজন পুরুষ ও একজন নারী একসঙ্গে একাকী থাকলে তারা যে ঘনিষ্ঠতম দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, এ বিষয়ে এই সকল জাতির মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। অজাচারের পরিণাম যে অশুভ ও সর্বপ্রকারের সামাজিক পীড়ন এ কথা তারা জানে ; সুতরাং এই সব নিষেধাবলির সাহায্যে সর্বপ্রকার প্রলোভন দমন করার ব্যবস্থা করে তারা ভালোই করে বলতে হবে[১৩]।

আফ্রিকা মহাদেশের ভেলাগোয়া উপসাগর অঞ্চলে বারোঙ্গোদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয় শ্যালকজায়া সম্বন্ধে। শ্যালকজায়া যে-কোনো ব্যক্তির

---

৯. R. H. Codrington. The Melanesian; also Frazer. Totemism and Exogamy, Vol. I. p. 77.

১০. Frazer, l.c., II. p. 124, referring to Kleintischen ; The Inhabitants of the Coast of the Gazelle Peninsula.

১১. Frazer, l.c., II, p. 131, referring to P. G. Peckel in Anthropes, 1908.

১২. Frazer, l.c., II, p. 147, referring to the Rev. L. Fison.

১৩. Frazer, l.c., II, p. 189

পক্ষে মারাত্মক ; তাই, যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তার শ্যালকজায়ার দেখা হয়ে যায় তা হলে অতি সাবধানতার সঙ্গে তাকে এড়িয়ে চলে। উক্ত ব্যক্তি শ্যালকজায়ার সঙ্গে একই পাত্র থেকে খাবার খেতে সাহস করে না, শ্যালকজায়ার কুটিরে পদার্পণ করার সাধ্য তার নেই এবং নিতান্ত ভয়কম্পিত, ভীরু কণ্ঠে সে তার আত্মীয়াকে সম্বোধন করে[১৪]।

ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকার আকাম্বা বা ওয়াকাম্বাদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশেষ বিধি হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত মেয়ে খুব সাবধানে বাবাকে এড়িয়ে চলে। কোনো পুরুষের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মেয়ে যদি পথে তার পিতাকে দেখতে পায় তাহলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে এবং কখনও পিতার খুব কাছাকাছি বসবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বাবার সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারে আর কোনো বাধা থাকে না[১৫]!

কোনো পুরুষের সঙ্গে তার শাশুড়ীর সামাজিক মেলামেশা বিষয়ে যেসব বিধি-নিষেধ আছে সেগুলি সভ্যজাতির কাছে বোধহয় সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হবে। এরূপ ব্যবস্থা অতীব কঠোর এবং অনেক জায়গায় প্রচলিত দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়াতে এ ব্যবস্থা খুবই চলিত। মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া ও আফ্রিকার নিগ্রো জাতিদের মধ্যে, এবং যেখানে টোটেম প্রথা ও দল-সম্পর্ক ব্যবস্থা পৌঁছেছে,এমনকি কিছু কিছু তার বাইরেও এরূপ বিধি চালু দেখা যায়। এই সমস্ত জাতিদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুরূপ বিধিনিষেধ পুত্রবধূ এবং শ্বশুরের মধ্যে নির্দোষ সামাজিক ব্যবহারের বিরুদ্ধেও প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু এগুলি তত গুরুত্বপূর্ণও নয়, স্থায়ীও নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়কেই এড়িয়ে চলার নিয়ম আছে। আমরা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সম্প্রসারণের চেয়ে শাশুড়ীকে এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কী, সেই বিষয়ে বেশি কৌতূহলী। অতএব এখানেও আমি কয়েকটি মাত্র উদাহরণের মধ্যে আমার বক্তব্য আবদ্ধ রাখব।

ব্যাঙ্কস্ দ্বীপে এই সব বিধি নিষেধ খুবই কঠোর ও পীড়াদায়কভাবেই ত্রুটি-শূন্য। এখানে জামাতা ও শাশুড়ী উভয়েই পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। যদি তাদের পরস্পরের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায় তা হলে শাশুড়ী জামাইয়ের দিকে পিছন ফিরে সরে দাঁড়ায়। জামাইও এরূপ না-করা পর্যন্ত বা চলে না-যাওয়া পর্যন্ত শাশুড়ী ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভ্যানা লাভাতে (Port Patterson) সমুদ্রতীরে চলার সময় যতক্ষণ না শাশুড়ীর পদচিহ্ন ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যায় ততক্ষণ জামাই শাশুড়ীর অনুগমন করবে না। তবে তারা, দূর থেকে কথাবার্তা বলতে পারে। একে যে অন্যের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবে না, সে-কথা বলাই বাহুল্য[১৬]।

সোলেমন দ্বীপে বিয়ের সময় থেকেই জামাই শাশুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ

১৪. Frazer, l.c., II. p. 388, referring to Junod.

১৫. Frazer, l.c., II, p. 424.

১৬. Frazer, l.c., II. p. 76.

করবে না। যদি শাশুড়ীকে পথে দেখতে পায় তাহলে সে যেন তাকে চেনে না এমন ভাব দেখাবে এবং নিজেকে লুকিয়ে ফেলার জন্য সাধ্যমত দৌড় দেবে[১৭]।

জুলু কাফিরদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা আছে যে শাশুড়ীর উপস্থিতিতে জামাই লজ্জিত হবে এবং তার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যে কুঁড়ে-ঘরে শাশুড়ী আছে সেই ঘরে জামাই ঢুকবে না। যদি তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয় তা হলে শাশুড়ী পাশে সরে যায়, সম্ভবত ঝোপের মধ্যে লুকোবার জন্য; এবং জামাই তার ঢালটি সামনে ধরে নিজের মুখটি আড়াল করে। যদি এড়িয়ে চলার উপায় না-থাকে, তা হলে স্ত্রীলোকটি নিয়ম রক্ষার খাতিরে একগোছা ঘাস মাথার চারধারে বেঁধে নেয়। তাদের মধ্যে যদি কোনো কথাবার্তা হয় তবে সেটা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির মারফত, নতুবা কোনো প্রতিবন্ধক, যেমন গরু-বাছুর আটকানোর বেড়া ইত্যাদি মাঝখানে রেখে দূরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের উদ্দেশে চিৎকার করে। একে অপরের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারবে না[১৮]।

নীল নদের উৎস অঞ্চলে নিগ্রো জাতির এক শাখা বোসোগাদের বাস। এখানে কোনো লোকের শাশুড়ী যদি অন্য ঘরে থাকে এবং তাকে দেখা না-যায় তাহলে লোকটি (জামাই) তার সঙ্গে কথা বলতে পারে। এই জাতি অজাচারিতাকে এত ঘৃণার চোখে দেখে যে, এমনকি গৃহপালিত পশুদের মধ্যেও এরূপ ঘটলে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয় না[১৯]।

এরূপ নিষেধাবলির অর্থ ও উদ্দেশ্য যে নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে অজাচারিতার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা, এই ব্যাখ্যা সকলেই দিয়েছেন। কিন্তু শাশুড়ীর সঙ্গে জামাতার ব্যবহার বিষয়ে নিষেধাবলির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ভিন্ন। কেন যে এই সব জাতিরা একজন পুরুষের পক্ষে মায়ের বয়সী শাশুড়ী সম্বন্ধে এত বেশি রিরংসার ভয় পোষণ করে তা আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত[২০]।

একই আপত্তি ওঠে ফিশ্‌ন সাহেবের মতের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন যে, কোনো কোনো দল-বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক দেখা যায়। যেমন, কোনো পুরুষের সঙ্গে তার শাশুড়ীর বিবাহের সম্ভাবনা একেবারে অচিন্ত্যনীয় নয়; তাই বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ সম্ভাবনা বিদূরিত করার জন্য বিশেষ নিষেধ-বিধির দরকার হয়েছে।

জামাতার প্রতি শাশুড়ির ব্যবহারের যে-বর্ণনা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে, স্যার জে. লাবক তাঁর 'সভ্যতার উদ্ভব' (*The Origin of Civilization*) গ্রন্থে তার উৎস খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীনকালের 'হরণ-বিবাহ' রীতির মধ্যে। তাঁর কথায়, 'যত-দিন পর্যন্ত প্রকৃতই মেয়েদের হরণ করে বিয়ে করা হত, ততদিন (হরণকারীর প্রতি) মেয়েদের বাপ-মায়ের ক্রোধও সম্ভবত বেশ প্রবল ছিল। পরে যখন এই ধরণের বিবাহ

---

১৭. Frazer, I c. p. 113, referring to C. Ribbie. Two years Among the Cannibals of the Solomon. Islands 1905.

১৮. Frazer, I.c., II. p. 385,

১৯. Frazer, I.c., II. p. 461.

২০. V. Crawley : The Mystic Rose (London, 1902). p. 4 5.

আর ঘটত না, আনুষ্ঠানিকভাবে তার কতকগুলি প্রতীকমাত্র পড়ে রইল, তখন বাপ-মায়ের ক্রোধও প্রতীক স্বরূপ হয়ে তাঁদের ব্যবহারের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে এই ক্রোধের উৎপত্তি কোথায় সেটা ভুলে গেলেও জামাতাকে পরিহার করার প্রথাটা চালু রইল।' এই বিচার-সাপেক্ষ ব্যাখ্যা যে পূর্ববর্ণিত আচার-ব্যবহারের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি বুঝতে কত অল্পই সাহায্য করে, ক্রলি সাহেব কিন্তু তা অনায়াসেই দেখিয়েছেন।

ঈ. বি. টেইলর মনে করেন, জামাইয়ের প্রতি শাশুড়ীর যে ব্যবহার, সেটা শাশুড়ীর সংসার থেকে জামাইকে একরকম 'ছেঁটে ফেলা' ছাড়া আর কিছুই নয়। জামাই একজন অপরিচিত ব্যক্তির শামিল। এবং যতদিন না মেয়ে-জামাইয়ের প্রথম সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয় ততদিন জামাইয়ের প্রতি এই মনোভাবই বর্তমান থাকে। শেষের এই শর্ত পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও (অর্থাৎ সন্তান হওয়ার পরও) যেখানে নিষেধবিধির কোনো পরিবর্তন হয় না সেই সব উদাহরণ ছেড়ে দিলেও, এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আপত্তি থেকে যায়। এই ব্যাখ্যা জামাতা ও শাশুড়ীর মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহারগত যে-প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে তা বুঝতে সাহায্য করে না : বরং এতে যৌন-প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তা ছাড়া নিকট আত্মীয়কে পরিহার করার রীতির ভিতর দিয়ে যে একটা পবিত্র ঘৃণার ভাব প্রকাশ পায়, এই ব্যাখ্যায় সে ব্যাপারটিকে মোটেই গণ্য করা হয়নি[২১]।

একজন জুলু স্ত্রীলোককে তাদের এই নিষেধবিধির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে খুব সলজ্জ ও বিব্রত ভাবে বলে, 'যে স্তন একদিন তার স্ত্রীকে পুষ্টিদান করেছে সেটা তার (জামাতার) দৃষ্টিগোচর হোক এটা ঠিক নয়[২২]।

সভ্য জাতিদের মধ্যেও জামাতা-শাশুড়ীর সম্পর্ক যে, পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে কঠিন সমস্যাগুলির অন্যতম, এ কথা সর্বজনবিদিত। ইওরোপ ও আমেরিকার শ্বেতজাতি সমাজে পরিহারবিধির চলন আর নেই। তবুও উক্ত প্রথাটি টিকে থাকলে হয়তো বহুলাংশে পারিবারিক বিবাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হত না ; এবং তার ফলে ব্যক্তিগতভাবে প্রথাটির পুনঃপ্রবর্তন করতে হত না। দুই নিকট-সম্পর্কের ব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিষিদ্ধ করে বর্বর জাতিরা যে বিধির প্রবর্তন করেছে তার মধ্যে বহু ইওরোপবাসী প্রাজ্ঞ মনেরই পরিচয় পাবেন। শাশুড়ী ও জামাতার সম্পর্কের মধ্যে যে এমন কিছু আছে, যা দুইটি ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ ও সংঘাতকে তীব্রতর করে তোলে এবং ফলে উভয়ের পক্ষে একত্রে বাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সভ্য জাতিদের মধ্যে যে ধরনের রসালাপ শোনা যায় তার মধ্যে শাশুড়ী-সংক্রান্ত রসিকতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ করার মতো। এতদ্দৃষ্টে আমার মনে হয় যে, শ্বশ্রূ-জামাতা সম্পর্কে যে প্রক্ষোভটি কাজ করে তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী উপাদান। অর্থাৎ আমার মতে, শ্বশ্রূ-

২১. Crawley, l.c., p. 407.

২২. Crawley, l.c., p. 401, according to Leslie : Among the Zulus and Amatongas, 1875.

জামাতা সম্পর্কে উভয়বলতা (ambivalence) বিদ্যমান ; ভালোবাসা ও বৈরিতা এই দুই পরস্পরবিরোধী অনুভূতি সেখানে কাজ করে।

এই অনুভূতিগুলির কিয়দংশ খুব প্রকট। শাশুড়ী তার মেয়ের উপর নিজের অধিকার ত্যাগ করতে চায় না। যে অপরিচিত ব্যক্তির হাতে তার মেয়েকে সমর্পণ করা হয়েছে তাকে সে সন্দেহের চোখে দেখে ; স্বগৃহে তার যে কর্তৃত্ব ছিল সেটি সে বজায় রাখতে চায়। অপরপক্ষে জামাইও চায় না কোনো বাইরের লোকের প্রভুত্ব স্বীকার করতে। বিবাহের পূর্বে যারা তার স্ত্রীর প্রীতিভাজন ছিল, তাদের প্রতি সে ঈর্ষাপরায়ণ। পরিশেষে—এই ব্যাপারটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—সে কল্পনায় তার স্ত্রীর মোহিনীশক্তিকে স্বভাবতই অতিরঞ্জিত করে এবং তার সেই কল্পনায় ব্যাঘাত ঘটলে সে বিরক্ত হয়। সাধারণত তার মধুর কল্পনার প্রতি এই আঘাত আসে অনেকাংশেই তার শাশুড়ীর কাছ থেকে। শাশুড়ীর সঙ্গে তার স্ত্রীর অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য থাকে ; কিন্তু শাশুড়ী বিগতযৌবনা, তার তো নেই সেই দেহ-লাবণ্য, সেই মানসিক স্বতঃ-বৃত্তি, যার দরুন তার স্ত্রী তার কাছে মহামূল্য সম্পদ বলে মনে হয়। বিগত-যৌবনশ্রী শাশুড়ীর মধ্যে তার রূপলাবণ্যময়ী স্ত্রীর পরিণতি লক্ষ করে সে পীড়িত বোধ করে।

মনঃসমীক্ষণী অনুসন্ধানের ফলে ব্যক্তি-মনের গভীরে নিহিত মানস-অনুভূতি-গুলি সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পেরেছি তাতে উল্লিখিত প্রেষণাগুলির সঙ্গে আরও কতকগুলি যুক্ত করা যেতে পারে। মেয়েদের কামজ-মানস (psycho-sexual) চাহিদাগুলি বিবাহ-বন্ধন ও পরিবারজীবনের মধ্যেই তৃপ্ত হবার কথা ; কিন্তু দাম্পত্য জীবনের অকাল পরিণতি ঘটলে এবং স্ত্রীর প্রক্ষোভজীবন বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠলে অসন্তোষ আসতে পারে। এরূপ বিপদের সম্ভাবনা সব সময়েই আছে। যিনি সন্তানের জননী, বার্ধক্যের সীমায় এসে তিনি এই বিপদ এড়িয়ে যান পুত্র-কন্যার জীবনের মধ্য দিয়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাদের প্রক্ষোভজ অভিজ্ঞতাগুলিকে আপন করে নিয়ে। বাপ-মায়েরা নাকি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এসে তাদের সমবয়সী হয়ে যান। বস্তুত সন্তান থাকার দরুন বাপ-মায়ের মানসিক যে সকল সুবিধা ঘটে, এটি তাদের অন্যতম। নিঃসন্তান হবার দুর্ভাগ্য এই যে বিবাহিত জীবনের অসন্তোষ ও ক্লান্তিকে সহনীয় করে তোলার প্রকৃষ্টতম কোনো উপায় থাকে না। অনায়াসেই মেয়ের সঙ্গে মায়ের এতখানি প্রক্ষোভজ একাত্ম ঘটা সম্ভব যে তিনিও মেয়ের প্রেমাস্পদের সঙ্গেই প্রেমে পড়ে যেতে পারেন। এবং তাঁর ঐ প্রক্ষোভজ প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড মানসিক প্রতিরোধের দরুন চরম ক্ষেত্রে তাঁর কঠিন উদ্‌বায়ু রোগ হতে পারে। শাশুড়ীর মনের এই ধরনের মোহপ্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়, এবং হয় এই মোহটি স্বয়ং, নয় তো এর প্রতিরোধ কারী প্রতিপ্রবণতা, শাশুড়ীর মনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রক্ষোভশক্তিসমূহের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রায়শ তাঁর মনের প্রেম-প্রক্ষোভের অন্তর্গত এই কঠোর ও ধর্ষকামী উপাদানটিই তাঁর নিষিদ্ধ অনুরাগকে নিরুদ্ধ করতে গিয়ে জামাতার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

শাশুড়ীর সঙ্গে জামাইয়ের যে-সম্পর্ক সেটাও জটিল হয়ে ওঠে শাশুড়ীর প্রতি জামাইয়ের অনুরূপ অনুভূতির দরুন, যদিও এই অনুভূতিগুলির উৎস অন্যত্র। কোনোও ব্যক্তির পক্ষে তার প্রেমপাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে তার মা এবং সম্ভবত তার

বোনের প্রতিরূপ প্রভাবিত করে। এই দুজনই তার শৈশবের প্রেমাস্পদ, কিন্তু অজাচারঘটিত বাধা থাকার দরুন এই দুজনের প্রতি তার স্বাভাবিক আকর্ষণ, পথ-ভ্রংশ হয়, ব্যক্তি তাদের প্রতিরূপ খুঁজে পায় অপরিচিত পাত্রের মধ্যে। তখন সে তার শাশুড়ীকেই তার নিজের মা এবং তার বোনের মা'র আসনে দেখতে পায়। অতঃপর তার মন পাত্র নির্বাচনের আদি অবস্থায় ফিরে যেতে চায়, কিন্তু এই প্রবণতার বিরুদ্ধে তার মনের সমস্ত শক্তি কাজ করে। অজাচার-ভীতির দরুন সে প্রেমপাত্র নির্বাচনের আদিপর্বটা স্মরণে আনতে চায় না। শাশুড়ীকে সে যথাযথ দেখতে পায়, এবং শাশুড়ীকে যেহেতু সে জীবনভর মায়ের মতো দেখেনি, তাই নির্জ্ঞান মনে তাঁর ছবি মায়ের মতো অবিকল থাকে না। ফলে শাশুড়ীকে প্রেমাস্পদের আসন থেকে বাতিল করা সহজতর হয়। এর সঙ্গে যখন জামাইয়ের মধ্যে উত্যক্ততা ও বৈরিতার অনুভূতি লক্ষ করা যায় তখন সন্দেহ হয় যে তার মনে শাশুড়ীর প্রতি অজাচার-প্রবণতা বর্তমান। শাশুড়ীর মেয়ের (স্ত্রী) প্রতি আকর্ষণ জন্মাবার আগেই যে, পুরুষ শাশুড়ীর প্রেমে পড়ে থাকে এমন দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়।

অজাচারীয় ব্যাপারই যে বর্বর সমাজে জামাতা ও শাশুড়ীকে পরস্পরের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে প্রেষিত করে, এই অঙ্গীকারে (assumption) কোনো আপত্তি দেখি না। যে পরিহার-প্রথা এই আদিম জাতিরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে, তার যতরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে যে মতটি সর্বপ্রথম ফিশ্‌ন সাহেব প্রকাশ করেন সেটিকেই আমরা সর্বাপেক্ষা সমীচীন বলে মনে করি। তাঁর মতে এই পরিহার-বিধি সম্ভাব্য অজাচার নিবারণের উপায় মাত্র। যারা পরস্পর রক্তের সম্পর্কে বা বৈবাহিক সম্পর্কে আত্মীয়, তাদের মধ্যে যাবতীয় পরিহার রীতির ব্যাখ্যাতেই এই মত খাটে। কেবল একটি মাত্র পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সরাসরি অজাচারের সম্ভাবনা থাকায় অজাচার নিবারণের উদ্দেশ্য সংজ্ঞান মনে থাকা সম্ভব। এবং অপরক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে শাশুড়ী-সম্পর্ক বিজড়িত, সেখানে অজাচার-প্রবণতা নির্জ্ঞান মনে নিহিত অন্তর্বর্তী যোগসূত্রঘটিত মনঃসৃষ্টি (phantasy) মাত্র।

মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে লোকমনোবিদ্যার (Folk-Psychology) ক্ষেত্রে যে এক নতুন আলোকসম্পাত হয়, এই আলোচনায় সে-কথা বলার সুযোগ আমাদের হয়নি। কারণ বর্বরের অজাচার-ভীতি বহুকাল ধরে এই রকমই চলে আসছে। এবং কোনো নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই! অজাচার ভীতিকে ঠিক-মতো বুঝতে হলে আমরা অতিরিক্ত যেটুকু বলতে পারি তা এই যে, এটি এক সূক্ষ্ম অপোগণ্ডীয় (infantile) প্রলক্ষণ (trait) এবং উদ্‌বায়ু রোগীর মানসজীবনের সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে আমরা শিখেছি যে শিশুর প্রথম ভালোবাসার পাত্র নির্বাচন হচ্ছে অজাচারীয়। মা বা বোন জাতীয় নিষিদ্ধ পাত্রে তার ভালোবাসা ধাবিত হয়। আমরা আরও শিখেছি যে কি কি উপায়ে পরিণত ব্যক্তি অজাচারীয় আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। উদ্‌বায়ু রোগীর মধ্যে অবশ্য আমরা পুরোপুরি এক ধরনের মানসিক অপোগণ্ডতা দেখতে পাই। দেখা যায়, হয় সে শিশুসুলভ মানস-কামিতা (psycho-sexuality) থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি, নয়তো সে ঐ অবস্থায় ফিরে গেছে [মনের বর্ধন বাধা

প্রাপ্ত হয়েছে (inhibited development) কিংবা প্রত্যাবৃত্তি (regression) ঘটেছে]। সে-কারণে অজাচারীয় কামজ সংবন্ধন (fixation) তার নিজ্ঞান মনে তদবধি কিংবা নূতন করে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ। আমরা এতদূর পর্যন্ত জোর করে বলতে পারি যে, মাতাপিতার প্রতি সন্তানের অজাচার-বাসনাতাড়িত যে সম্পর্ক, সেটাই উদ্‌বায়ুর প্রধান গূঢ়ৈষা (complex)। উদ্‌বায়ু-প্রসঙ্গে অজাচারিতার যে-তাৎপর্য পাওয়া গেছে তা স্বাভাবিক (normal) বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে সাধারণত অবিশ্বাস্য। অটো র‍্যাঙ্ক (Otto Rank) যেসব গবেষণা করেছেন সে-গুলিও সাধারণত বাতিল করা হয়ে থাকে। অজাচার বিষয়টি কত বিভিন্ন ও বিকৃত-রূপে কাব্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে আছে, অটো র‍্যাঙ্ক-এর গবেষণাগুলি তা আরও বিশদভাবে দেখিয়েছে। এর থেকে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে, মনঃসমীক্ষণ-লব্ধ অজাচার বিষয়ক এই জ্ঞান অস্বীকার করার কারণ প্রথম জীবনে অজাচার ইচ্ছা-গুলির—যেগুলি পরে অবদমিত হয়—প্রতি মানুষের গভীর বিতৃষ্ণা। মানুষের যে-অজাচার-ইচ্ছাগুলি নিজ্ঞান মনে চলে যেতে বাধ্য, সেগুলি যে বর্বরেরা আজও খুব সাংঘাতিক বলে মনে করে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে এটা দেখানো আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

টাবু ও প্রক্ষোভের উভয়বলতা

'টাবু' কথাটি একটি পলিনেশীয় শব্দ। এর অনুবাদ করা আমাদের পক্ষে শক্ত, কেননা, শব্দটি যে-ভাবার্থ প্রকাশ করে তার সঙ্গে আমাদের এখনও সম্যক পরিচয় ঘটেনি। প্রাচীন রোমকদের মধ্যেও এটা প্রচলিত ছিল। রোমকদের 'sacer' এবং পলিনেশীয়দের 'টাবু' এই দুই শব্দের অর্থ একই। গ্রীকদের *αγιος*, শব্দ এবং ইহুদীদের Kodaush শব্দ এবং পলিনেশীয়দের 'টাবু' শব্দ সমার্থবোধক। আমেরিকা, আফ্রিকা (মাদাগস্কার), উত্তর ও মধ্য এশিয়ার বহু জাতিও অনুরূপ শব্দ মারফৎ একই ভাব প্রকাশ করে থাকে।

আমাদের কাছে 'টাবু'র অর্থ দুইটি, এবং তারা বিপরীতধর্মী। এক পক্ষে ইহা পূত, পবিত্র এবং অপর দিকে ইহা অসোয়াস্তিকর, বিপজ্জনক, নিষিদ্ধ এবং অপবিত্র। পলিনেশিয়াতে টাবুর বিপরীতার্থবোধ শব্দ হচ্ছে '*noa*', যার অর্থ হচ্ছে, যা-কিছু সাধারণ এবং সহজলভ্য। অতএব 'টাবু' কথাটিক মধ্যে সংরক্ষিত, নিষিদ্ধ এই ধরনের একটি ইঙ্গিত রয়েছে। 'টাবু' বলতে আসলে নিষিদ্ধ এবং আপত্তিজনক ভাবেরই প্রকাশ পাচ্ছে। 'পবিত্র-ভয়' এই যুগ্ম শব্দের দ্বারা অনেক সময় 'টাবু' কথাটির ভাবার্থ প্রকাশ হয়ে থাকে।

টাবুর বাধানিষেধগুলি ধর্ম সম্পর্কীয় ও নৈতিক আপত্তি থেকে ভিন্ন। টাবুর বাধা-নিষেধের সঙ্গে দৈবের কোনো যোগ নেই। আসলে নিষেধগুলি মানুষ নিজেদের ঘাড়ে নিজেরাই চাপিয়ে দিয়েছে। নৈতিক দিক থেকে যখনই কোনো আপত্তির কথা ওঠে তখনই ওরকম আপত্তির ভিত্তি থাকে প্রয়োজনীয়তার উপর এবং প্রয়োজনের কারণও দেখানো হয়। টাবু নিষেধবিধিগুলি এই দিক থেকে ভিন্ন, এ ক্ষেত্রে যুক্তি প্রমাণাদির কোনো বালাই নেই এবং এদের মূল উৎস কোথায় তাও অজ্ঞাত। আমাদের কাছে অজ্ঞেয় হলেও যারা এই সব নিষেধবিধির আওতায় পড়েছে তারা এগুলিকে অবশ্যপালনীয় হিসাবেই গ্রহণ করেছে।

ভুণ্ড (Wundt) টাবুকে মানবতার সবচেয়ে পুরানো অলিখিত আইন বলে বর্ণনা করেছেন। টাবু দেবতাদের চেয়েও পুরানো এবং প্রাক্-ধর্মযুগের বলে সাধারণত ধরে নেওয়া হয়।

টাবু সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ আলোচনা করতে চাই। সেইজন্য মনঃসমীক্ষণের দিক থেকে বিচার করার আগে নৃতত্ত্ববিদ্ নর্থকোট ডব্লু. টমাস (North W. Thomas) লিখিত 'টাবু' নামক প্রবন্ধটির কিছু অংশ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' থেকে উদ্ধৃত করছি।

'ঠিক করে বলতে গেলে 'টাবু' বলতে কেবলমাত্র বোঝায় (ক) বস্তু বা ব্যক্তির পবিত্র (বা অপবিত্র) ভাব, (খ) এই পবিত্র বা অপবিত্র ভাব থেকে উদ্ভূত নিষেধাজ্ঞা, এবং (গ) নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলে যেসব পবিত্রতার (বা অপবিত্রতার)

সৃষ্টি হয় সেইগুলি। পলিনেশিয়াতে 'টাবু'র বিপরীত অর্থবোধক শব্দ হচ্ছে 'নোআ' (*noa*) এবং এরই সমগোত্রীয় শব্দাবলির মানে হচ্ছে 'সাধারণ', বা 'চলতি'.

'সাধারণভাবে দেখলে টাবুকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন ১. স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষ, যেখানে ম্যানা (mana) বা অদ্ভুত শক্তির ফল ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই নিবদ্ধ : ২. প্রচলিত বা অপ্রত্যক্ষ, এখানেও 'ম্যানা'র শক্তি বর্তমান, তবে সে শক্তি হয় ক) সংগৃহীত, নয়ত খ) সর্দার বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত ; ৩. মধ্যধর্মী, যেখানে উপরোক্ত দুটিই বর্তমান, যেমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশেষ ব্যবহার। টাবু শব্দটি বিভিন্ন ধরনের ধর্মানুষ্ঠানের আচার-বিচারের উদ্দেশ্যেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এই অর্থে এর ব্যবহারকে এড়িয়ে চলাই যুক্তিসঙ্গত। যেসব ক্ষেত্রে নিষেধগুলির অনুমোদন কোনো দৈব্যশক্তি বা প্রেতশক্তি কর্তৃক হয়ে থাকে সেই সব ক্ষেত্রেও টাবু শব্দটি ব্যবহার করার কথা উঠতে পারে। অর্থাৎ ভৌতিক বা অপ্রাকৃতিক বিষয় থেকে ধর্মীয় বিধিনিষেধ প্রয়োগের জন্য টাবু শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো স্বয়ংক্রিয়তা বা সংক্রমণ নেই, সেই জন্য এগুলিকে ধর্মীয় নিষেধবিধি মনে করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত।

'টাবু ব্যবহারের উদ্দেশ্য বহু : ১. প্রত্যক্ষ টাবুর উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) দলপতি গুরু প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যক্তি ও বস্তুকে বিপদ থেকে রক্ষা করা ; (খ) দুর্বলকে আশ্রয় দান—যেমন স্ত্রীলোক, শিশু এবং সাধারণ লোককে সর্দার এবং গুরুদের কবল থেকে (জাদুকরী বিদ্যার প্রভাব থেকে) রক্ষা করা ; (গ) কতকগুলি বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া—যেমন মৃতদেহ নাড়াচাড়া করা বা তার সংস্পর্শে আসা, কোনো খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারজনিত বিপদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ; (ঘ) জন্ম, উপবীত (initiation), বিবাহ, যৌনক্রিয়া প্রভৃতি জীবনের প্রধান প্রধান কাজকে বিপত্তি থেকে রক্ষা করা ; (ঙ) দেবতা এবং প্রেতাত্মাদের ক্রোধের বিরুদ্ধে মানবকে অভয় দান করা ; (চ) ভ্রূণস্থিত শিশু এবং ছোট ছেলেমেয়েদের সংরক্ষণ : বিশেষ করে যেসব ছেলেমেয়ে তাদের মাতাপিতার সঙ্গে খুব সহৃদয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কতকগুলি কাজের অবশ্যম্ভাবী ফল থেকে, বিশেষ করে খাদ্যবস্তু থেকে সংগৃহীত কতকগুলি গুণাগুণ সঞ্চালনের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা। ২. চোরের হাত থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, খেত-খামার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি রক্ষার জন্যও 'টাবু' আরোপিত হয়ে থাকে।'

প্রবন্ধটির অন্যান্য অংশের সংক্ষিপ্তসার এইরূপ হতে পারে। গোড়াতে টাবু-বিরুদ্ধ কাজের জন্য শাস্তি খুব সম্ভবত বিবেক-বিচারের উপরই ছেড়ে দেওয়া হত। অর্থাৎ টাবুর নিয়মভঙ্গের জন্য টাবুই তার প্রতিশোধ নিত। যখনই কোনো দেবতা বা দানবের সঙ্গে 'টাবু'র সম্পর্ক স্থাপিত হলো তখনই শাস্তি বিধানের কর্তা হলো সেই দৈব বা দানবীয় শক্তি। অন্যান্য ক্ষেত্রে, খুব সম্ভবত ভাবের উৎকর্ষের ফলে যে-ব্যক্তি তার সঙ্গীদের পক্ষে বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠল তার শাস্তির বিধান-ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করল সমাজ। এইভাবে মানুষের শাস্তি বিধানের প্রথম পদ্ধতিও টাবুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল।

'টাবুর নিয়ম ভঙ্গ করলে সেই ব্যক্তি নিজেই টাবু হয়ে যায়।' লেখক আরও বলেছেন

যে, টাবুর নিয়ম ভাঙলে যে বিপদ আছে তা অপরাধীর প্রায়শ্চিত্তের ক্রিয়াকলাপ ও কঠিন অনুষ্ঠানাদি থেকেই বোঝা যায়।

কোনো মানুষ বা ভূত-প্রেতাদির অন্তর্নিহিত অদ্ভুত শক্তি, যা অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে চালিত করা যায় তাকেই টাবুর উৎস বলে ধরা হয়ে থাকে। প্রবন্ধের এই অংশটি এইরূপ: 'যেসব ব্যক্তি বা বস্তু টাবু পদবাচ্য তারা বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন বস্তুর মতো। এরা এক একটা বিরাট শক্তির আধার। এই শক্তি স্পর্শের দ্বারা অন্যত্র চালিত হতে পারে। এবং যে-ব্যক্তি শক্তিকে উত্তেজিত করবে সে যদি প্রচলিত শক্তির পক্ষে খুব দুর্বল হয় তাহলে তার সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। 'টাবুর বিরুদ্ধাচারণের ফলাফল অংশত নির্ভর করে যে-বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে এই শক্তি নিহিত রয়েছে তার ভৌতিক (ম্যাজিক) শক্তির উপর এবং অংশত টাবু অমান্যকারীর প্রতিরোধশক্তির দৃঢ়তার উপর। যেমন, রাজা বা নেতারা বিরাট শক্তিসম্পন্ন, অতএব' প্রজাদের পক্ষে রাজা বা নেতাদের মুখোমুখি হওয়া মানে মৃত্যুকে বরণ করা। কিন্তু মন্ত্রী বা সাধারণ অপেক্ষা বেশি শক্তিমান কোনো ব্যক্তি নির্ভয়ে তাদের সামনে আসতে পারে; আবার এঁদের অধস্তন ব্যক্তিরা নিঃশংকায় এঁদের কাছে যেতে পারে। অতএব পরোক্ষ টাবুর শক্তিমত্তাও নির্ভর করছে প্রতিরোধকারীর ম্যানা (mana) বা নিজস্ব অদ্ভুত শক্তির উপর। যারা পুরুত বা প্রধান স্থানীয় তাদের শক্তি সাধারণ লোকের শক্তির চেয়ে বেশি'।

টাবু যে চালিত হতে পারে এ ধারণা নিশ্চয়ই নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা এর অপকারিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা থেকেই জন্মেছে।

লেখক বলেছেন স্থায়ী ও অস্থায়ী দুরকমের টাবু আছে। পুরুত নেতা ও মৃত এবং তাদের অধিকৃত যাবতীয় জিনিস হচ্ছে স্থায়ী টাবু। মানুষের কতকগুলো সাময়িক অবস্থা বা তৎসংক্রান্ত ঘটনাকে, যেমন রজঃস্রাব-অবস্থায় বা আঁতুড়-অবস্থায় নারী, যুদ্ধযাত্রার আগের ও পরের যোদ্ধা, মাছ-ধরা ও শিকার সংক্রান্ত আচার-বিচার প্রভৃতি অস্থায়ী টাবু। ধর্মসংক্রান্ত বাধা-নিষেধের মতো সাধারণ টাবু যদি কোনো জেলায় বা বিস্তৃত এলাকায় প্রচলিত করা হয় তাহলে অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

টাবু সম্বন্ধে এতক্ষণ তো অনেক কথাই বলা হলো। কিন্তু আমার মনে হয়,পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন, এর থেকে এমন কিছু বোধগম্য হলো না যা মনে করে রাখবার যোগ্য। আমি যে বিবরণ এতক্ষণ দিয়েছি তার অসম্পূর্ণতাই এরূপ মনে হবার কারণ। টাবুর সঙ্গে কুসংস্কারের, আত্মার প্রতি বিশ্বাসের এবং ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বাদ দিয়েছি বলেই এই অসম্পূর্ণতা আরও বেড়েছে। টাবু সম্বন্ধে আরও বেশি বিবরণ দিতেও আমি ভয় পাচ্ছি, পাছে অস্পষ্টতা আরও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পাঠককে আমি একটা কথাই বলতে পারি যে, ব্যাপারটা মোটেই পরিষ্কার নয়। তবে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, আমরা এমন কতকগুলো চলতি বাধা-নিষেধের সন্ধান পাই যেগুলো আদিমবাসীরা নিজেদের উপর প্রয়োগ করে আসছে। এটা করতে নেই, ওটাতে মানা, বলেই তারা খালাস; কেন করতে নেই, এ প্রশ্ন তাদের মনেই ওঠে না। তারা ধরে নেয় এরকম হয়েই থাকে, ওরূপ অবশ্যম্ভাবী; এবং তাদের আরও

বিশ্বাস যে ওইসব নিষেধ অমান্য করলে আর রক্ষা নেই, চরম শাস্তিও অবশ্যম্ভাবী। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক : কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি নিষিদ্ধ পশুথেকে তার খাদ্য সংগ্রহ করল। যখন জানতে পারল, খুব দুঃখিত হলো ও মুষড়ে পড়ল। ভাবল আর নিস্তার নেই, এবার মরতেই হবে। এবং পরে সত্যিই মারা পড়ল। দেখা যায়, যা কিছু খুব আনন্দ দিতে পারে সেসবই সাধারণত নিষিদ্ধ : যেমন, চলাফেরার স্বাধীনতা, অবাধ মেলামেশা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষেধ খুবই অদ্ভুত রকমের উপরতি ও স্বার্থ-ত্যাগ হিসেবে প্রকাশ পায়। কোথাও আবার উদ্দেশ্য কী তা বোঝাই ভার ; বিষয়বস্তু এতই সামান্য। এগুলো দেখে নানা পালপার্বণের কথাই মনে হয়। এই সব নিষেধের মধ্যে একটা-কিছু তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। মনে হয়, এই নিষেধ-বিধিগুলোর যেন দরকার ছিল। কেননা,কোনো কোনো ব্যক্তি বা বস্তু মারাত্মক শক্তির অধিকারী। যেসব জিনিস এরূপ শক্তিসম্পন্ন তাদের ছোঁয়া পেয়েই যেন এরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই মারাত্মক শক্তির পরিমাণ নিয়েও কথা ওঠে। কোনো কোনো ব্যক্তি বা বস্তু অন্যদের চেয়ে হয়ত বেশি শক্তিশালী। এবং বিপদ ঠিক সেইখানেই বেশি। সব-চেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে যে, যদি কেউ নিষেধ লঙ্ঘন করে তবে সে নিজেই টাবু হয়ে যায়। যেন সে ঐ সাংঘাতিক শক্তির অধিকারী হয়ে বসেছে। এই শক্তি, যারা অল্প-বিস্তর বিখ্যাত তাদের মধ্যে নিহিত থাকে--যেমন রাজা, পুরুত এবং নবজাত শিশু। আবার সমস্ত বিশেষ শারীরিক অবস্থাতেও এই শক্তি থাকে—যেমন রজঃস্রাব, বয়ঃসন্ধি এবং জন্মাবস্থায়। মানুষের প্রত্যেক অনিষ্টকর বা অমঙ্গলজনক অবস্থাতেও এর অস্তিত্ব বর্তমান—যেমন রোগ ও মৃত্যুকালে; এবং এর সঙ্গে সংক্রমণ বা বিস্তৃতি দ্বারা যুক্ত যে-কোনো অন্য অবস্থাতেও এই শক্তি বর্তমান থাকে।

যাই হোক, টাবু বলতে সমস্ত লোক, লোকালয়, বস্তু এবং এদের সাময়িক অবস্থা, যা এই অদ্ভুত গুণটির উৎসস্থল ও বাহক হতে পারে তাদের সকলকেই বোঝায়। এবং এই আশ্চর্য গুণ থেকে উদ্ভূত নিষেধাবলিও টাবু। এবং সর্বশেষে, আক্ষরিক মানে অনুযায়ী যা-কিছু পবিত্র, অসাধারণ এবং সেই একই সঙ্গে সাংঘাতিক অশুচি এবং অদ্ভুত, তা সবই টাবু পর্যায়ভুক্ত।

এই শব্দটি এবং এ-সংক্রান্ত নিয়মাবলি উভয়ই মানস রাজ্যের যেটুকু আভাস দেয় তা আমাদের কাছে সত্যিই খুবই পরিষ্কার নয়। এবং মনে হয় অশরীরী আত্মায় বা দৈত্যে বিশ্বাস, যা সংস্কৃতির আদি যুগে খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল তার সন্ধান না-করলে টাবু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়।

মনে হতে পারে, কেন এই টাবুর ধাঁধায় আমরা এত মাথা ঘামাচ্ছি ? মনোবিদ্যার প্রত্যেক সমস্যার গবেষণার চেষ্টার মধ্যেই নিজস্ব সার্থকতা আছে, শুধু একথাই আমি মনে করি না, এছাড়া আরও কারণ আছে। পলিনেশিয়ার আদিবাসীদের টাবুর সঙ্গে যে খুব বেশি তফাত সে-কথা আগে মনে হলেও এখন তা মনে হয় না। নৈতিক এবং চলতি নিষেধাবলি যা আমরা মেনে থাকি তার সঙ্গে ঐ আদিবাসীদের টাবুর কোনো গূঢ় সম্বন্ধ থাকতে পারে। এর ব্যাখ্যা করলে শেষে আমাদের 'অবশ্যপালনীয়' নিয়মগুলির অন্ধকারাবৃত জন্মরহস্যের উপর আলোকসম্পাতও হতে পারে।

অতএব,আমরা ডব্লু, ভুণ্ড-এর মতো গবেষকের কাছে টাবুর ভাষ্য মন দিয়ে শুনব। বিশেষ করে যেখানে তিনি টাবু-জন্মের আদি-রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন।

ভুণ্ড বলছেন, 'যেসব প্রথা কোনো ধর্মমতের চিন্তার সঙ্গে বা তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত কোনো বস্তু সম্বন্ধে ভীতি উৎপাদন করে' তা সবই টাবু পদবাচ্য।

আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক আচার-বিরুদ্ধ প্রথা বা আদব-কায়দা এবং বিশেষ কোনো জিনিস স্পর্শ করতে নিষেধ বা নিজের জন্য গ্রহণে নিষেধ বা কোনো নিষিদ্ধ শব্দ ব্যবহারে আপত্তি, টাবু বলতে সাধারণভাবে এসমস্তকেই আমরা বুঝি—।' তা যদি হয়, তাহলে কোনো জাতি বা সংস্কৃতির কোনো স্তরই এর অনিষ্টকারিতার হাত থেকে রেহাই পায় নি।

এরপর ভুণ্ড দেখাচ্ছেন, কেন উচ্চ-সংস্কৃতিসম্পন্ন পলিনেশিয়ার জাতিদের চেয়ে অস্ট্রেলিয়ার বর্বরদের টাবু আলোচনা করা ব্যবহারিক দিক থেকে বেশি সুবিধাজনক। পশু মানুষ ও কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে অস্ট্রেলিয়ার টাবুকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে, মূলত কোনো পশুহত্যা বা ভক্ষণ-বিরুদ্ধ প্রথা! এটাই হলো টোটেম প্রথার গোড়ার কথা। দ্বিতীয় শ্রেণীর টাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এক্ষেত্রে ব্যক্তির কোনো এক বিশেষ অবস্থার জন্য তাকে সাময়িকভাবে টাবু করা হয়। যেমন, যুবকদের সম্প্রদায়ভুক্তি উপলক্ষ্যে ভোজের সময়, স্ত্রীলোকদের রজঃস্রাব অবস্থা বা প্রসবের পরের অবস্থা, নবজাত শিশু রুগণ ব্যক্তি—বিশেষ করে মৃত ব্যক্তি, এ সমস্তই টাবু। কোনো ব্যক্তির সর্বদা ব্যবহৃত জিনিসপত্র, যেমন কাপড়-চোপড়, যন্ত্রপাতি বা অস্ত্রশস্ত্র এসবও অন্যের কাছে স্থায়ীভাবে টাবু। অস্ট্রেলিয়াতে বয়ঃপ্রাপ্তি-অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত নতুন নাম স্নাতকের নিজস্ব সম্পত্তি। এটা টাবু, অতএব গোপনীয়। কোনো গাছপালা বাড়ি-ঘর বা বিশেষ কোনো স্থান প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর টাবু-পর্যায়ভুক্ত। এর আবার বহু প্রকারভেদ আছে। একটা সহজ নিয়ম অনুসারে দেখা যায়, যা কিছু, যে-কোনো কারণেই হোক, ভয় বা ভৌতিক কাণ্ডের সৃষ্টি করে তাকেই এই টাবু শ্রেণীভুক্ত ধরে নেওয়া হয়।

ভুণ্ড নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে পলিনেশিয়া এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের উচ্চমানের সংস্কৃতির চাপে টাবুর যে পরিবর্তন হয়েছে তার গভীরতা খুব বেশি নয়। ঐসব জায়গায় রাজা,দলপতি ও পুরোহিতরা বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন টাবু প্রয়োগ করে এবং এরা নিজেরাই সবচেয়ে বেশি টাবু-অনুকর্ষী। ঐসব জায়গায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগের মধ্যে প্রভেদ কেন যে এত বেশি তা এ থেকেই বোঝা যায়।

কিন্তু এই সব বিশিষ্ট সুবিধাভোগী লোকদের স্বার্থ ছাড়িয়ে টাবুর আসল মূল আছে আরও গভীরে। 'এদের মূলসূত্র পাওয়া যাবে যেখানে খুব আদিম অশুদ্ধ মানুষের সবচেয়ে বেশি সহনশীল আবেগগুলো একসঙ্গে বাসা বেঁধে রয়েছে ; যেমন, ভৌতিক শক্তির প্রতি ভয়ের মধ্যে। 'টাবু আসলে, ভৌতিক ভয়ই বস্তুতে আরোপিত হয়ে বস্তু ভয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এই শক্তি বস্তুতে আশ্রয় করেছে বলে বিশ্বাস জন্মেছে। অতএব, ভৌতিক শক্তিকে বিরক্ত না-করতে চাইলে টাবু-বস্তুকে

মানতে হয়। এবং কখনও যদি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে টাবুকে অমান্য করা হয় তাহলেই আবার শাস্তি পাবার ভয়ে তাকে সন্তুষ্ট করতে হয়।' ক্রমশ টাবু ভৌতিক বিষয় থেকে সরে একটা স্বাধীন শক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে, প্রথা ও সংস্কারের অভেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে, এবং শেষে আইনে দাঁড়িয়ে গেছে। 'কিন্তু টাবুর পিছনে যে নির্দেশ রয়েছে তা দেশ-কাল ভেদে তফাৎ হলেও তার আসল মানে সেই এক-দৈত্য-দানার ক্রোধ থেকে দূরে থাক।'

ভুণ্ড এর দ্বারা বোঝাতে চাইছেন যে, আদিম বাসিন্দাদের মনে ভূতপ্রেতাদির ভয়ের প্রতি বিশ্বাসের প্রকাশ ও তার ক্রমবিকাশই হচ্ছে টাবু। পরে টাবু ক্রমশ এই মূল থেকে ভিন্ন হয়ে এক প্রকার মানসিক নির্বন্ধের সাহায্যে মানব মনে একটা স্থায়ী শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে, এবং এইভাবে আমাদের প্রথা ও আইনের জড় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমি যদি এর প্রথম অংশটির যৎসামান্য প্রতিবাদ করে বলি যে, ভুণ্ড-এর মত নৈরাশ্যজনক, তাহলে আশা করি সেটা আমার সব পাঠকের মনের কথারই প্রতিধ্বনি হবে। ভুণ্ড-এর ব্যাখ্যা টাবু-প্রত্যয়ের বা টাবুর নিগূঢ় কারণের ধারেকাছেও যায় না। কেননা, মনোবিদ্যায় কি ভয়' কি দৈত্য-দানব কোনোটাই আর কোনো অর্থের সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে শেষ সূত্র বলে গণ্য হতে পারে না। অবশ্য যদি সত্যসত্যই ভূত-প্রেত বলে কোনো জিনিস থাকত তাহলে অন্য কথাছিল। কিন্তু আমরা জানি দেবদেবীর মত ভূত-প্রেতও মানুষের মনঃশক্তির কল্পনামাত্র। কোনো একটা কিছু থেকে বা কোনো কিছুকে অবলম্বন করে এদের কল্পনা করা হয়েছে। টাবুর দ্বৈত অর্থের সম্বন্ধে ভুণ্ড কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছেন,যদিও তাঁর মতামতগুলি খুব স্পষ্ট নয়। তাঁর মতে টাবু প্রথা প্রচলনের প্রথম স্তরে পবিত্র ও অশুচি এই দুটো বিভাগের খোঁজ পাওয়া যায় না। এই প্রত্যয়গুলি উভয়ের সঙ্গে তুলনা করে, ভালমন্দ বিচার করে দেখার ফলে যে-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারত, এই কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাই এইগুলি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যশূন্য হয়ে পড়েছে। পশু, ব্যক্তি বা স্থান, যা টাবু বলে গণ্য তা ভৌতিক, তার মানে পবিত্র নয় ; অতএব, পরবর্তী অর্থ অনুযায়ী তখনও সে অশুচি নয়। ভৌতিকের এই অভেদ্য এবং মাধ্যমিক অর্থ প্রকাশ করতে টাবু শব্দই বিশেষভাবে উপযোগী। এর অর্থ এমন একটা কিছু যা অস্পৃশ্য। কারণ, এটি পবিত্র ও অপবিত্র, অর্থাৎ স্পর্শভীতি উভয় বৈশিষ্ট্যকেই বিশেষভাবে সূচিত করে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য দুয়ের মাঝে এক পাকা বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ। যখন তারা পূর্বতন সাম্যাবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে নিজ নিজ স্বাধীন রূপ পেয়েছে তখন থেকেই পবিত্র ও অপবিত্র দুই উল্টোমুখি জিনিসের সৃষ্টি হয়েছে। টাবুর গোড়ার কথার সঙ্গে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, কোনো বস্তুর মধ্যে ভৌতিক শক্তি লুকিয়ে থাকে এবং এই বস্তুকে ছুঁলে সেই শক্তি রুষ্ট হয় এবং ঐ ব্যক্তিকে তার শক্তির দ্বারা অভিভূত করে শাস্তি দেয়। এই যে ধারণা, এটা বস্তুতে আরোপিত ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়। টাবুর যখন এই অবস্থা, তখন তা দুটো বিভিন্ন রূপ পায়নি। ভয় ও এড়িয়ে চলা এই দুটো ভিন্ন ভাবের সৃষ্টি হয়েছে পরে।

পরস্পর এই ছাড়াছাড়ি ঘটল কী করে - ভুণ্ডের মতে টাবু-নিষেধ ভৌতিক জগৎ থেকে আস্তিকদের জগতে প্রবেশের মধ্য দিয়েই ঘটেছে। পবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন এই দুটো

পরস্পর উল্টোমুখি অবস্থা পরপর দুই পৌরাণিক স্তরের সঙ্গে মিলে যায়। এই দুই স্তরের মধ্যে প্রথমটি যখন সম্পূর্ণরূপে বিদায় নেয়নি, তার আগেই দ্বিতীয়টির আবির্ভাব হলো। এর ফলে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির পাশে কিছুদিন পর্যন্ত নিজ সম্মান খোয়াতে খোয়াতে শেষে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে দাঁড়াল। রূপকথা সম্বন্ধে এটা একটা সাধারণ সূত্র যে, নতুন ব্যাখ্যার ঢেউ এলেই পূর্ব মত কোণঠাসা হয়ে পড়ে। নতুনের কাছে পুরানো পরাস্ত হয়। তাই, একদিন যা আদরনীয় ছিল তাই-ই আজ ঘৃণার পাত্র হয়ে গেল।

এর পর ভুণ্ড টাবুর সঙ্গে বলিদান ও শুদ্ধিস্নানের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন।

২

মনঃসমীক্ষণ মানুষের নির্জ্ঞান মনের হদিস করে বেড়ায়। যিনি টাবু সমস্যাকে এই বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে দেখবেন তিনি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, তাঁর কাছে এই সমস্যা একেবারেই নতুন নয়। মনঃসমীক্ষক জানেন, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে কেমন করে টাবু-নিষেধের সৃষ্টি করে এবং আদিমবাসীদের মতোই কড়াকড়িভাবে তা পালন করে। তিনি যদি এইরূপ লোককে অনুকর্ষী বায়ুগ্রস্ত বলতে না-অভ্যস্ত থাকেন তাহলে এদের টাবু-রোগগ্রস্ত বললে রোগ অনুযায়ী নামটা খুবই খাপ খাবে। মনঃসমীক্ষণ প্রসূত গবেষণা থেকে তিনি জানেন, অনুকর্ষী রোগের জড় কোথায় এবং তার মানসিক গতিবিধি কিরূপ। অতএব, লোকমনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিষয়ের প্রকাশ দেখলে তার ব্যাখ্যার জন্য তিনি মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে যা শিখেছেন তা প্রয়োগ না করে পারেন না।

এই কাজ করতে গেলে একটা বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। টাবু ও অনুকর্ষী রোগের মিল নিগূঢ়ভাবে না হয়ে কেবল ভাসা ভাসা হতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যে এমন বস্তুর অভাব নেই, যেখানে পরস্পর জৈব সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ, অথচ তাদের আকারে অদ্ভুত সামঞ্জস্য ; যেমন, এক ধরণের প্রবাল মূল্যের সঙ্গে গাছের সাদৃশ্য এবং কোনো কোনো স্ফটিকের সঙ্গে রাসায়নিক দানার সাদৃশ্য। অতএব, কেবল কতকগুলি গতানুগতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে তাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের নিরিখ ধার্য করলে নেহাত ব্যস্তবাগীশের কাজ হবে এবং তা থেকে কিছুই সুফল পাওয়া যাবে না। এই সাবধান বাণী আমাদের ভুললে চলবে না। অবশ্য তাই বলে এরূপ সম্ভাব্য গোলমালের জন্য দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ দেখানোর ইচ্ছা আমাদের ত্যাগ করলে চলবে না।

উদ্‌বায়ুর বাধ্যতামূলক নিষেধ এবং টাবুর মধ্যে সর্বপ্রথম ও অতি আশ্চর্যজনক মিল হচ্ছে, দুয়েরই উৎপত্তি যেমন অনিচ্ছাকৃত তেমনি অতিকুহেলিকাময়। কোনো এক সময় শুরু হয়েছে, এখন অনিবার্য উৎকণ্ঠার দরুন ত্যাগ করা যাচ্ছে না। মনের মধ্যে নিশ্চিত ধারণা যে, নিয়ম অমান্য করলে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে তা অসহনীয়। এই ভয়ের কাছে বাহ্যিক শাস্তির ভয় কিছুই নয়। অনুকর্ষী বায়ুগ্রস্ত রোগীর বড়জোর এই বলতে পারে যে, যদি তারা নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে তাদের পারিপার্শ্বিকদের

মধ্যে কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কী যে ক্ষতি হবে তা সঠিক তাদের জানা নেই। এই অসম্পূর্ণ সংবাদের হদিস পাওয়ার দুটো উপায় আছে। প্রথম, শাস্তিমূলক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার পর্যালোচনা ; এবং অপরটি, খাস নিষেধবিধির আলোচনা। এই দুটোর মধ্যে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিই বেশি কার্যকর বলে মনে হয়। এই আলোচনা আমরা পরে করব।

টাবুর মতোই উদ্‌বায়ুর বিচার বাতিকেরও জড় হচ্ছে ছোঁয়ার মধ্যে, যার থেকে আমরা স্পর্শভীতি বা ছুতমার্গ কথাটি সংগ্রহ করেছি। নিষিদ্ধতা বলতে শুধু সোজাসুজি শারীরিক স্পর্শকেই যে বোঝায় তা নয়, 'সংস্পর্শে আসা' বা 'কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত থাকা' এই ধরনের বাক্যাংশের উপমামূলক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যা-কিছু মনকে নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে ঠেলে দেয় এবং মানসিক স্পর্শের দাবি করে তা সবই শারীরিক স্পর্শের মতোই নিষিদ্ধ। টাবুর ক্ষেত্রেও ঠিক এমনিই দেখা যায়।

কতকগুলো নিষেধের তাৎপর্য সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আবার এমন কতকগুলোও আছে যা খুবই অবোধ্য, মনে হয় নিছক বোকামি বা পাগলামি। এই সব নিয়মগুলোকে আমরা সাধারণত আচার বা ক্রিয়াকর্মের অবশ্যকরণীয় আঙ্গিক বলে মনে করি। টাবু প্রথার মধ্যেও ঠিক এমনি ধরনের নানা ফ্যাঁকড়া রয়েছে।

আবেশজ নিষেধগুলোর অভিক্রান্তি ক্ষমতা অসাধারণ। একটু মাত্র সম্বন্ধের গন্ধ পেলেই এরা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পরে এই শেষের বস্তুটিকে 'অসম্ভব' করে তোলে। এই অসম্ভবতা সারা দুনিয়ার সামনে নিষেধের তর্জনি তুলে দাঁড়ায়। অনুকর্ষী বায়ুরোগীদের কাজের পিছনে ধারণা থাকে যেন এই 'অসম্ভব' বস্তু বা ব্যক্তি একটা ছোঁয়াচে জিনিস সঙ্গে নিয়ে এসেছে, এবং অন্য কোনো জিনিসের স্পর্শ পেলেই তার মধ্যে ঐ সাংঘাতিক জিনিসটা ঢুকে পড়বে। আমরা আগেই টাবু-নিষেধের বিবরণ দেবার সময় এই ছোঁয়াচ ও সংক্রমণের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি। আমরা আরও জানি যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো টাবুকে ছুঁয়ে টাবু-নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহলে সে নিজেই টাবু হয়ে যায়, এবং অন্য কেউ তার সংস্পর্শে আসতে পারে না।

সংক্রমণ বা আরও ভালো কথায় বলা যেতে পারে অভিক্রান্তি : তার দুটো উদাহরণ আমি পাশাপাশি দেব। একটি 'মাওরি'দের জীবন থেকে আর একটি অনুকর্ষী বায়ুগ্রস্ত এক রোগিণীর উপর আমার পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু থেকে। ফ্রেজার সাহেব তাঁর *The Golden Bough* নামক কেতাবে (২য় খণ্ড) লিখেছেন '—একই কারণে মাওরি সর্দার মুখ দিয়ে আগুনে ফুঁ দেবে না। কারণ সে ভাবে, তার পবিত্র শ্বাসবায়ুর পবিত্রতা এইভাবে আগুনের মধ্যে চলে যাবে, এবং সেখানে থেকে পাত্রের মধ্যে মাংসের ভিতর প্রবেশ করবে। এবং এই মাংস থেকে যে-লোক মাংস খাবে তার মধ্যে চলে যাবে, যেহেতু এই মাংস পাত্রের মধ্যে ছিল, পাত্রটি ছিল আগুনের উপর, এবং এই আগুনে দিয়েছে সর্দার ফুঁ, অতএব, এই ব্যক্তি মাংস খেলে সর্দারের শ্বাসবায়ুর পবিত্রতার ছোঁয়াচ লেগে নিশ্চয়ই সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।'

আমার রোগীটি দাবি জানাল যে তার স্বামী যে বাসনটা কিনে বাড়ি ঢুকিয়েছে

সেটাকে বিদেয় করা দরকার, নইলে তার পক্ষে বাড়িতে টেকা অসম্ভব। কেননা, সে শুনেছে সে-বাসনটা—ধরে নেওয়া যাক—Stag রোডের দোকান থেকে কেনা। তাৎপর্য এই যে, Stag নামে তার এক বন্ধু ছিল। এখন সেই বন্ধু একটি দূরে শহরে থাকে। যৌবনে তার কুমারী অবস্থায় ঐ বন্ধুটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন তার কাছে ঐ বন্ধু 'অসম্ভব'-এর পর্যায়ে পড়ে গেছে। অর্থাৎ ঐ নামটি তার কাছে এখন টাবু হয়ে গেছে। এবং যে-জিনিসটা ভিয়েনাতে Stag street-এ কেনা হলো, সেটাও তার ঐ বন্ধু যার সংস্পর্শে সে আসতে চায় না তারই মতো টাবু হয়ে গেল।

টাবু-নিষেধের মতো অনুকর্ষী নিষেধও জীবনে ত্যাগ স্বীকারের ও বাঁধাধরা নিয়মপালনের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। বাধ্যতামূলকভাবে কতকগুলো কাজ করে এদের হাত থেকে খানিকটা নিস্তার পাওয়া যায়। কতগুলো কাজ করতে হয়, না করে উপায় নেই ; কারণ এগুলো বাধ্যতামূলক জাতীয় (আবেশজ ক্রিয়া) হয়ে গেছে। এই কাজগুলো যে কৃচ্ছ্রসাধন, ক্ষতিপূরণ, আত্মরক্ষণ এবং শুদ্ধিকরণের পর্যায়ে পড়ে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধরনের আবেশজ ক্রিয়ার মধ্যে জল দিয়ে ধোয়া-মোছা-করা (শুচিবায়ু) সবচেয়ে সাধারণ। টাবু-নিষেধও এইভাবে খানিকটা দূর করা যায়। অর্থাৎ তাদের নিয়মভঙ্গ হলে এই রকম কোনো আচরণের সাহায্যে তার ক্ষতিপূরণ করা যায়। এবং এখানেও সেই জল দিয়ে শুদ্ধ করার পথই প্রশস্ত।

টাবু প্রথা ও অনুকর্ষী বায়ুর লক্ষণসমূহের মধ্যে যেসব মিল খুবই স্পষ্ট তা হল : ১. প্রেষণাবিহীন অনুশাসন বিধিতে, ২. আন্তর প্রয়োজনের চাপে তাদের কার্যকারিতায়, ৩. তাদের অভিক্রান্তি ক্ষমতাকে ও নিষিদ্ধ বিষয়ের ছোঁয়াছ লাগার ভয়ে এবং ৪. নিষিদ্ধ বিষয় থেকে উদ্ভূত আচারগ্রস্ত ক্রিয়াকলাপ ও অনুশাসনাবলির কারণতায়।

যাই হোক, মনঃ সমীক্ষণের কল্যাণে আমরা অনুকর্ষী বায়ুর রোগ পরীক্ষা ইতিবৃত্ত ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিষয় জানতে পেরেছি। একটি প্রকৃত স্পর্শভীতি বা ছুতমার্গ রোগীর জীবনবৃত্তান্ত থেকে কী পাওয়া যায় দেখা যাক। একেবারে গোড়াতে, শৈশবের প্রথম অবস্থায় শিশু নিজেকে ছুঁয়ে অপার আনন্দ লাভ করছে। এটা এতই তুচ্ছ ব্যাপার যে, কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। পরে সেই একইভাবে ছুঁয়ে আনন্দ পেতে দিতে বাইরে থেকে আপত্তি উঠল (আনন্দ-পাওয়া ও নিষেধ উভয়ই শিশুর নিজের লিঙ্গ ছোঁয়া সম্পর্কে বুঝতে হবে)। নিষেধ মান্য করা হলো। কিন্তু এই বাহ্যিক শক্তি পূর্বোক্ত আবেগকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে পারল না, কেননা শিশুমনের কাঠামো তখন গঠনের প্রাথমিক ধাপে চলছে। তাই এই নিষেধ আবেগকে (ছোঁয়ার আনন্দ) দমন করে নির্জ্ঞানে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেন মাত্র। আবেগ ও নিষেধ উভয়েই রয়ে গেল। আবেগ রইল, কারণ সে নির্মূল হয়নি, আর নিষেধও রইল, কারণ সে না থাকলে আবেগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে সংজ্ঞানে উঠে আসবে এবং নিজ ইচ্ছা চরিতার্থ করবে। এইভাবে একটি অমীমাংসিত অবস্থা একটি মানসিক সংবন্ধনের সৃষ্টি হলো এবং এই নিষেধের ও আবেগের অহর্নিশ দ্বন্দ্ব থেকে আরও অনেক কিছুই সৃষ্টি হতে থাকল।

যেসব মানসিক প্রবৃত্তি এইভাবে সংবন্ধনের পাকে ধরা পড়েছে তাদের একটা

বাহ্য প্রকাশ আছে। ব্লুলার সাহেব কর্তৃক চরিত উভয়বলত (ambivalenee) শব্দটি এক্ষেত্রে সুন্দররূপে প্রযোজ্য। এই অবস্থায় কোনো বস্তু সম্পর্কে বা বিশেষ করে ঐ বস্তু সম্পর্কিত কোন কাজ সম্বন্ধে ব্যক্তিটির ব্যবহারে ইতস্ততভাবে সহজেই চোখে পড়বার মতো। ব্যক্তিটি সব সময়েই ঐ কাজটি (অর্থাৎ ছোঁয়া) করতে চাইছে। এতে সে অপার আনন্দ পাবে। কিন্তু কাজটি সে সমাধা না-ও করতে পারে, এমনকি এই কাজকে ঘৃণা করতেও পারে। এই পরস্পর বিরোধ সহজে মেটানো সম্ভব নয়, কারণ এর প্রকাশের ভিন্ন উপায় আর কিছু নেই। মনোরাজ্যে তারা এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যে দুজনের দেখাদেখি হবার কোনো উপায় নেই। এই ছোঁয়ার আনন্দ নির্জ্ঞানে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রয়েছে, আর নিষেধাজ্ঞাটি দখল করে রয়েছে সংজ্ঞানকে। ব্যক্তিটি যদিও এ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারছে না। মনোবিদ্যার এই তথ্যটি যদি না থাকত তাহলে উভয়বলতাও এতদিন টিঁকে থাকত না, আর পরে তার এই ধরনের প্রকাশও সম্ভব হোত না।

শৈশবের প্রথম অবস্থায় নিষেধ শিশুজীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে, এ কথা রোগ-পরীক্ষা বৃত্তান্ত আলোচনা করার সময় আমরা জোর দিয়ে বলেছি। কিন্তু উদ্‌বায়ু সম্বন্ধে আরও খোঁজ করে দেখা গেছে যে, এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অবদমন নিষেধের স্থান দখল করেছে। এই অবদমন সংযুক্ত রয়েছে ভুলের (স্মৃতি-লোপ বা হ্রাস) সঙ্গে। এই অবদমনের জন্য নিষেধর প্রেরণা সংজ্ঞান রাজ্যে থেকেও অজানা অংশ থেকে, অর্থাৎ লুকানো ও অপ্রশমিত ভোগলিপ্সার কাছ থেকে ; তার মানে সংজ্ঞান মনের নাগালের বাইরে এক আন্তর তাগিদের কাছ থেকে। নিষেধের সংক্রমণ ও বর্ধন ক্ষমতা এমন এক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা অবদমিত ভোগলিপ্সার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় এবং নির্জ্ঞানের মানস নির্ণায়কগুলির সাহায্য লাভ করে। আবেগের সন্তুষ্টির ইচ্ছা, বাধা অতিক্রম করার জন্য সর্বদা অভিক্রান্ত হয় এবং কোনো বদলি বস্তু বা কাজের ভিতরে নিষেধের প্রতিভূর সন্ধান করে বেড়ায়। একই কারণে নিষেধও উদ্দেশ্যহীন হয়ে নিষিদ্ধ আবেগের নতুন নতুন উদ্দেশ্যের পিছনে প্রসারিত হয়। অবদমিত কামের (লিবিডোর) প্রত্যেক নতুন প্রসারকে নতুন নতুন কড়া শাসনের নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়। উভয় শক্তিই নিজ নিজ ইচ্ছার পূরণ চাইছে এবং উভয়েই দমিত হচ্ছে। এই দুই বিবদমান শক্তির পারস্পরিক অবদমনের দরুনই মানসিক পীড়ন হ্রাস করার ও মোক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে : এবং এরই মধ্যে বোধ হয় আমরা অনুকর্ষী ক্রিয়ার প্রেরণা খুঁজে পেতে পারি। উদ্‌বায়ুর মধ্যে বোঝাপড়ার চেষ্টা সুস্পষ্ট। বিমর্ষতা এবং দোষস্খালনের চেষ্টা বা ঐ ধরনের কাজকে এর লক্ষণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে এই ক্রিয়াগুলি আবার নিষিদ্ধ আবেগের ক্ষতিপূরক হিসাবে কাজ করছে। উদ্‌বায়ু রোগের সূত্রই হচ্ছে যে এই আবেশজ ক্রিয়াগুলি আবেগটিকে খুশি করতে করতে ক্রমশ প্রকৃতনিষিদ্ধ ক্রিয়াটির কাছাকাছি এসে পড়ে।

টাবু যেন আমাদের রোগীর অনুকর্ষী নিষেধের মতোই, এরূপ ধরে নিয়ে একে বোঝার চেষ্টা করা যাক। আমরা যে সমস্ত টাবু-নিষেধ নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে অনেকগুলিই গৌণমাত্র, মুখ্য নয়। একথা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে

হবে। এগুলি অতিক্রান্ত ও বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত। অতএব, আমরা যদি আদিতম ও খুব গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি টাবু-নিষেধের উপর আলোকসম্পাত করতে পারি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার। আদিম-বাসীর অবস্থা ও উদ্‌বায়ু দুইয়ের মধ্যে তফাতটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের কথা ভেবে আলোচনার সম্পূর্ণ নথিপত্র ও প্রতি পদে একের প্রতি অন্যের সংক্রমণের ধারার অভাবকে উপেক্ষা করতে হবে। এগুলো সবই সম্ভব হোত যদি অবশ্য আমরা একেবারে হুবহু নকল নিয়ে আলোচনা করতাম।

টাবুর আসল প্রেষণা কী এবং কোথা থেকে এর উৎপত্তি, এ-কথা আদিমবাসীদের জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ নেই। আমাদের প্রকল্প অনুযায়ী তারা এ সবের উত্তর দিতে পারবে না, কেননা, তাদের কাছে এই প্রেষণা অজ্ঞাত, অর্থাৎ প্রেষণা আছে নিজ্ঞানে। কিন্তু অনুকর্ষী নিষেধকে আদর্শ ধরে আমরা নিম্নলিখিত রূপে টাবুর একটি ইতিবৃত্ত খাড়া করতে পারি। টাবু বহুদিনের পুরানো সংস্কার বা আচার কোনো এক সময়ে বাইরে থেকে আদিম জাতিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হতে পারে আরও আগেকার কোনো একপুরুষ পরের পুরুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। যে কাজগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর উপর তাদের জোর আকর্ষণ ছিল। বংশ পরম্পরায় এগুলো পালিত হয়ে এসেছে। সম্ভবত পৈতৃক ও সামাজিক চাপে কেউ নিয়ম ভঙ্গ করতে সাহস করেনি। আরও পরে নিষেধগুলো 'সমষ্টিভূত' হয়ে বংশগত মানসিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয়ে থাকতে পারে। এগুলো সত্যিকার সহজাত মনোভাব কিনা বা টাবু পাশ-এর জন্য এরা নিজেরাই দায়ী কিনা কিংবা শিক্ষার সঙ্গে মিশে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কিনা, কেউই ঠিক করে বলতে পারে না। তবে টাবুর দীর্ঘজীবন থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট যে, টাবু-বিরোধী কাজ করে আসল আনন্দটি পাবার আকাঙ্ক্ষা এখনও টাবুজাতিদের মধ্যে বর্তমান। অতএব, এরা টাবু-নিষেধ সম্বন্ধে 'উভয়বল মনোভাব' বা দোটানায় পড়েছে। নিজ্ঞান মনের ইচ্ছাটা নিয়মভঙ্গ করতে পারলে আর কিছু চায় না, কিন্তু ভয়ের চোটে তা আর করা হয়ে উঠছে না। ভয়টা প্রবল, কেননা নিয়ম ভঙ্গের ইচ্ছাটা জোরালো : আর নিয়ম ভঙ্গের আনন্দের চেয়ে ভয়টা বেশি শক্তিশালী। কিন্তু জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তাদের এই ইচ্ছা নিজ্ঞান মনে থাকার জন্য অজ্ঞাত রয়েছে—যেমন থাকে উদ্‌বায়ুদের মনে।

টোটেমবাদের মূল দুটি নীতিই হচ্ছে টাবু নিষেধের সবচেয়ে পুরানো এবং গুরুত্বপূর্ণ নিষেধ, যথা, টোটেম প্রাণীকে হত্যা না-করা, এবং প্রতিলিঙ্গ টোটেম সঙ্গীর সঙ্গে রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলা।

অতএব, এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এইগুলিই মানুষের সবচেয়ে পুরানো ও শক্তিশালী বাসনা। এর কারণ আমাদের বোধগম্য নয়। অতএব যতক্ষণ টোটেম প্রথার অর্থ ও উৎপত্তি আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা উপরোক্ত উদাহরণকে কাজে লাগাতে পারি না। কিন্তু এই টাবুগুলোর শব্দবিন্যাস থেকে এবং তাদের এরূপ অঙ্গাঙ্গী উল্লেখ দেখে মনঃসমীক্ষকদের মনে একটা কথা স্বতঃই উদয় হয়। সেটা হচ্ছে, মনঃসমীক্ষকরা যাকে বলেন শৈশবের ঐচ্ছিক-জীবনের কেন্দ্রস্থল এবং

পরবর্তী জীবনে উদ্‌বায়ুর উৎস।

টাবু নিষেধের আর যেসব রকমারি আছে এবং যা নিয়ে আমরা আগে একটি শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেছি তার উপসংহার একটি বাক্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। যথা, নিজ্ঞান মনে যা-কিছুর প্রতি প্রবল ঝোঁক আছে বহির্জগতে এরূপ কাজকে নিষিদ্ধকরণই হচ্ছে টাবুর মূল সূত্র।

ও কথা না বুঝলেও আমরা জানি যে, যে কেউ নিষিদ্ধ কাজ করে এবং টাবু নিয়ম লঙ্ঘন করে সে নিজেই টাবু হয়ে যায়। কিন্তু এর সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির যোগাযোগ আমরা কীভাবে করব? যেমন, আমরা এও জানি যে, টাবু নিষেধের লঙ্ঘনকারীই শুধু নিজে টাবু হয়ে যায় না; বিশেষ অবস্থাভুক্ত মানুষ, কোনো কোনো বিশেষ অবস্থা বা ঘটনা, এমনকি নৈর্ব্যক্তিক দ্রব্যাদিও টাবু হয়ে পড়ে। এই যে সাংঘাতিক গুণটি সর্ব অবস্থায় একইভাবে সর্বত্র কাজ করছে সেটা কী? সেটা একটিমাত্র জিনিস, যা মানুষের মনে উভয়বলতা সৃষ্টির ঝোঁক সৃষ্টি করছে এবং নিষেধ লঙ্ঘন করতে তাকে প্রলোভিত করছে।

যে-ব্যক্তি টাবু-নিয়ম ভঙ্গ করে সে নিজেই টাবু হয়ে যায়, কারণ এদ্বারা অন্যকে নিয়ম ভঙ্গে প্রলুব্ধ করার সাংঘাতিক গুণ সে পেয়ে যায়। তার এই কাজ অন্যের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। কেন ঐ ব্যক্তি এই বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে, যা অন্য সবার পক্ষে নিষিদ্ধ? অন্যদের মনে এমন ভাবের উদয় হয়। আর, যদি ঐ ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যবহার অনুরূপভাবে নকল করতে অন্যদের উৎসাহিত করে তাহলে তো ঐ ব্যক্তি সত্যিই ছোঁয়াচে হয়ে দাঁড়ায়। অতএব এরূপ ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলাই উচিত।

কিন্তু কোনো ব্যক্তি টাবু ভঙ্গ না করেও স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে টাবু হয়ে যেতে পারে, যদি ঐ ব্যক্তি এমন বিশেষ কোন অবস্থা প্রাপ্ত হয় বা অন্যকে নিষিদ্ধ কাজ করতে প্রলুব্ধ করবে কিংবা তাদের মনে উভয়বলতার দ্বন্দ্বে এনে দেবে। সমস্ত বিশিষ্ট পদ বা অবস্থারই এই সাংঘাতিক শক্তি আছে। রাজা বা সর্দারের বিশিষ্ট ক্ষমতা অন্যদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে এবং সম্ভবত প্রত্যেকেই রাজা হতে পারলে খুশি হয়। মৃত ব্যক্তি, নবজাতক ও সামর্থ্যহীন নারীর অদ্ভুত নিঃসহায় অবস্থা সকলের মধ্যেই উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে যাদের কোন পরিপক্বতা ঘটেছে তাদের নতুন সুখভোগের শক্তি অন্যকে প্রলুব্ধ করে। অতএব এরূপ সকল ব্যক্তিই এবং এরূপ সব অবস্থাই টাবু। কারণ এই সব ব্যক্তি বা অবস্থা যেসব প্রলোভনের সৃষ্টি করে তার কাছে কারো হার মানা উচিত নয়।

এখানেও আমরা বুঝতে পারছি যেন বিভিন্ন লোকের 'মানা' বা বিভূতির মধ্যে যে আকর্ষণ আছে তা পরস্পরকে অকর্মণ্য করে দেয়। অর্থাৎ এক ব্যক্তির বিভূতি শক্তি অন্য ব্যক্তির বিভূতি শক্তিকে আংশিকভাবে নষ্ট করতে পারে। রাজার টাবু তার প্রজার পক্ষে খুবই শক্তিশালী, কেননা এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব খুব বেশি। কিন্তু একজন মন্ত্রী এঁদের মধ্যে সহজেই মধ্যস্থতার কাজ করতে পারেন। টাবুর কথা বাদ দিয়ে এখন সাধারণ মনোবিদ্যার ভাষায় প্রকাশ করলে মানে দাঁড়ায় যে: একজন প্রজা রাজার সংস্পর্শে এলে তার মনে যে বিরাট প্রলোভনের সৃষ্টি হয় তা থেকে সে সংকুচিত হয়ে পিছিয়ে যায়। কিন্তু সেই প্রজার পক্ষে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারির

সঙ্গে আদান-প্রদান করা খুব শক্ত হয় না। কারণ এই কর্মচারিকে ঈর্ষা করার মতো ততটা কিছু নেই এবং হয়তো বা প্রজার কাছে ঐ কর্মচারির পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও আছে। তেমনি মন্ত্রীও যে-পরিমাণ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন সেই অনুপাতে রাজার প্রতি তাঁর ঈর্ষাকে প্রশমিত রাখতে পারেন। অতএব, জাদুশক্তির মধ্যে অল্প তফাত থাকতে যে প্রক্ষোভনের সৃষ্টি হয় তার জন্য ভাবনার কিছু নেই: অসাধারণ রকমের তফাত থাকলে যেমন ভয়ের যথেষ্ট কারণ থাকে।

টাবু-নিষেধ লঙ্ঘন কীভাবে সামাজিক বিপদের সৃষ্টি করে তা এখন সুস্পষ্ট। নিষেধ লঙ্ঘন হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা যাতে সকলের ক্ষতি না হয়। এ বিপদ যে সত্যিই আছে তা বোঝা যাবে যদি আমরা নিজ্ঞান মনের ইচ্ছার প্রতিরূপ স্বরূপ পরিচিত আবেগগুলিকে বসাই। এতে অনুকরণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, ফলে সমাজব্যবস্থা শীঘ্র ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা। যদি অন্যেরা নিষেধ লঙ্ঘনে দণ্ড না দেয় তাহলে তারা যে দুষ্ট ব্যক্তিকে অনুসরণ করতেই চাইছিল সেকথা বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হবে।

টাবু নিষেধের গূঢ় অর্থ হয়ত উদ্‌বায়ু রোগের মতো অত বিশেষ প্রকৃতির না হতে পারে, কিন্তু স্পর্শভীতি বা ছুঁৎমার্গ (diire de toucher)-এর মতো টাবু-নিষেধের মধ্যেও স্পর্শতা যদি অংশ গ্রহণ করে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কোনো কিছুর সংগ্রহকরণের গোড়ায় রয়েছে স্পর্শন, তা সে ব্যক্তিই হোক আর বস্তুই হোক।

টাবুর মধ্যে নিহিত রয়েছে যে-ছোঁয়াচ সে-ই প্রলুব্ধ করছে এবং অনুকরণ করতে উসকানি দিচ্ছে, এ ব্যাখ্যা আমরা পূর্বেই দিয়েছি। টাবুর ছোঁয়াচ সবার আগে বস্তুতে সংক্রামিত হয়ে বস্তুকে টাবুতে পরিণত করে, এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে ঠিক সামঞ্জস্য থাকে না।

টাবুর এই সংক্রমণ ধর্ম উদ্‌বায়ুর মধ্যেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ অনুষঙ্গের মাধ্যমে সর্বদাই অজ্ঞাত আবেগ নতুন বস্তুতে অভিক্রান্ত হবার চেষ্টার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখন তাহলে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে: মানা বা বিভূতির সাংঘাতিক ঐন্দ্রজালিক শক্তি সত্যিকারের দুটি ক্ষমতার অনুরূপ। ব্যক্তিকে তার নিষিদ্ধ বাসনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং ঐরূপ বাসনার বশীভূত হবার জন্য নিষেধ অমান্য করতে মানুষকে প্রলুব্ধ করা। শেষোক্তটির গুরুত্ব যে বেশি তা খুবই স্পষ্ট। যাই হোক, নিষিদ্ধ কাজের স্মৃতি-জাগরণের সঙ্গে সেই কাজ সমাধা করার চেষ্টাও যদি ঐসঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত বলে ধরে নেওয়া যায় এবং তাকে অমার্জিত মনের পক্ষে প্রযোজ্য বলে ধরা যায়, তাহলে উল্লিখিত দুটো কাজই এক সূত্রে পুনর্মিলিত হয়। তাহলে দেখা যায়, স্মৃতি ও প্রলোভন এক সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অতএব একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, একজনের নিয়ম ভঙ্গ অন্যকে সেই কাজ করতে প্ররোচিত করে, অর্থাৎ নিষেধ অমান্য ছোঁয়াচের মতো প্রচালিত হয়। যেমন, টাবু মানুষ থেকে বস্তুতে এবং তা থেকে আবার অন্যত্র চালিত হয়ে থাকে।

টাবুর নিয়ম ভাঙলে প্রায়শ্চিত্ত বা কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা যদি তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়—যার মানে যে অধিকার বা স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল তার পরিবহণ—তাহলে

প্রমাণ হয় যে, টাবু নিয়ম মেনে চলা মানেই সত্যিকারের ঈপ্সিত জিনিস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখা, অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকার করা। একটা ভোগ আর একটা ত্যাগের দ্বারা রদ হয়ে যায়। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, অন্তত টাবুর আচার-আচরণের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা আত্মনিগ্রহ বেশি আদিম।

এখন দেখা যাক, উদ্‌বায়ুর অনুকর্ষী নিষেধের সঙ্গে টাবুর তুলনা করে আমরা টাবু সম্বন্ধে কী কী বিষয় জানতে পারলাম। টাবু একটি আদিম নিষেধ, বাইরে থেকে [কোনো প্রাধিকারী (authority) দ্বারা] মানুষের প্রবলতম বাসনা বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছে। মানুষের নিজ্ঞানে সর্বদাই এর বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা চলছে। যে-ব্যক্তি টাবু মেনে চলে তার মনে টাবুর আজ্ঞাভুক্ত সবকিছুতেই একটা দো-মনা ভাব থাকে। টাবুর ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে একথা বিশ্বাস করার কারণ, টাবু মানুষকে প্রলুব্ধ করে। টাবু ছোঁয়াচে অসুখের মতো, কারণ এর দৃষ্টান্ত সংক্রামক এবং নিষিদ্ধ ইচ্ছা নিজ্ঞানে অন্য কিছুতে অভিক্রান্ত হয়। পরিবহণ দ্বারা টাবু-নিয়ম ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করায় এই প্রমাণিত হয় যে, টাবু-নিয়ম মেনে চলার অন্তরালে কোনো কিছুর পরিহরণই নিহিত রয়েছে।

৩

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে অনুকর্ষী বায়ুর সঙ্গে টাবুর তুলনা করে আমাদের কী লাভ হলো এবং এই তুলনার উপর নির্ভর করে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তাতেই বা কী লাভটা হলো ? টাবুর আরও যেসব ব্যাখ্যা এতদিন দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় আমাদের এই ব্যাখ্যা যদি বেশি কার্যকর না হয় বা টাবুকে বোঝবার পক্ষে বেশি সহায়ক না হয় তাহলে আমাদের এই ব্যাখ্যার কোনো মূল্যই থাকে না। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এইটুকু সুবিধা যে হয়েছে সে-কথা আমরা দাবি করতে পারি ; তবে এই মতকে আরো জোরালো করার জন্য টাবু নিষেধ ও টাবু প্রথা সম্বন্ধে আমাদের আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা দরকার।

আমরা আরও একটা পথ অবলম্বন করতে পারি। আমরা যে সমস্ত অঙ্গীকার উদ্‌বায়ু থেকে সংগ্রহ করে টাবুতে তাদের অস্তিত্ব দেখিয়েছি তাদের কিছু কিছু কিংবা এর দ্বারা যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তাদের কিছু কিছু সোজাসুজি টাবু থেকেই প্রমান করা যায় কিনা সে-চেষ্টা করতে পারি। তার আগে কী চাইছি সে-বিষয়টি নিশ্চিতভাবে ঠিক করে নিতে হবে। কোনো এক আদিম নিষেধাজ্ঞা যা বাইরে থেকে আরোপিত হয়েছিল, তা থেকেই যে টাবুর সৃষ্টি হয়েছে সে কথা অবশ্য প্রমাণ করা যায় না। অতএব, টাবুর যে সমস্ত মানস পরিস্থিতি অনুকর্ষী বায়ুর ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি সেইগুলোই আমরা প্রথমে পাকা করার চেষ্টা করব। উদ্‌বায়ুর ক্ষেত্রে আমরা এই সব মানস উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছি রোগলক্ষণ—বিশেষ করে অনুকর্ষী ক্রিয়া, প্রতিরোধী প্রতিক্রিয়া ও আবেশজ আদেশ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। উভয়বল আবেগ বা প্রবৃত্তি থেকেই যে এই সব প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণ এদের মধ্যে পাওয়া যায়। এরা হয় একই সঙ্গে ইচ্ছা এবং প্রতি-ইচ্ছাকে চিত্রিত করছে কিংবা দুটো প্রবৃত্তির মধ্যে অধিকতর শক্তিশালীটির বশবর্তী হয়ে চলছে।

এখন যদি আমরা দেখতে পাই যে, উভয়বলতা, অর্থাৎ দুই বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থা টাবু নিয়মের মধ্যও বর্তমান, কিংবা যদি আমরা দেখি যে উদ্‌বায়বীয় আবেশের মতো টাবু-প্রক্রিয়ার মধ্যেও উভয়শক্তির এককালীন প্রকাশ হচ্ছে, তাহলে বুঝব অনুকর্ষী বায়ু ও টাবুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানস সম্পর্ক আমরা স্থাপন করতে পেরেছি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, দুটো মূল টাবু-নিষেধকে আমাদের ব্যাখ্যার আওতায় আনা যায় না, কারণ ঐ দুটি টোটেমের মধ্যে পড়ে। টাবু নিষেধের আর একটি অংশের ভিত্তি অপ্রধান। তা দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ ঐ সব জাতির মধ্যে টাবু দিয়েই আইনের কাঠামো তৈরি হয়েছে এবং সমাজ-সংগঠনে সাহায্য করেছে। অতএব, এরা আসল টাবুর কাছে অর্বাচীন, তাতে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ দলপতি বা পুরোহিতদের দ্বারা তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য যেসব টাবু প্রচলিত করেছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এছাড়া আরও অনেক নিয়ম রয়েছে ; সেগুলোকে আমরা আমাদের গবেষণার জন্য গ্রহণ করতে পারি। এই সব নিষেধের মধ্যে যেগুলো শত্রু, সর্দার ও মৃতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলোর উপরই আমি জোর দিতে চাই। আমাদের গবেষণার জন্য জে. জি. ফ্রেজার এর বিখ্যাত বই 'দি গোল্ডেন বাও' (**The Golden Bough**) থেকে উপাদন সংগ্রহ করেছি।

ক. শত্রুর প্রতি ব্যবহার

বর্বর এবং আধা-বর্বর জাতিরা তাদের শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুরভাবে খুব অসংযত ব্যবহার করে এবং তাতে কোনোরূপ মর্মপীড়া অনুভব করে না, এরূপ বিশ্বাস আমরা করে থাকি। এরাও যে নরহত্যা করার সময় এমন বহু নিয়ম-কানুন পালন করে যেগুলো টাবু প্রথার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, এই তথ্য আমাদের কাছে খুব প্রয়োজনীয়। এই নিয়মগুলিকে সহজেই চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—যথা, ১. মৃত শত্রুর সঙ্গে পুনর্মিলন, ২. নিরোধন, ৩. হত্যাকারীর কৃচ্ছ্রসাধন ও শুদ্ধিকরণ এবং ৪. কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া। এই সব আদিম জাতির সমাজ প্রথার বিবরণ সম্পূর্ণ নয়, কাজেই এগুলো কতটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য আর কতটাই বা সামান্য দু চারটি ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। সে যাই হোক, এরূপ হওয়াটা নেহাত এসব ব্যাপারের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্যের ফল। তবু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আমরা যেগুলি নিয়ে আলোচনা করছি সেগুলি সাধারণভাবেই প্রযোজ্য, ছুটকো দুএকটা ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

টিমোর দ্বীপে বিজেতা যোদ্ধার দল যখন শত্রুর ছিন্ন মস্তক হাতে নিয়ে ফিরে আসে তখন শত্রুর প্রতি পুনর্মিলনের আচার পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়। কারণ, ঐ যুদ্ধযাত্রীদলের সর্দারকে সাধারণ নিষেধাবলি ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করতে হয়। বিজয়ীর দল যখন গম্ভীরভাবে প্রবেশ করে তখন শত্রুর আত্মাকে তুষ্ট করার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। তা না হলে বিজয়ীর উপর দোষ আসতে পারে। নাচ এবং গানের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য

শোকপ্রকাশ করা হয় এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়—'তোমার মস্তক আমাদের কাছে আছে, তজ্জন্য তুমি কুপিত হইও না। আমাদের ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন না হইত তাহা হইলে হয়ত আমাদের মস্তক তোমাদের গ্রামে প্রদর্শিত হইত। তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমরা অনুষ্ঠান করিতেছি। তোমার আত্মা তৃপ্ত হউক এবং তুমি আমাদের শান্তিতে থাকিতে দাও। কেন তুমি আমাদের শত্রুতা করিয়াছিলে ? আমরা উভয়ে যদি বন্ধুভাবে বাস করিতাম তাহা হইলে কি আরও ভালো দেখাইত না ? তাহা হইলে তো তোমার রক্তপাত করার প্রয়োজন হইত না, এবং তোমার মস্তকও কর্তিত হইত না।[১]

সেলিবিস দ্বীপের পালু জাতির মধ্যে একই ধরনের প্রথা দেখা যায়। গল্লাস জাতিরা লড়াইয়ের শেষে গ্রাম ফেরার আগে মৃত শত্রুর আত্মার উদ্দেশ্যে বলি দেয়।[২]

আরও অন্যান্য জাতিদের মধ্যে দেখা যায়, শত্রু নিপাতের পর পূর্ব শত্রুর মধ্য থেকে বন্ধু, অভিভাবক এবং রক্ষক নির্বাচন করছে। বর্নিয়ো দ্বীপের বন্য জাতিরা শত্রুর ছিন্ন মস্তকের প্রতি যে সম্মান দেয়, তাই নিয়ে তারা খুব গর্ব করে থাকে। সারাওয়াক্ দ্বীপের ' See-Dayaksরা লড়াইয়ের শেষে শত্রুর ছিন্ন মস্তক নিয়ে বাড়ি ফিরে সেই মস্তকের প্রতি মাসের পর মাস অত্যন্ত সম্মান ও সহৃদয়তা দেখায়। তাকে নিজেদের ভাষায় মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নাম দিয়ে সম্বোধন করে। নিজেদের খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় খাদ্যের সঙ্গে আরও ভালো ভালো খাবার তার মুখে তুলে দেয়। খাওয়াবার শেষে একটি চুরুটও মুখে দিতে ভোলে না। মৃত শত্রুকে বারংবার অনুরোধ জানায়, সে যেন তার পূর্ব বন্ধুদের ঘৃণা করে এবং তার নতুন অতিথিসেবীদের ভালবাসে, কেননা, সে তো এখন তাদেরই একজন। আমাদের কাছে এসব খুব অদ্ভুত মন হতে পারে ; কিন্তু এই সব আচরণের মধ্যে একটুও ঠাট্টা বিদ্রূপ নেই।[৩]

উত্তর আমেরিকার কয়েকটি বন্যজাতি তাদের শত্রুর মস্তক ছেদনও সেই মস্তকের চামড়া ছাড়াবার পর যেভাবে শত্রুর জন্য শোকপ্রকাশ করে থাকে তা দেখে দর্শকরা হতভম্ব হয়ে গেছে। কোনো চক্‌টাও জাতীয় লোক শত্রুকে হত্যা করার পর একমাস ধরে শোকপ্রকাশ করে। এই সময়ে সে নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিনপাত করে। ডাকোটা ইণ্ডিয়ানরাও ঠিক এইভাবেই শোকপ্রকাশ করে থাকে। একটি নির্ভরযোগ্য লেখায় উল্লেখ দেখা যায় যে ওসাগা ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির প্রতি শোকপ্রকাশ করার পর শত্রুর প্রতিও শোকপ্রকাশ করে। ভাবটা তারা যেন পরস্পর বন্ধু ছিল।[৪]

শত্রু প্রতি ব্যবহারের আরও নানান জাতীয় টাবু প্রথার উল্লেখ করার আগে একটি যুক্তিযুক্ত আপত্তি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলে নেওয়া দরকার। আমাদের মন্তব্যের বিরুদ্ধে ফ্রেজার এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য লেখকের বই থেকে উদ্ধৃত করে দেখানো যায় যে, পুনর্মিলনের এই সব আচারাদি খুবই সহজবোধ্য এর পিছনে 'উভয়বল' জাতীয় কিছুর কোনো সম্পর্ক নেই। এই সব জাতির লোকের কুসংস্কারা-

১. Frazer, I.c. p. 166. ২. Paulitschke, Enthrogruphy of North-East Africa.
৩. Frazer Adonis, Attis, Osiris. P. 248, 1907. According to Hugh Laws Sarawak (London 1818).
৪. J. O. Dorsay, See Frazer, Taboo etc. p. 181.

ব্যক্তির আত্মার ভয়ে ভীত। এমন ভয় বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এবং এই ভয়কেই বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার ম্যাকবেথ এবং তৃতীয় রিচার্ডের অবাস্তব-প্রত্যক্ষ রূপ দিয়ে নাট্যমঞ্চে প্রদর্শন করেছেন। এরপর আমরা যে সমস্ত পুনর্মিলনের নিয়মাদি, নিষেধাদি বা কৃচ্ছ্রসাধনের কথা আলোচনা করব তা সমস্তই উপরোক্ত কুসংস্কার থেকে যুক্তিযুক্তভাবে প্রমাণ করা যায়। এছাড়াও যেসব অনুষ্ঠানাদি চতুর্থ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের ব্যাখ্যা করতেও ঐ একই যুক্তি দেখানো হয়। কারণ ঐসব লেখকেরা একটিমাত্র ব্যাখ্যাকেই স্বীকার করেন এবং সেটি হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির আত্মা হত্যাকারীকে অনুসরণ করে এবং ঐ আত্মাকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট করার জন্য নানান অনুষ্ঠান সাধিত হয়।[৫] অধিকন্তু আদিম জাতিরা নিজেরাই স্বীকার করে যে তারা মৃত শত্রুর আত্মাকে খুব ভয় পায়। এবং যা আমাদের আলোচ্য বিষয় সেই টাবু প্রথার সঙ্গে দায়যুক্ত হচ্ছে এই ভয়।

এরূপ আপত্তি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য এই যুক্তি যদি (এই সঙ্গে) যথেষ্ট হোত তাহলে অন্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা না-করে আমরা নিশ্চয়ই সানন্দে সরে দাঁড়াতাম। এই আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা আপাতত ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখলাম। বর্তমানে আমরা আগে যে-আলোচনা টাবু সম্বন্ধে করেছি তারই ব্যাখ্যার সঙ্গে কেবল তুলনা করতে চাই। টাবুর সমস্ত নিয়ম আলোচনা করে আমরা এই উপসংহার করতে বাধ্য যে, কেবলমাত্র বিক্ষুব্ধ ভাবাবেগ নয়, এছাড়া আরও অনেক মানসিক আবেগ শত্রুর প্রতি ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কৃতকর্মের অনুশোচনা, শত্রুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং শত্রুকে হত্যার জন্য মনস্তাপ, এসবই বর্তমান। এই সব দেখে মনে হয় যে, কোন দেবাদেশ পাবার বহু আগেই, হত্যা তুই করিস না হত্যা করলে তার জন্য শাস্তি পেতেই হবে এইরূপ ঐশ্বরিক নির্দেশ অসভ্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

এখন অবশিষ্ট টাবু-বিধিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। নরহত্যাকারী বিজয়ী ব্যক্তির উপর যেসব নিষেধাজ্ঞা প্রায়ই আরোপিত হয় সেগুলো অধিকাংশই খুব গুরুতর রকমের। তাইমুর দ্বীপের বিজয়ী বীর (পূর্ববর্ণিত পুনর্মিলন প্রথার সঙ্গে তুলনীয়) লড়াইয়ের পর কোনক্রমেই নিজের বাড়ি ফিরতে পারে না। তার জন্য একটা বিশেষ কুঁড়ে ঘর তৈরি হয়। এই কুঁড়ে ঘরের মধ্যে সে দুমাস বাস করে এবং এই সময়ে সে আত্মশুদ্ধির জন্য নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে রত থাকে। এই দুমাস সে তার স্ত্রীর মুখ দেখবে না এবং নিজে আহার্য গ্রহণ করবে না, অন্য একজন তার মুখে খাদ্যবস্তু তুলে দেবে।[৬] দায়ক (Dayak)-জাতীয় যোদ্ধারা যুদ্ধ জয়ের পর কয়েক দিন নিভৃতে বাস করে এবং কতকগুলো খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে না। লৌহ ছোঁয়া নিষিদ্ধ হতে পারে এবং স্ত্রীদের থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। নিউগিনির নিকটবর্তী লোগী (Lagea) দ্বীপে যেসব লোক শত্রুবধ করবে কিংবা বধ করতে সাহায্য করবে তাদের নিজেদের ঘরে এক সপ্তাহ তালাবন্ধ থাকতে হবে। তারা বন্ধু-

---

৫. Frazer. Tobaoo, pp. 166-74. ঢালের উপর শব্দ করা, হাঁক-ডাক করা, বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্রের সংঘর্ষণে শব্দসৃষ্টি করা প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানের অন্তর্গত।

৬. Frazer, Taboo p. 166. according to S. Mueller Reisen en Onderzoekingen in den Indischen Arbhipel (Amsterdam, 1857).

বান্ধব ও স্ত্রীদের সঙ্গে যাবতীয় আদান-প্রদানকে এড়িয়ে চলবে এবং নিজেদের হাত দিয়ে খাদ্যবস্তু ছোঁবে না। এবং এই কদিন তাদের জন্য ভিন্ন-পাত্রে-রাঁধা বিশেষ প্রকারের নিরামিষ খাদ্য ছাড়া অন্য খাদ্য খাবে না। এই সর্বশেষ নিষেধটির কারণস্বরূপ বলা হয় যে, মৃত ব্যক্তির রক্তের ঘ্রাণ তাদের পেতেই হবে, নইলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং শেষে মারা যাবে ; নিউগিনির তোরিপি কিংবা মোটুমোটু জাতির মধ্যে নরঘাতককে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং নিজের হাতে কোনো খাদ্য ছুঁতে পাবে না। কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে বিশেষ একপ্রকার খাবার খাইয়ে দেবে। যতদিন না আবার অমাবস্যা আসে ততদিন এমনি নিয়ম পালন করে চলতে হবে।

ফ্রেজার বর্ণিত বিজয়ী নরঘাতকদের সবগুলো আমি উল্লেখ করছি না। যে সমস্ত ক্ষেত্রে টাবু বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট কিংবা যেসব জায়গায় নিষেধাজ্ঞাগুলি কৃচ্ছ্রসাধন, শুদ্ধিকরণ এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেবলমাত্র সেইগুলোই বিশেষ করে উল্লেখ করছি।

নিউগিনির মোনাম্বো জাতীয় কোনো লোক যদি লড়াইয়ে কোনো শত্রুকে হত্যা করে তাহলে সে অশুদ্ধ বা 'নোংরা' হয়ে যায়। অন্তঃসত্ত্বা হলে কিংবা রজস্বলাকালীন স্ত্রীলোককে ঠিক ঐ শব্দের দ্বারাই অভিহিত করা হয়। মোনাম্বো জাতীয় উপরোক্ত হত্যাকারীকে বেশ কিছুদিন পুরুষদের আড্ডাঘর থেকে বেরুতে দেওয়া হয় না। এই সময়ে তার গ্রামের লোক তার চারদিকে জমায়েত হয় এবং নাচ-গান দ্বারা জয়কে সম্বর্ধিত করে। সে কিন্তু কাউকে ছুঁতে পারে না ; এমনকি নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও না। যদি সে ছুঁয়ে ফেলে তাহলে স্পৃষ্ট ব্যক্তির ফোঁড়া উঠবে। সবশেষে সে স্নানাদি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের পর শুদ্ধ হয়।

উত্তর আমেরিকার নাংশেজ জাতির মধ্যে যখন নবীন যোদ্ধা সর্বপ্রথম শত্রুমস্তকের অধিকারী হয় তখন দুমাস ধরে কতকগুলি ত্যাগ স্বীকার করতে তারা বাধ্য হয়। তারা নিজেদের স্ত্রীর সঙ্গে শুতে পাবে না এবং মাংস খেতে পাবে না ; কেবলমাত্র মাছ ও জই-এর পুডিং খেয়ে থাকতে হবে। যখন কোনো চোক্‌টাও শত্রু নিধনের পর শত্রুর মাথার চামড়া খুলে ফেলে তখন থেকে এক মাসের জন্য সে শোকাশৌচ পালন করে। এই সময়ে সে তার চুল আঁচড়াতে পারবে না। যদি তার মাথা চুলকোয়, হাত দিয়ে সে চুলকোতে পারে না। চুলকোবার জন্য সে একটা লাঠি ব্যবহার করতে পারে।

কোনো পিমা-ইণ্ডিয়ান কোনো আপাচেকে হত্যা করলে তাকে খুব কষ্টকর অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজের শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ষোল দিনের উপবাসের মধ্যে সে মাংস বা লবণ ছুঁতে পারে না, আগুনের দিকে তাকাতে পারে না বা কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না। তাকে নির্জন বনে বাস করতে হবে। সেখানে কেবল জনৈক বৃদ্ধা সামান্যমাত্র খাদ্য তাকে পৌঁছে দেবে। যখন সে নদীতে স্নান করে ফিরবে মাথায় একতাল কাদা বয়ে নিয়ে আসবে। এটা শোক প্রকাশের একটা চিহ্ন। সতের দিনের দিন জনসাধারণের একটা অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা তাকে এবং তার অস্ত্রকে পবিত্র করা হবে। পিমা-ইণ্ডিয়ানরা নরহত্যা-টাবুকে যতটা গুরুতর বলে মনে করে তাদের শত্রু আপাচেরা কিন্তু ততটা মনে করে না, এবং তাদের শত্রুর মতো

প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠান লড়াই শেষ হওয়া পর্যন্ত মুলতুবিও রাখে না। পিমা-ইণ্ডিয়ানদের এই কড়া নীতিজ্ঞান বা ধর্মজ্ঞান থাকার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তিপরীক্ষায় এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জন্য অনন্যসাধারণ সাহসী হয়েও আমেরিকার সঙ্গে আপাচেদের যুদ্ধে আমেরিকার কাছে মিত্রপক্ষ হিসাবে এদের দুর্নাম আছে।

শত্রুহত্যাকারীদের শুদ্ধিকরণ ও প্রায়শ্চিত্তের নানারূপ পন্থা খুঁটিয়ে দেখতে খুব ভালো লাগে। তবে আমি আর বেশি উদাহরণ উল্লেখ করব না, কেননা তা থেকে নতুন কোনো হদিশ পাবার আশা নাই। সাময়িক কিংবা চিরস্থায়ীভাবে পেশাদার হত্যাকারীদের স্বতন্ত্রীকরণ যা আমাদের কাল পর্যন্ত চলে আসছে এইটাই এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যযুগীয় সমাজে 'নিষ্কর-ভূম্যধিকারী'র (free holder) অবস্থা থেকে আদিবাসীদের টাবু সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা পাওয়া যায়।[৭]

পুনর্মিলন, নিষেধ, প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধিকরণের নিয়মাদির যেসব চলিত ব্যাখ্যা রয়েছে তার মধ্যে দুটি সূত্র বর্তমান। যথা, মৃত ব্যক্তির টাবুর বিস্তৃতি—এর সংস্পর্শে যা-কিছু আসবে তাই টাবু হয়ে যাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে মৃতের আত্মার প্রতি ভয়। এই দুটি মূল সূত্রের কিরূপ সংমিশ্রণের দ্বারা অনুষ্ঠানগুলির ব্যাখ্যা করা যাবে? এই দুয়ের উপযোগিতা কি সমান? কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনটি প্রধান, এবং কোনটি অপ্রধান? এসব প্রশ্নের উত্তর বলা হয়নি। এবং এসব প্রশ্নের সমাধান করাও সহজসাধ্য নয়। এই সব বিভেদ বিচারের মধ্যে থেকে আমরা একীকরণের উপর জোর দিচ্ছি; কেননা শত্রুদের প্রতি আদিবাসীদের প্রক্ষোভের উভয়বলতা থেকে আমাদের এই ব্যাখার সমস্ত সূত্র পাওয়া যায়।

খ. শাসকশ্রেণী সংক্রান্ত টাবু

দলপতি, রাজা ও পুরোহিতদের প্রতি আদিম জাতিদের ব্যবহার দুটি মূলসূত্র দ্বারা চালিত হয়। এই সূত্র দুটি পরস্পর-বিরোধী তো নয়ই, বরং তারা একে অপরকে সাহায্য করে। এদের সপক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় দিক থেকে সতর্ক থাকতে হবে।[৮]

এই উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয় টাবুর অসংখ্য নিয়ম-কানুন দিয়ে। শাসকের বিরুদ্ধে সতর্কতা কেন দরকার তা আমরা সবাই জানি। কেননা, এঁরা তড়িৎ শক্তির মতো গুণসম্পন্ন। এঁরা সাংঘাতিক এবং অলৌকিক ম্যাজিক শক্তির ধারক। স্পর্শমাত্র এই শক্তি ভিন্ন ব্যক্তিতে চালিত হয়ে যায়; এবং যে-ব্যক্তির অনুরূপ শক্তি না থাকে তাকে তড়িৎ শক্তির মতো ধ্বংস করে ফেলে। এই সাংঘাতিক রকমের শুদ্ধতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সব রকমের স্পর্শ থেকে এড়িয়ে চলতে হবে। যদি এড়িয়ে চলা সম্ভব না হয়, তাহলে ভয়ঙ্কর কুফলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কোনো এক অনুষ্ঠান বার করতেই হবে। পূর্ব আফ্রিকার 'নুবা'দের কথাই ধরা যাক না কেন। এরা বিশ্বাস

---

৭. এই সব উদাহরণের জন্য, Frazer. Taboo, pp. 165-70, 'Man-slayers Tabooed' দ্রষ্টব্য।

৮. Frazer, Taboo. p. 132. 'He must not only be guarded, he must also be guarded against'- তাকে শুধু রক্ষা করলেই হবে না, তাকে (শত্রু থেকেও) রক্ষা করতে হবে।

করে, পুরোহিত বা রাজার বাড়িতে প্রবেশ করলে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু এই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে যদি বাড়ির মধ্যে ঢুকেই বাঁ কাঁধটা খালি করে দেয়, এবং রাজা যদি হাত দিয়ে ঐ স্থানটা স্পর্শ করে। এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে-রাজার স্পর্শ থেকে বিপদের আশংকা ছিল সেই রাজারই স্পর্শ ঐ বিপদ থেকে মুক্ত করল এবং নিয়ম-লংঘনকারীকে রক্ষা করল।

রাজার স্পর্শে যে রোগের উপশম হয় তার দৃষ্টান্তের জন্য আদিম জাতির মধ্যে খুঁজে বেড়াতে হবে না। খুব বেশি দিন হয়নি, যখন ইংলণ্ডের রাজারা স্ক্রোফুলা রোগে নিজেদের এই শক্তি প্রয়োগ করতেন। তখন তো এই রোগকে 'রাজপীড়া' নামেই অভিহিত করা হোত। কি রানী এলিজাবেথ, কি তাঁর অধস্তন উত্তরাধিকারীরা কেউই এই বিশেষ ক্ষমতাটিকে ত্যাগ করেননি। শোনা যায়, ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চার্লস একসঙ্গে একশ রোগীকে রোগমুক্ত করেছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ বিপ্লবের পর তাঁর লম্পট পুত্র দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে স্ক্রোফুলা রোগের রাজকীয় চিকিৎসার চলন সবচেয়ে বেশি হয়েছিল।

শোনা যায়, এই রাজা তাঁর রাজত্বকালে এরূপ এক লক্ষ রোগীকে স্পর্শ করেছিলেন। কোনো এক সময়ে নাকি রোগীদের ভিড়ের চাপে ভালো হওয়ার বদলে সাত ব্যক্তি ইহলীলা সংবরণ করেছিল। এই থেকেই বোঝা যায়, কী ধরনের ভিড়টা জমত। স্টুয়ার্টদের নির্বাসনের পর সন্দিগ্ধচিত্ত তৃতীয় উইলিয়ম যখন রাজা হলেন তিনি এই জাদু চিকিৎসা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেন। একটি ক্ষেত্রে তিনি রাজি হয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, 'ঈশ্বর তোমাদের স্বাস্থ্য ভালো করুন এবং বেশি করে আক্কেল দিন।'[৯]

এই ছোঁয়ার ফলাফল যে কত সাংঘাতিক হতে পারে তা কয়েকটা উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে। এর ফলে কোনো লোক, এমনকি অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুঁলেও, রাজার বিরুদ্ধে কিংবা তার নিজের সবকিছুর বিরুদ্ধে সজাগ এবং কর্মঠ হয়ে উঠতে পারে। নিউজিল্যাণ্ডের কোনো এক উঁচুদরের সর্দার এবং অতি ধার্মিক ব্যক্তি এক সময়ে তার উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট খাদ্য রাস্তার পাশে ফেলে যায়। একজন যুবক-ভৃত্য, বেশ শক্তসমর্থ স্বাস্থ্যবান পুরুষ, ঐ খাদ্যগুলি দেখে খেতে শুরু করে দেয়। যখন সবেমাত্র তার খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় এক ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হয়ে তাকে বলে যে সর্দারের খাবার খেয়ে সে সাংঘাতিক অপরাধ করেছে। লোকটি খুব শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধা ছিল, কিন্তু ঐ কথা শোনামাত্র সে ভেঙে পড়ল এবং তার সাংঘাতিক রকমের খেঁচুনি শুরু হলো। শেষে পরের দিন সূর্যাস্তের সময় সে মারা পড়ল।[১০]

একজন মাওরি স্ত্রীলোক এক সময় একটা ফল খায়। খাওয়ার পরে সে শোনে যে, ফলটা যে-জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই স্থানটি নিষিদ্ধ স্থান, অর্থাৎ টাবু। এই কথা শোনামাত্র সে চীৎকার করতে শুরু করে যে, যে-সর্দারের আত্মাকে সে

---

৯. Frazer, The Magic, Art. I, p. 368.

১০. Old New Zealand, by a Pakeha Maori (London, 1884), see Frazer, Taboo, p. 135.

অবমাননা করেছে সেই আত্মা তাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে। এই ঘটনা ঘটেছিল বিকেলবেলা, তার পরের দিন দুপুরে সে মারা গেল।[১১]

কোনো এক সময়ে এক মাওরি সর্দারের চকমকির বাক্স বেশ কয়েকজনের প্রাণহানির কারণ হয়েছিল। সর্দার তার বাক্সটি হারিয়ে ফেলে। যারা সেটা খুঁজে পায় তারা ঐ চকমকি ঠুকে আগুন করে তাদের পাইপ ধরায়। কিন্তু যখন শুনল কার চকমকি তারা ব্যবহার করেছে তখন ভয়েই তাদের সকলের প্রাণবায়ু উড়ে গিয়েছিল।[১২]

সর্দার এবং গুরুপুরোহিতদের মধ্যে ভয়ঙ্কর লোকেদের ঘিরে জনসাধারণের নাগালের বাইরে কেন যে এই অভেদ্য প্রাচীর তোলার প্রয়োজন হয়েছিল তা বোঝা মোটেই কষ্টকর নয়। আমাদের মনে হয়, যে-পৃথকীকরণ টাবু-নিয়ম থেকে শুরু হয়েছিল তা আজও দরবারি অনুষ্ঠানের মধ্যে বেঁচে রয়েছে।

কিন্তু এরূপ উচ্চপদস্থ লোকদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন থেকেই যে এই ধরনের অধিকাংশ টাবুর উৎপত্তি হয়েছে, সম্ভবত সে-কথা ঠিক নয়। এর আর একটা দিকও আছে। এই সব ব্যক্তিরা যাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে তাদের হাত থেকে এদের (সর্দার প্রভৃতি) রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাও টাবুর সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। এবং এই থেকেই দরবারের কেতাদুরস্ত নিয়ম-কানুনের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রজার সুখ-দুঃখের জন্য রাজার দায়িত্ব প্রচুর। এই জন্য যে কোনো সম্ভাব্য বিপদ থেকে রাজাকে নিরাপদে রাখা প্রয়োজন! এক কথায় বলা চলে, রাজাই পৃথিবীটাকে চালাচ্ছে। বৃষ্টি এবং সূর্যকিরণ, যার জন্য মাটিতে ফল ফুল ফলছে, তার জন্য প্রজাদের রাজাকেই ধন্যবাদ দিতে হবে। শুধু তা কেন, যে বাতাসের সাহায্যে জাহাজ তীরে ভিড়ছে এবং যে-মাটিতে মানুষে পা দিয়ে চলে হেঁটে বেড়াচ্ছে তার জন্যও ধন্যবাদ সেই রাজারই প্রাপ্য।[১৩]

যা কেবলমাত্র দেবতাদের দ্বারাই সম্ভব, সুখ-শান্তি দান করার সেই সব অলৌকিক ক্ষমতা এই সব অসভ্যজাতীয় রাজাদের দ্বারাও সম্ভব। অতএব, সভ্যতার পরবর্তী যুগেও যদি কেউ বলে নরপতিরাই তার প্রজাদের সর্বসুখশান্তিবিধায়ক, তাহলে তাকে দরবারের বিশিষ্ট একজন চাটুকার ও ভণ্ড ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

যারা ক্ষমতার এরূপ পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছে তাদের হবু বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য কড়া পাহারা দেওয়া দরকার, এমন কথা শুনলে স্বভাবতই অসঙ্গতির কথা মনে ওঠে। কিন্তু রাজকীয় পুরুষদের প্রতি অসভ্য জাতিদের ব্যবহারের মধ্যে এইটাই একমাত্র অসঙ্গতি নয়। এই জাতীয় লোকেরা তাদের রাজারা শক্তি ঠিকমত ব্যবহার করছে কিনা তার হিসেব রাখারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করে। রাজাদের সদিচ্ছা ও সৎ প্রবৃত্তির ওপর এদের পুরোপুরি আস্থা নেই। রাজাদের জন্য টাবু নিয়মের প্রবর্তনের মধ্যে খানিকটা অবিশ্বাসের রেশ মিশে আছে। ফ্রেজার সাহেব বলেন,[১৪] আমরা যে

১১. W, Brown. New Zealand and Its Aborigines (London, 1845) Frazer, l.c.
১২. Frazer. l.c,
১৩. Frazer. Taboo. The Burden of Royalty, p. 7.
১৪. l. c. p. 7.

ধরনের রাজতন্ত্রের আলোচনা করছি তার ক্ষেত্রে পুরাকালের রাজত্ব মানেই স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব—যেখানে মানুষ কেবল রাজার প্রয়োজনের জন্যই বেঁচে থাকত এমন কথা মোটেই খাটে না। বরং বলা চলে, প্রজার জন্যই ছিল রাজা ; রাজা যতদিন প্রজার সুখ সুবিধার জন্য প্রাকৃতিক শক্তিকে হুকুম করে নিজের শক্তির সদ্ব্যবহারের প্রমাণ দিতে পারত ততদিনই তার জীবনের মূল্য থাকত। যখনই সে এই শক্তিমত্তা দেখাতে না পারত, তখনই পূজা, পরিচর্যা, যাগ-যজ্ঞ যা-কিছু দিয়ে তার ষোড়শোপচার সাজানো হোত তা সবই বন্ধ হয়ে যেত এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা ঘুচে গিয়ে ঘৃণা ও ধিক্কার দেখা দিত। লাঞ্ছনার সঙ্গে তাকে পদচ্যুত করা হোত। রাজা প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত। একদিন যাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছে, পরে তাকেই পাপী বলে হত্যা করেছে। কিন্তু প্রজাদের ব্যবহারে এই পরিবর্তনের মধ্যে কোনো খলতা ও অসঙ্গতি নেই। কেননা রাজা যদি তাদের ঈশ্বর হয় তাহলে সে তাদের রক্ষকও বটে। এবং রক্ষক হয়ে যদি সে প্রজাদের রক্ষা করতে না পারে তাহলে সরে গিয়ে যে তাদের রক্ষা করতে পারবে এমন একজনকে স্থান ছেড়ে দিতেই হবে। যতদিনে রাজা তাদের আশানুরূপ প্রতিদান দিতে পারবে, ততদিন রাজার জন্য তাদের যত্নের সীমা-পরিসীমা থাকবে না এবং রাজাকেও বাধ্য করবে নিজের প্রতি যত্ন নিতে। এইরূপ রাজার চারিদিকে গণ্ডি দেওয়া থাকে। জমজমাট আদব-কায়দা ও কর্তব্য-অকর্তব্যের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই গণ্ডি। এই গণ্ডি রাজাকে আরাম দেবার উদ্দেশ্যে তো নয়ই, তাকে সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যেও নয়, বরং যাতে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে নিজেকে, প্রজাদের এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধ সব জড়িয়ে একটা প্রলয়-কাণ্ড না-করে ফেলে তার থেকে আটকে রাখাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। রাজার স্বাচ্ছন্দ্যের কথা দূরে থাক, এই সব নিয়ম কানুনের বেড়াজাল দিয়ে, তার ক্রিয়াকর্মের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ও স্বাধীনতা খর্ব করে যে জীবনকে রক্ষা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য সেই জীবনকেই দুঃখের বোঝা করে তোলে।'

টাবু অনুষ্ঠানাদির কবলে পড়ে পবিত্র শাসনকর্তার জীবন যে কিরূপ নিষ্পিষ্ট ও জর্জরিত হয়ে উঠতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া যায় খ্রিষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে জাপানের মিকাডোর জীবন-বৃত্তান্ত থেকে। একটা দুশ বছরের পুরানো[১৫] ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় ; সে মনে করে পা দিয়ে মাটি ছোঁয়াটা তার পদমর্যাদার ও পবিত্রতার পক্ষে হানিকর। এই কারণে যদি তাকে কোথাও যেতে হয় তাহলে অন্য কারও কাঁধে চড়ে সে যাবে। মুক্ত বাতাসে তার শরীর অনাচ্ছাদিত করা চলবে না এবং সূর্যও তার মাথার উপর কিরণ বিস্তার করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। রাজার সারা শরীরকে এমন পবিত্র বলে মনে করা হয় যে চুল, দাড়ি, নখ কাটবার তার উপায় নেই। যাই হোক, যাতে রাজা খুব নোংরা না হয়ে পড়ে তার জন্য প্রজারা রাজাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাত্রে পরিষ্কার করতে পারে। এরূপ করার পক্ষে মত হচ্ছে যে, ঘুমন্ত অবস্থায় রাজার শরীর থেকে যা নেওয়া হয় তা চুরি করে নেওয়া হলো এবং এই ধরনের চুরিতে রাজার পদমর্যাদায় বা পবিত্রতার হানি হয়

১৫. Kaempfer, History of Japan. see in Frazer. l. c. p. 3.

পুরাকালে মাথায় মুকুট পরে রাজাকে প্রত্যহ সকালে কয়েক ঘণ্টা ধরে সিংহাসনে বসে থাকতে হোত। সাধারণভাবে বসে থাকা নয়। যতক্ষণ বসে থাকবে সেই সময়ের মধ্যে হাত, পা, মাথা, চোখ এমনকি শরীরের কোনো অংশই নাড়তে পারে না। এমনি করে থাকতে পারলেই তার রাজ্যে শান্তি ও নিরুপদ্রবতা বজায় থাকবে। আর দুর্ভাগ্যবশত যদি কোনো একদিকে নড়েছে বা রাজ্যের কোনো দিকে কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়েছে তাহলেই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা দেশকে ধ্বংস করে দেবে—এমনি আশঙ্কা সবার মনে জেগে উঠবে।'

অসভ্য জাতীয় রাজাদের প্রতি যেসব টাবু ন্যস্ত হয় তার মধ্যে কয়েকটা টাবু খুনী লোকদের প্রতি দণ্ড-বিধানের কথা মনে করিয়ে দেয়। পশ্চিম আফ্রিকার লোয়ার গিনির পাদ্রোঁ অন্তরীপের শার্ক পয়েন্ট নামে জায়গাটিতে কুকুলু পুরোহিত-রাজ একা বনে বাস করে। সে তার স্ত্রীকে ছুঁতে পাবে না। এমনকি সে তার চেয়ার থেকে উঠতে পারে না। এই চেয়ারে বসা অবস্থাতেই তাকে ঘুমোতে হবে। সে যদি শুয়ে পড়ে, বাতাস আর বইবে না; কাজেই জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। এর কর্তব্য হচ্ছে ঝড়কে করায়ত্ত রাখা, এবং সাধারণভাবে একটা সুসামঞ্জস্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা।[১৬] লেখক বাস্তিয়ান বলছেন, লোঙ্গো দ্বীপে যে-রাজা যত বেশি টাবু মেনে চলবে সেই রাজা ততই শক্তিশালী। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও শিশুকাল থেকেই তাদের কাছে আবদ্ধ। যতদিন সে বড় হচ্ছে ততদিন তারা তার চারদিকে জমায়েত হবে এবং তার সিংহাসন আরোহণের কাছাকাছি সময়ে তারা এর দম বন্ধ করে দেবে।

রাজা ও পুরোহিতদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাবুর যে-বিবরণ আমরা দিলাম আমাদের কাজের জন্য তার চেয়ে বেশি আর দরকার নেই। গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য সম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়ম পালন—এই দুটিই মুখ্য বিষয়, এখানে এইটুকুই আমরা বলে রাখতে চাই। তবে সভ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত দুটো টাবুর অনুষ্ঠানের বিষয় উদাহরণ স্বরূপ এখানে দিচ্ছি। এই টাবু দুটো অবশ্য সভ্যতার অনেক উচ্চ ধাপের লোকেদের মধ্য থেকে গৃহীত। এই থেকে বেশ বোঝা যায় যে, এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহচর্যে কী পরিমাণে প্রাচীন প্রথাগুলি বেঁচে রয়েছে।

রোমের 'জুপিটর' গির্জার প্রধান পুরোহিত 'ফ্লামেন দিয়ালিস' (Flamen Dialis) কে যেসব টাবু নিয়ম পালন করতে হোত তার সংখ্যা অসাধারণ রকমের বেশি ছিল। সে ঘোড়ায় চড়তে পেত না, ঘোড়া বা অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত মানুষকে দেখবার উপায় ছিল না, ভাঙা নয় এমন কোনো আংটি পরতে পেত না, তার পোশাকে কোনো গিঁট থাকা চলত না, সে ময়দা বা খামি ছুঁতে পেত না; এমনকি ছাগল, কুকুর, কাঁচা মাংস, বিন ও আইভিলতার নাম পর্যন্ত নিতে পেত না। তার চুল কোনো স্বাধীন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কাটতে পারত না এবং ব্রোঞ্জের ছুরি ছাড়া অন্য কিছুতে কাটা চলত না। চুল আঁচড়ানোর পর ছেঁড়া চুল এবং নখের টুকরো কোনো শুভ বৃক্ষের (lucky tree) তলায় পুঁতে রাখতে হোত। সে মৃত ব্যক্তিকে ছুঁতে পেত না, আঢাকা মাথায় ফাঁকা

১৬. Bastian, The German Expedition to the Coast of Loango cited by Frazer, l.c. p. 5.

জায়গায় বেরুতে পারত না। এই ধরনের আরও অনেককিছু নিয়ম তাকে মানতে হোত। এর স্ত্রী 'ফ্লামিনিকা'র (Flaminica) আবার নিজস্ব কতকগুলি পালনীয় নিয়ম ছিল। যেমন, বিশেষ একপ্রকার সিঁড়িতে তাকে তিন ধাপের বেশি চড়তে দেওয়া হোত না। কোনো কোনো ছুটির দিন সে চুল আঁচড়াতে পেত না। স্বাভাবিক-ভাবে মৃত্যু হয়েছে এমন পশুর চামড়া থেকে তার জুতা তৈরি হোত না। এর জন্য বলি-দেওয়া পশুর চামড়া চাই। বিদ্যুৎ চমকানোর শব্দ শুনলেই সে নোংরা হয়ে গেল; প্রায়শ্চিত্ত করে তবে শুদ্ধ হতে হোত।[১৭]

প্রাচীনকালে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজাদের কতকগুলি অদ্ভুত আচার মেনে চলতে হোত। আচার-বিচার ঠিকমত মেনে চলার ওপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করত। অনাচার হলেই দেশের ক্ষতি হোত। 'বুক অব্ রাইট্স্' বা নিয়মের নির্ঘণ্ট নামক পুস্তকে এই সব আচার-বিচারের পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়। সবচেয়ে পুরনো যে দুটো তারিখ পাওয়া যায় তা হচ্ছে ১০৯০ (খ্রি) ও ১৪১৮ (খ্রি)। নিষেধগুলি খুঁটিনাটি বিষয়কেও বাদ দেয়নি। এবং বিশেষ কোনো সময়ে বা স্থানে এগুলি পালন করবার নির্দেশ আছে। যেমন, কোনো কোনো শহরে রাজা সপ্তাহের কোনো বিশেষ দিনে থাকতে পাবে না, কোনো বিশেষ সময়ে কোনো কোনো নদী পার হতে পাবে না কিংবা কোনো সমতল ভূমিতে রাজা পুরো নয়দিন তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে পাবে না। এবং আরও অনেক কিছু।[১৮]

বহু অসভ্য জাতির মধ্যে পুরোহিত-রাজাদের টাবু-নিয়ম পালনে এত কড়াকড়ি হয়েছিল যে তার ফলাফল ইতিহাসের বস্তু হয়ে গেছে। এই সব ঘটনা আমাদের কাজের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। পুরোহিত-রাজা হওয়ার সম্মান শেষে অবাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছিল। এই সম্মানের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রায়ই পালিয়ে বাঁচত; যেমন ক্যাম্বোডিয়াতে অগ্নিরাজ ও বরুণরাজের পদের উত্তরাধিকারীকে প্রায়ই জোর করে এই সম্মানীয় পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। 'নিউয়ে' (Niue) বা 'স্যাভেজ আইল্যাণ্ড-প্রশান্ত মহাসাগরের একটি প্রবাল দ্বীপ। এখানে রাজতন্ত্র শেষ হয়ে গেছে বললেই হয়, কেননা, কেউই রাজার সাংঘাতিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী নয়। পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি জায়গায় রাজার মৃত্যুর পর এক সাধারণ সভা ডাকা হয়। এই সভা ঠিক করে কাকে উত্তরাধিকারী করা হবে। যার কপালে এই দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপানো হয় সে যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজার দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ধরে কুখ্যাত রাজবাড়িতে আবদ্ধ রাখা হয়। কখনও কখনও সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সম্মানের বোঝা এড়াবার জন্য সুযোগ খোঁজে। এর জন্য কোনো কোনো সর্দার তাকে রাজসম্মান নিতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য দিন-রাত সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত থাকে।[১৯] সিয়েরা লিওনে (Sierra Leone)-নিগ্রোদের মধ্যে রাজকীয় সম্মান নেওয়ার বিরুদ্ধে এত বেশি আপত্তি হয় যে তারা বাধ্য হয়ে

---

১৭. Frazer, l.c. p. 13.

১৮. Frazer, l.c. p. 11.

১৯. A. Bastian, The German Expedition to the Coast of Loango, cited by Frazer, l.c. p. 18.

কোনো অপরিচিত লোককে রাজা বানায়।

ফ্রেজার সাহেবের মতে, ইতিহাসের প্রগতির সঙ্গে পৌরোহিত্য ও রাজকীয়তা থেকে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক যে দুই শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য উপরোক্ত অবস্থাগুলিই দায়ী। রাজারা পবিত্রতার ভারে পিষ্ট হয়ে যাবতীয় ঐহিক বস্তুর প্রতি নিজেদের শক্তির প্রয়োগ করতে অশক্ত হয়ে পড়ে; তাই বাধ্য হয়ে সব ইতরজনেরা রাজকীয় সম্মানের পরোয়া করত না অথচ শাসনকাজে দক্ষ ছিল এমন লোকদের হাতে শক্তি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এই থেকেই বৈষয়িক শাসনকর্তাদের উৎপত্তি। এই সঙ্গে আধ্যাত্মিক অধি-স্বামিত্ব, যার কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই, সেটা রইল পড়ে টাবু রাজাদের জন্য। জাপানের পুরনো ইতিহাস থেকে কী পরিমাণে এ-সত্য প্রমাণিত হয় সে-কথা সর্বজনবিদিত।

আদিবাসীদের সঙ্গে তার শাসনকর্তাদের সম্বন্ধাদি পরীক্ষা করে আশা হচ্ছে যে, সাধারণ বিবরণ থেকে শুরু করে মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টি দিয়ে (এদের অর্থে) বুঝতে অসুবিধা হবে না। এই সমস্ত সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট। শাসনকর্তাদের বহু বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু অপরদিকে আবার টাবু-নিষেধের দ্বারা আরও এমন কতকগুলি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় যে, পূর্বের বিশেষ অধিকার ভোগ করতে দেওয়ার বিশেষ কিছু মূল্য থাকে না। শাসনকর্তারা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তারা এমন কতকগুলি অধিকার ভোগ করে যা অন্যেরা পায় না; টাবু দিয়ে নিষিদ্ধ করা থাকে। কিন্তু আরও যে কতকগুলো টাবু-নিষেধ তাদের ঘাড়ে চাপানো হয় সাধারণ লোকের পক্ষে সেগুলো প্রযোজ্য নয়। এতএব প্রথম বৈষম্য লক্ষিত হচ্ছে এইখানেই। একই ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত অত্যধিক স্বাধীনতা ও অত্যধিক বাধ্যবাধকতা—এই দুয়ের বৈষম্য। বৈষম্য এত বেশি যে একে অসঙ্গতিও বলা চলে। দলপতিরা অনন্যসাধারণ ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী: অতএব, তাদের শরীরের কিংবা কোনো সম্পত্তির স্পর্শ সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর। আবার দেখা যাচ্ছে, এই স্পর্শ থেকেই সবচেয়ে বেশি মঙ্গলেরও আশা রয়েছে। এইটি দ্বিতীয় এবং অতি স্পষ্ট অসঙ্গতি। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, এই অসঙ্গতি অ-প্রকৃত। রাজা সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে স্পর্শ করলে প্রজার মঙ্গল হয়। আর যখন প্রজারা রাজাকে বা কোনো রাজকীয় বস্তুকে স্পর্শ করে তখনই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ ঘটনা আক্রমণাত্মক কার্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও দেখা যায়, রাজা প্রকৃতির অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারে কিন্তু সেই রাজাকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আবার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব প্রজাদের। ভাবটা যেন, যে অত শক্তিশালী সে এই আত্মরক্ষার কাজটুকু আর নিজে করতে পারে না। এই অসঙ্গতির সমাধান করা খুব সহজ কাজ নয়। এদের সম্পর্কের মধ্যে আর একটা অসুবিধা দেখা যায়—অবিশ্বাস। রাজা যে তার অসীম শক্তি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য এবং নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করবে এ-বিশ্বাস যেন প্রজাদের নেই। কাজেই রাজাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখাই যেন স্বাভাবিক। রাজার জীবন যেসব টাবু-নিয়মের অধীন সেই নিয়মকানুনগুলি একাধারে দুই কাজ করে; রাজাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে তার উপর অভিভাবকত্ব করে, আবার রাজার জন্য প্রজার যেসব অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে তা

থেকেও প্রজাদের রক্ষা করে।

আদিম জাতি ও তাদের রাজাদের মধ্যে যে গোলমেলে ও অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক দেখা গেল তার নিম্নলিখিত রূপ একটি ব্যাখ্যা আমরা দিচ্ছি। কুসংস্কার প্রভৃতি নানান কারণবশত রাজার প্রতি ব্যবহারে নানান ধরনের প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। এই সব প্রবৃত্তির কোনো একটি অন্যগুলোর অপেক্ষা না-রেখে শেষ সীমা পর্যন্ত বেড়েই চলে। এর ফলে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ব্যাপারটা যতক্ষণ ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ের কিংবা 'আনুগত্য' সম্পর্কের গণ্ডির মধ্যে থাকে ততক্ষন কোনো সুসভ্য ব্যক্তির মতোই একজন বুদ্ধিমান অসভ্যজাতীয় লোক এই অপরাধটুকু নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এতদূর পর্যন্ত তো বোঝা গেল। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতি এই ব্যাপারটাকে আরও তলিয়ে দেখতে এবং এই সব প্রবৃত্তির আসল প্রকৃতিকে জানতে সাহায্য করতে পারে। এই সব ঘটনাকে যদি বিশ্লেষণের নিয়মানুবর্তী করা যায়, যদি ধরে নেওয়া যায় এগুলো উদ্‌বায়ুরোগের লক্ষণ, তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম দৃষ্টি পড়বে চিন্তার ব্যাকুলতার বাড়াবাড়ির ওপর ; যেটাকে টাবু-অনুষ্ঠানের কারণ বলে মনে করা হয়। উদ্‌বায়ুরোগে এরূপ অত্যধিক নমনীয়তার একযোগে প্রকাশ প্রায়ই ঘটে থাকে। বিশেষ করে দেখা যায় অনুকর্ষী উদ্‌বায়ুরোগে! এবং এরই সঙ্গে আমরা প্রধানত এই ব্যাপাটার তুলনা করব। এখন তাহলে আমরা এই কমনীয়তার মূল কোথায় তা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারলাম। যেখানেই প্রধান কোমলতা ছাড়া আর একটি বিরুদ্ধ সংগ্রামের ফল্গুধারা নিজ্ঞান মনে বইছে সেইখানেই এমনটি দেখা যায়। তার মানে হচ্ছে, প্রত্যেক উভয়বলীয় আধুনিক প্রতিন্যাস (ambivalent affective attitude)-এর আদর্শ (typical) রোগীর মধ্যে এরূপ দেখা যাবে, নিজ্ঞান মনের শত্রুভাবকে দমিয়ে রাখার জন্য বাইরে কোমলতা বা স্নেহপ্রবণতাকে অত্যধিক রকমে বাড়িয়ে দিতে হয়, যা বাইরে দুশ্চিন্তার আকারে প্রকাশ পায়। এইটিই শেষে অপরিহার্য সম্পীড়ক হয়ে ওঠে। কারণ, তা না হলে নিজ্ঞান মনের শত্রুতাকে অবদমিত করে রাখা সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মনঃসমীক্ষক জানেন কত নির্ভুলভাবে এই স্নেহপ্রবণতার বাড়াবাড়ি নেহাত অসম্ভব অবস্থার মধ্যেও মীমাংসিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মাতা ও সন্তানের মধ্যে কিংবা স্নেহশীল বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে এই অবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উভয়বলীয় মতবাদ প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে, অত্যধিক সম্মান এবং দেবতাজ্ঞান করার পিছনে এক প্রবল শত্রুভাব নিজ্ঞান মনে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব, দেখা যাচ্ছে, আমরা যেমনটি ভেবেছিলাম, এখানে সেই উভয়বলীয় মনোভাবের পরিস্থিতি বর্তমান রয়েছে। রাজকীয় টাবু-নিয়ম প্রবর্তনের অন্তরালে নিশ্চয়ই এই অবিশ্বাস প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করছে এবং এটা নিজ্ঞান মনের সেই সংগ্রামেচ্ছার আর একটি প্রকাশ ভঙ্গিমাত্র। বস্তুত এই সংঘর্ষণের ফলাফল বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। কাজেই যেখানে সংগ্রামের প্রমাণ খুব সহজসাধ্য এমন সব ক্ষেত্রেও আমাদের ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। ফ্রেজার সাহেব তাঁর কেতাবে লিখেছেন[২০] যে, 'সিয়েরা লিওনে'র (Sierra Leone) টিম্মি জাতির

২০. I.c. p.18 citing Zwefel et Monstier, Voyage aux Sources du Niger, 1880.

অসভ্যেরা তাদের মনোনীত রাজার অভিষেকের দিন সন্ধ্যাবেলায় রাজাকে প্রহার করার অধিকার রাখে এবং এই অধিকারের সুযোগ তারা এমনভাবেই নেয় যে বেচারা রাজাকে কখনও কখনও বেশিদিন সিংহাসন ভোগ করতে হয় না, তার আগেই মারের চোটে মারা পড়ে। এই কারণে নেতারা এমন একটি লোককে নির্বাচন করে যার বিরুদ্ধে তাদের জাতক্রোধ আছে। কিন্তু তবুও এসব ঘটনা সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। এগুলি যেন বিশেষ ধরনের অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠান এমনিভাবেই পালিত হয়।

আদিম অধিবাসীদের তাদের দলপতির প্রতি আরও একটি মনোভাবের বৈশিষ্ট্য একটি মানসিক প্রক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াটি মাসিক গোলমালের ক্ষেত্রে সব সময়ই বর্তমান এবং বিশেষ করে পীড়নভ্রান্তি বা অন্যে আমার ক্ষতি করবে সর্বদা এই মানসিক ভুলের দ্বারা পীড়িত রোগীর ক্ষেত্রে সোজাসুজিভাবেই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ব্যক্তির গুরুত্বকে অসাধারণভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার সর্বশক্তিমত্তাকে অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর দ্বারা রোগী যেসব কষ্ট ভোগ করে তার দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া সোজা হয়। অসভ্য আদিবাসীরা ভাবে, তাদের শাসনকর্তা জল, আলো, বাতাস ও আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। আবার, প্রকৃতি যখন তাদের কোনো ভালো শিকার থেকে বা ভালো ফসল থেকে বঞ্চিত করে তখন শাসনকর্তাকে হত্যা করে কিংবা সিংহাসনচ্যুত করে। এ বিষয়ে এদের ব্যবহার যে উপরোক্ত রোগী থেকে সত্যি করে কিছু ভিন্ন, তা মনে হয় না। ভ্রমবাতুল সন্দেহ বাতিকের প্রতিরূপ পিতা পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে দৃষ্ট হয়। সন্তান কল্পনায় পিতাকে সব সময়ই এরূপ সর্বশক্তিমান ভেবে থাকে এবং পিতাকে অবিশ্বাস করার সঙ্গে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন কোনো ভ্রমবাতুল ব্যক্তি তার পরিচিত ব্যক্তিকে 'পীড়নক' বলে সূচিত করে তখন বুঝতে হবে এই বাতুল ঐ ব্যক্তিকে তার (বাতুলের) পিতৃত্বের পর্যায়ে তুলে নিয়েছে। এর দ্বারা ভ্রমবাতুল তার সমস্ত দুর্ভাগ্যের বোঝা ঐ ব্যক্তির কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারছে। অসভ্য আদিবাসীদের সঙ্গে উদ্‌বায়ু রোগীর এই তুলনা থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি, অসভ্য আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের শাসনকর্তার যে সম্পর্ক তার সঙ্গে পিতার প্রতি শিশুর মনোভাবের কতটা মিল আছে।

কিন্তু টাবু-নিষেধের সঙ্গে উদ্‌বায়ু-লক্ষণের তুলনায় আমাদের সর্বাপেক্ষা জোরাল সাহায্য পাওয়া যাবে টাবু উৎসবের মধ্যেই। এর তাৎপর্য নৃপতি-নির্বাচন প্রসঙ্গে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। একটা জিনিস আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, এই অনুষ্ঠানরীতি দ্বারা যা প্রকাশিত হচ্ছে তা শুরুতেই প্রকাশোন্মুখ হয়েছিল তাহলে এরূপ অনুষ্ঠানের দ্বিত্ব অর্থ ও তার উভয়বলতা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। এই প্রথা রাজাদের শুধু নশ্বর জীবের সর্বোচ্চ শিখরে তোলে না, সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনকে অত্যাচার-পীড়িত করে অসহনীয় করে তোলে : রাজাদের এই জীবন তাদের প্রজাদের তুলনায় ঢের বেশি দুর্বিষহ এবং করুণ। উদ্‌বায়ী কোনো কোনো সময় কতকগুলি কাজ না-করে পারে না। কেননা, এই সব কাজের দ্বারা তার অবদমিত আবেগ ও অবদমনকারী আবেগ উভয়েই তৃপ্ত হয়। উদ্‌বায়ীর এই লক্ষণের সঙ্গে

উপরোক্ত রাজ-নির্বাচন প্রথাকে একই জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ মনে হয় না কি ? উদ্-বায়ীর বাধ্যতামূলক কাজটি নিষিদ্ধ কাজের বিরুদ্ধে নামমাত্র রক্ষাকবচের সামিল। কিন্তু আমরা বলব, আসলে এটি নিষিদ্ধ কাজের পুনরাবৃত্তি মাত্র। মানসিক জীবনের ক্ষেত্রে 'নামমাত্র' শব্দটি সজ্ঞান ও আসল কথাটি নির্জ্ঞান মন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, রাজাদের টাবু উৎসবও বাহ্যত তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও রক্ষণের এক প্রকার ব্যবস্থা। আসলে এটা তাদের উচ্চপদাভিষিক্ত হওয়ার জন্য শাস্তিস্বরূপ, প্রকারান্তরে প্রজাদের প্রতিহিংসা নেওয়ার একটা উপায়স্বরূপ। তার দ্বীপের শাসনকর্তা হিসাবে 'সাঞ্চো পাঞ্জা' (Sancho Panza) যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তাতে তার পক্ষে দরবারি অনুষ্ঠানের এইরূপ ব্যাখ্যাই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা বলে মনে করা খুবই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে বর্তমানের রাজাদের মতামত যদি আমরা পেতাম তাহলে খুব সম্ভব উপরোক্ত মতের একটি সমর্থন মিলত।

শাসকদের প্রতি এরূপ প্রক্ষোভীয় প্রবণতার মধ্যে কেন এত জোরাল নির্জ্ঞানীয় আক্রমণাত্মক ভাব থাকবে সেই ব্যাপারটাই খুব আকর্ষণীয়। সে যাই হোক, এ বিষয়টি আমাদের এই পুস্তকের গণ্ডির বাইরে। আমরা আগেই শিশুকালীন পিতৃ-গুঁষোর কথা উল্লেখ করেছি। এখানে আরও বলছি যে, জ্ঞাতি-সম্পর্কের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজলে সঠিক ব্যাখ্যা মিলতে পারে। ফ্রেজার সাহেব ভেবে দেখবার মতো একটি তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রথম রাজারা ছিল সব অজানা অচেনা মানুষ, যাদের অল্পকাল রাজত্ব করার পরে কোনো দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে পুণ্যাত্মক অনুষ্ঠানে বলি যেতে হোত। কিন্তু ফ্রেজার নিজে তাঁর তথ্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না।[২১] খ্রিস্টধর্মীয় উপকথাগুলি এই সব রাজাদের আবির্ভাবের পরবর্তী ফলাফলের দ্বারা প্রভাবিত বলে এখনও মনে করা হয়।

মৃতদের আমরা পরাক্রমশালী শাসক হিসাবেই জানি। তাদের যে আমরা শত্রু হিসাবেই গণ্য করে থাকি সে-কথা শুনলে আমরা হয়ত একটু অবাক হব।

পূর্ববর্ণিত সংক্রমণের উপমার দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে মৃত ব্যক্তির টাবু এক অদ্ভুত রকমের অনিষ্টকারী শক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। প্রথমে দুটো দিকে এর শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। যেমন মৃতের স্পর্শ সংক্রান্ত ব্যাপারে ও মৃতের জন্য বিলাপকারীদের কার্যকলাপে। দেখা যায়, মাওরি (Maori) জাতির মধ্যে যদি কেউ মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে বা তার শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তাহলে তাকে অত্যন্ত অশুচি মনে করা হয় এবং তার আপনজনের সঙ্গে মেলামেশা থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে তাকে বিরত থাকতে হয়। আমরা যাকে 'বয়কট' বা একঘরে বলি, তাকে তাই করা হয়। সে কোনো বাড়িতে ঢুকতে পারে না, কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটবর্তী হতে পারবে না। এরূপ করলেই ঐ মৃত ব্যক্তির রোগের ছোঁয়াচ লেগে যাবে বলে ধরা হয়। এমনকি সে নিজের খাদ্যও হাত দিয়ে ছুঁতে পারে না, কেননা, হাত এখন অশুচি বা অপরিষ্কার ঃ কাজেই নিজের হাত থেকেও এখন না থাকার সামিল। এই সময় তার খাবার

২১. Frazer. The Magic Art and the Evolution of Kings, 2 vols., 1911. (The Golden Bough)

মাটিতে রেখে দেওয়া হয় এবং তার পক্ষে পিঠের দিকে দু'হাত রেখে হেঁট হয়ে দাঁত ও ঠোঁটের সাহায্যে সেই খাবার খাওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। কখনও কখনও অন্য লোকে তাকে সাহায্য করে থাকে। হাত বাড়িয়ে তাকে খেতে সাহায্য করে কিন্তু কোনো রকমে ঐ নিষিদ্ধ ব্যক্তিটিকে ছোঁওয়া চলবে না। তা সত্ত্বেও ঐ সাহায্যকারী প্রায় উক্ত ব্যক্তির মতোই নানা বিধিনিষেধের পাঁড়নের গণ্ডির মধ্যে পড়ে যায়। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ঐরূপ কয়েকটি করে ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যারা সমাজ থেকে একেবারে নির্বাসিত। জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করে, কোনো রকমে অতিক্রান্ত দিনগুলি গুজরান করা ছাড়া তাদের আর অন্য উপায় থাকে না। যে ব্যক্তিটি মৃতের শেষকৃত্য করেছে এই বেচারা কেবল সেই ব্যক্তির নাগালের মধ্যে যেতে পারে। কিন্তু এই পৃথক থাকার সময় যখন অতিক্রম করে যায় এবং ঐ অচ্ছুৎ ব্যক্তি তার আপনজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করে তখন তার ঐ বিপজ্জনক অবস্থাকালীন ব্যবহৃত সমস্ত বাসনপত্র ভেঙে ফেলা হয় এবং বস্ত্রাদিও ফেলে দেওয়া হয়।

সারা পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া এবং আফ্রিকার কিয়দংশে মৃতের স্পর্শ সংক্রান্ত টাবু প্রথা ঐ একই প্রকার। সর্বত্রই খাবার হস্তস্পর্শ না-করার প্রথাটাই বিশেষভাবে প্রতিপালিত হয়, ফলে প্রায়ই সাহায্যকারীর প্রয়োজনও হয়ে পড়ে। পলিনেশিয়ার কিংবা হয়ত শুধু হাওয়াই দ্বীপেই পুরুত-রাজারা পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানের সময় এইরূপ একই রকমের বিধিনিষেধ পালন করে থাকে ঃ এইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোনো ব্যক্তি নিজের টাবুশক্তির দ্বারা মৃতব্যক্তি সংক্রান্ত টাবুশক্তিকে হ্রাস করতে পারে, এমনকি আস্তে আস্তে তাকে জয় করতে পারে। টোংগা দ্বীপে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোনো সাধারণ লোক যদি মৃত সর্দারের শব স্পর্শ করে তাহলে সে দশমাস ধরে অশুচি থাকবে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিজে যদি সর্দার হয় তাহলে সে মাত্র তিন, চার কি পাঁচ মাস অশুচি থাকলেই হবে। তারপক্ষে অশুচি থাকার সময় নির্ভর করবে ঐ মৃত সর্দারের পদমর্যাদার মানের উপর। ঐ মৃত সর্দার যদি আদর্শস্থানীয় মূল সর্দার হয়, তাহলে সবচেয়ে বড় সর্দারেরও দশ মাস অশৌচ হবে। এই অসভ্য জাতির লোকেদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি কোনো ব্যক্তি এই নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে তার কঠিন অসুখ এবং মৃত্যু অবধারিত। জনৈক দর্শক বলেন এরা কখনও চিন্তাই করতে পারে না যে, এদের বিশ্বাসের উল্টো ফল কখনও হতে পারে।[২২]

মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে তার প্রতি যেসব টাবু-নিষেধ আরোপিত হয়, তা একটু ভিন্নভাবে দেখা যাক। মৃতদার বা বিধবাদের বিলাপও মূলত ঐ একই প্রকারের হলেও এদের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। সেইটাই দেখানোর চেষ্টা আমরা করব। পূর্বোল্লিখিত ঘটনাগুলি থেকে টাবু-নিষেধের শক্তি কতদূরপর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে তাই কেবল বোঝা যায় ; আর যে-বিষয় এখন উল্লেখ করতে যাচ্ছি, তা থেকে এর অন্তরালে মনোভাবটা কি তার খানিকটা আমরা ধরতে পারব বলে আশা করি। মনোভাব—তা

২২. W. Marider. The Natives of the Tonga Islands, 1818 ; see Frazer l. c. p. 140.

সে প্রকাশ্যেই হোক, আর যাকে বলে প্রচ্ছন্ন বা আসল মনোভাবই হোক, উভয়প্রকার মনোভাবেরই হদিস পাওয়া যাবে।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার শুস্‌ওয়াপ (shuswap)-দের মধ্যে মৃতদার বা বিধবাদের অশৌচ-অবস্থাকালীন পৃথক হয়ে থাকতে হয়। তারা এই সময় নিজেদের শরীর ও মাথা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করবে না এবং যে সমস্ত বাসনপত্র তারা ব্যবহার করবে সেগুলো আর কেউ ব্যবহার করবে না : যে সমস্ত কুঁড়েঘরে এই সব অশুচি লোকেরা বাস করে সেদিকে কোনো শিকারী এগোবে না, কারণ তাহলে অকল্যাণ হবে। যদি দৈবাৎ কোনো অশুচির ছায়া শিকারীর উপর পড়ে তাহলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। অশৌচগ্রস্ত লোকেরা কাঁটার ঝোপের উপর শয়ন করে এবং চারিদিকে কাঁটার বেড়া দিয়ে রাখে। যাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা ধারে-কাছে না-আসতে পারে তার জন্যই এ ব্যবস্থা। উত্তর আমেরিকার জাতিদের মধ্যে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার। সেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী এক ধরনের ঘাসের তৈরি পায়জামা পরে থাকে যাতে মৃতস্বামীর আত্মা না-ঘেঁষতে পারে। অবশ্য বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ছোঁয়া 'রূপান্তরিত অর্থে' কেবল শারীরিক স্পর্শকেই বোঝাচ্ছে, কেননা, মৃত ব্যক্তির আত্মা তার আত্মীয়কে ছেড়ে যেতে চায় না এবং অশৌচকালে তার চারদিকে ঘোরাফেরা করে।

ফিলিপিনের পালাওয়ান (Palawan) দ্বীপের অধিবাসী আগুতেনো (Agutano)-দের মধ্যে একটি প্রচলিত প্রথা হচ্ছে যে স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবা সাত-আট দিন দিবালোকে বাইরে বেরুবে না। রাত্রে বেরুতে পারে, কিন্তু তখনও অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হতে পারবে না। যে-কেউ দেখুক-না কেন তার মৃত্যু নিশ্চিত। সেইজন্য প্রতি পদক্ষেপে সে একটা লাঠির সাহায্যে গাছপালাকে আঘাত করতে করতে অগ্রসর হয়। এই গাছগুলি শুকিয়ে যায়। আর একটি ব্যাপার থেকে বোঝা যাবে বিধবার মধ্যে কী সাংঘাতিক বিপদ আছে। ব্রিটিশ নিউগিনির মিকিও (Mekeo) জেলায় মৃতদার-ব্যক্তি সমস্ত সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে অবস্থান করতে থাকে। সে কোনো বাগানের পরিচর্যা করতে পারে না, অন্যের সামনে বেরুতে পারে না, গ্রামে ঢুকতে বা রাস্তায় চলতে পারে না। সে পশুর মতো লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বা বনের মধ্যে চোরের মতো ঘুরে বেড়ায় এবং যদি কাউকে আসতে দেখে, বিশেষ করে কোনো স্ত্রীলোককে তার দিকে আসতে দেখে, তাহলে তাকে লুকিয়ে পড়তে হবে। এই শেষোক্ত ঘটনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, মৃতদার বা বিধবাদের বিপদটা হচ্ছে প্রলোভনের। যে-ব্যক্তি স্ত্রীকে হারিয়েছে সে আর একজনকে পাবার প্রলোভন করবে না। বিধবার পক্ষেও এ-কথাই খাটে ; তা ছাড়া যেহেতু বিধবা এখন স্বামীহীন তাকে দেখে অন্য পুরুষ প্রলুব্ধ হতে পারে। এইরূপ কোনো বদল পাওয়ার মধ্য দিয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়াটা শোক করার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং এতে মৃতের আত্মা যে-কোনো সময়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।[২৩]

২৩. আগেই যে একটি রোগীর কথা উল্লেখ করেছি এবং তার 'অসম্ভব' কথাটি আমি টাবুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছি, তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি পথে কোন লোককে শোকের পোশাকে দেখলেই খুব রেগে ওঠেন। তিনি বলেন, 'এরূপ লোককে রাস্তায় বেরুতে দেওয়া উচিত নয়।'

মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ না-করা আদিম জাতিদের টাবু প্রথার মধ্যে যেসব খুব আশ্চর্যজনক এবং শিক্ষণীয় ঘটনা আছে তাদের অন্যতম। এইটিই খুব প্রচলিত প্রথা। তবে এর অনেক পরিবর্তনও হয়েছে, এবং এই পরিবর্তনের ফলাফলগুলিও অনুধাবন করে দেখবার মতো।

এ তো গেল অস্ট্রেলিয়া ও পলিনেশিয়ার কথা, যাদের মধ্যে টাবু প্রথা সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া সাইবেরিয়ার সামোজেডিস (Samojedes), উত্তরভারতের টোডা, তাতারির মঙ্গোলিয়ান এবং সাহারার তুয়ারেগ্ (Tuaregs), জাপানের আইনো এবং মধ্য আফ্রিকার আকাম্বা ও নান্দি, ফিলিপিনের তিঙ্গুয়ানি (Tinguanes) এবং নিকোবারি, মাদাগস্কার ও বোর্নিয়ো দ্বীপের অধিবাসীরা পৃথক ভাবে ছড়িয়ে থাকলেও এসব জাতিদের মধ্যে টাবু-নিষেধ দৃষ্ট হয়।[২৪] এই সব জাতিদের কতকগুলির মধ্যে কেবলমাত্র অশৌচ অবস্থাকালীনই নিষেধ বলবৎ থাকে এবং তার ফলাফল দৃষ্ট হয়। অন্যদের বেলায় বরাবরের জন্য ঐ নিষেধ ও তার ফলাফল কার্যকর হয়। কিন্তু সর্বত্রই মৃত্যুর পরে সময়ের সঙ্গে নিয়মের কড়াকড়ি কমে আসে।

মৃত ব্যক্তির নাম দেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু সব সময়ই খুব কড়াকড়ি নিয়ম পালিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার জাতিদের মধ্যে মৃতের নাম উচ্চারণ করাটা জীবিতদেরকাছে অত্যন্ত অপমানজনক বলে মনে হয়, এবং এর জন্য যে শাস্তিবিধান হয় তা হত্যা করার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।[২৫] নামমাত্র উল্লেখ করাটা কেন এত ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় তার কারণ আন্দাজ করা খুব সোজা নয়। কিন্তু যেসব বিপদ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের এড়াবার জন্য একের পর এক বহু চমকপ্রদ এবং মজার ঘটনাবলীর সৃষ্টি হয়েছে। আফ্রিকার মাসাইরা কোনো লোক মরার সঙ্গে সঙ্গেই তার নাম বদলে দেয়। তার ফলে মৃতের নতুন নাম ধরে ডাকলে আর কোনো বিপদের ভয় থাকে না ; এবং সমস্ত নিষেধ তার পুরনো নামের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়। মতলবটা হচ্ছে, প্রেতটা তার নতুন নামটা জানে না, অতএব, কোনো হদিস পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিলাইদি (Adelaide) ও এনকাউন্টার উপসাগরের (Encounter Bay) অধিবাসীরা এ বিষয়ে এত সাবধান যে, কোনো লোক মরার সঙ্গে সঙ্গে সেই নামের যদি কোনো ব্যক্তি থাকে বা নামের কাছাকাছিও যদি কারও নাম থাকে তাহলে তাদের সকলের নাম বদলে অন্য নাম রেখে দেয়। ভিক্টোরিয়া ও উত্তর আমেরিকার কয়েকটি জাতির মধ্যে দেখা যায় যে মৃত ব্যক্তির সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তির নাম, তা মৃতের নামের সঙ্গে উচ্চারণের মিল থাকুক আর নাই-থাকুক, বদলে রাখে। এখানেও ঐ একই উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়। প্যারাগুয়ের গুয়েকুরু (Guaycuru) জাতির সর্দার আবার এরূপ ক্ষেত্রে তার জাতির প্রত্যেকের নাম পালটে দেয় এবং এই ঘটনাকে এমনভাবে মনে রাখে যেন তাদের এরূপ নাম পূর্ব থেকেই ছিল।[২৬] এমনকি, যদি কোনো মৃত ব্যক্তির নাম কোনো পশুর বা বস্তুর নামে হয় তাহলে ঐ পশু বা বস্তুর নাম তারা বদলে দেয়, যাতে ঐ মৃত ব্যক্তির নাম না উচ্চারণ করতে হয়। এজন্য

২৪. Frazer. l.c,p. 353.
২৫. Frazer. l.c.p. 352, etc.
২৬. Frazer. l.c.p. 357, citing an old Spanish observer, 1732

দেখা যায়, সর্বদাই নামের অদল-বদল এমনভাবে হয়ে চলেছে যে, পাদরিদের পক্ষে তাদের নামের হিসাব রাখা খুব মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় : বিশেষ করে যেসব নামের উপরে স্থায়ীভাবে ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে নিষেধ আছে। প্যারাগুয়ের এবিপোনদের (Abipons) মধ্যে ধর্মযাজক দোব্রিজহোফার (Dobrighofer) সাত বছর কাটিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দেখেছেন যে, জাগুয়ারের নাম তিনবার বদলেছে। এবং কুমির, কাঁটা ও কসাই নামগুলির ভাগ্যেও তাই ঘটেছে।[২৭] এই মৃতের নাম উচ্চারণ করার ব্যাপারটা এতদূরে পর্যন্ত এগিয়েছে যে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে নামোচ্চারণে ভীতি এনে দিয়েছে। এই কঠিন নিষেধ বা দমনের ব্যাপারে আরও একটি লক্ষণীয় ফল হচ্ছে যে, এই জাতি সকলের মধ্যে কোনো ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনাবলী নেই। তাদের অতীতের ইতিহাস সন্ধানের ব্যাপারে এইটাই হচ্ছে আমাদের কঠিন সমস্যা। কয়েকটি আদিম জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, বহুদিন ধরে শোকপালন করার পর সেই পুরনো নামকে পুনর্জীবিত করে যেন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি নতুন প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা চলেছে। সেই পুরনো নাম এ যুগের ছেলেদের দেওয়া হয়, এবং এই শিশুদের পূর্বমৃতের পুনর্জাতক হিসাবে গণ্য করা হয়।

নামসংক্রান্ত টাবুর এই অদ্ভুতত্ব অনেকটা কম মনে হবে যদি আমরা একটা কথা মনে রাখি ; সেটা হচ্ছে যে, অসভ্য জাতির লোকেরা তাদের নামটাকে তাদেরঅস্মিতার বিশেষ অংশ এবং সম্পদ বলে মনে করে এবং শব্দের উপরে তারা বিশেষ আস্থাস্থাপন করে। আমাদের ছেলেরাও ঠিক তাই-ই করে ; এ বিষয় আমি অন্যত্র দেখিয়েছি। এবং এইজন্য তারা কেবলমাত্র অর্থহীন শাব্দিক ঐক্য নিয়ে খুশি হতে পারে না। সব সময়ে ধরে নেয় যে, যখন দুটো জিনিসের একই নাম তখন নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে কোথাও-না কোথাও গভীর সম্বন্ধ আছে। আমাদের স্বাভাবিক ব্যবহারের মধ্যে যেসব অসংখ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা থেকে সভ্য লোককেও ভাবতে হয় যে, সে নিজেও নামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা থেকে এবং তার শরীরের সঙ্গে নামের যে বিশেষ আত্মীয়তা হয়েছে এ অনুভূতি থেকে সে যত দূরে আছে বলে মনে করে, আসলে কিন্তু তত দূরে নেই। মনঃসমীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথার সমর্থন মেলে। নির্জ্ঞান মনের উপর নামের যে কতটা গুরুত্ব আছে তা মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে দেখার সুযোগ ঘটে।[২৮] অনুকর্ষী উদ্‌বায়ু রোগীরা নামের ব্যাপারে ঠিক অসভ্য লোকেদের মতো ব্যবহার করে থাকে। এমনই ব্যবহার তাদের কাছ থেকে আশা করা হয়। কোনো বিশেষ শব্দ উচ্চারণে বা শ্রবণে তার পূর্ণ 'গূঢ়ৈষা স্পর্শকাতরতা' (complex sensitiveness) দেখায় (অন্যান্য উদ্‌বায়ু রোগীরাও এরূপ করে), এবং তাদের নিজের ব্যবহারের উপর অনেকগুলি বাধা বা দমনের সৃষ্টি করে। এই বাধাগুলিকে প্রায়ই সাংঘাতিক রকমের হয়ে উঠতেও দেখা যায়। আমি একজন এরূপ রোগীকে জানি যে নিজের নাম লিখতে চাইত না, ভাবত যদি তার নামটা কারও হাতে গিয়ে পড়ে তাহলে সে ব্যক্তি তার অস্মিতার একটা অংশ পেয়ে যাবে। তার অবান্তর কল্পনার প্রলোভনের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সে নিজের জন্য

২৭. Frazer. l. c p. 360

২৮. Stekel, Abraham.

একটি আদেশ সৃষ্টি করেছিল। সেটি হচ্ছে, 'নিজের অস্মিতার কিছুই দেওয়া চলবে না।' এটা সে এত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, তা পাগলামির নামান্তরমাত্র। এই বিষয়ে প্রথমে জড়িত ছিল তার নাম, পরে এসেছে তার হস্তলিপি। ফলে সে লেখাই ছেড়ে দিয়েছিল।

এই অসভ্য জাতির লোকেরা নামকে যদি নিজের অস্মিতার অংশ স্বরূপ মনে করে এবং এই নামকে মৃত ব্যক্তির মতো টাবু-যুক্ত করে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? একজন মৃতব্যক্তিকে নাম ধরে ডাকার সঙ্গে তাকে স্পর্শ করার সম্পর্ক আছে এ-কথাও প্রমাণ করা যায়। অতএব এখন কেন এই স্পর্শ এত সাংঘাতিক টাবুজড়িত হয়েছে এই বিশেষ সমস্যাটির দিকে আমরা নজর দিতে পারি।

ব্যাখ্যার কথা মনে হলে প্রথমেই শব দেখে যে স্বাভাবিকভাবে ভয় জাগে সেই কথাই মনে হয়—বিশেষ করে মৃত্যুর পরে মৃতদেহে যে বিকৃতি ঘটে সেই দৃশ্য। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করার সঙ্গে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর প্রতি বিলাপকারীর মনোভাব যথেষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে, এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু শবের বিভীষিকা টাবু-নিয়মের সব খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, কিংবা শোকপ্রকাশ করার মধ্যে মৃতের নাম নিলে কেন তার স্থূলাভিষিক্ত জীবিতের অপমান হবে, সে ব্যাখ্যাও খুঁজে পাই না। অপর পক্ষে দেখা যায়, যে শোকপ্রকাশের মধ্য দিয়ে মৃতের কথা ভাবতে ভালবাসে, সে তার স্মৃতিকে বড় করে দেখতে এবং তাকে যতদিন পর্যন্ত মনে রাখা যায় তার চেষ্টা করে। এই শোকপ্রকাশ করা ছাড়া আর একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে যার জন্য টাবুর এই সব বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে। এমন একটা কিছু যা অন্য উদ্দেশ্য সফল করছে। এবং এই নামের প্রতি যে-টাবু-প্রয়োগ হচ্ছে সেইটিই অজানা মনোভাবটিকে প্রকাশ করবে। যদি প্রথার মারফত আমরা এর সন্ধান না-পাই, তাহলে ঐ অসভ্যদেরই বিলাপকালীন কথার মধ্য থেকেই আমরা এর হদিস খুঁজে বার করব।

এই অসভ্য লোকেরা যে মৃত ব্যক্তির উপস্থিতি এবং তার আত্মার পুনরাগমন চায় না, এ সত্যকে তারা অস্বীকার করে না। তাকে তাড়িয়ে দিতে বা দূরে রাখবার জন্য তারা নানারকমের ক্রিয়াকলাপ করে থাকে।[২৯] তারা মৃতের সমক্ষে তার নাম নেওয়াকে মন্ত্রোচ্চারণ হিসেবে ধরে।[৩০] এইজন্য যাতে মন্ত্রোচ্চারণ না-করতে হয় এবং মৃতকে জাগিয়ে না-তুলতে হয় তার জন্য সবকিছু তারা করে থাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে তাদের চিনতে না-পারে তার জন্য তারা নিজেদের প্রচ্ছন্ন করে রাখে।[৩১] তারা তাদের নিজেদের কিংবা মৃতের নামকে এজন্য বিকৃত করে এবং যদি কোনো অসাবধানী আগন্তুক মৃতের নাম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে উজ্জীবিত করে তোলে তাহলে এই অসভ্য জাতীয় লোকেরা ঐ আগন্তুকের প্রতি অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। এই সব দেখে

২৯. Frazer, l.c. p. 353, এইরূপ ঘটনার সমর্থনস্বরূপ সাহারায় তুয়ারেগদের থেকে এক উদাহরণ দেখিয়েছেন।

৩০. খুব সম্ভবত এখানে যোগ করতে হবে—যতক্ষণ তার দৈহিক অবশিষ্ট থাকবে। ফ্রেজার, l.c. p. 372.

৩১. ফ্রেজার, 'নিকোবার দ্বীপে' l.c. p. 382.

তারা যে, ভুণ্ডের (Wundt) কথায় বলতে হয়, 'দৈত্যে রূপান্তরিত নিজের আত্মার' ভয়ে ভুগছে সে-কথা অস্বীকার করার উপায় থাকে না।[৩২]

ভুণ্ডের মতে, টাবুর প্রকৃতি নির্ভর করছে দৈত্যের প্রতি ভয়ের উপর। এই অর্থেই এখন তাঁর মতকে আমরা দেখব।

তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি ধরে নিয়েছেন যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সংসারের নিতান্ত আপনজন শত্রুতে অর্থাৎ দৈত্যে পরিণত হলো, যার কাছ থেকে জীবিত ব্যক্তিরা শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই আশা করে না। অতএব, তার শত্রুতার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য সব রকমের উপায় তারা অবলম্বন করবে। এই মত এত অদ্ভুত মনে হয় যে, প্রথমেই বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না। অথচ, আদিম জাতিদের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা সব কৃতী লেখকরাই স্বীকার করেছেন। ওয়েস্টারমার্ক (Westermark) আমার মতে এ বিষয়ে খুব যৎসামান্যই দৃষ্টি দিয়েছেন।[৩৩] কিন্তু তিনিও বলেছেন, মোটামুটিভাবে ঘটনাবলি থেকে আমার বিশ্বাস হয় যে মৃত ব্যক্তিকে বন্ধু ভাবার বদলে বেশি করে শত্রু বলেই মনে করা হয়। এবং জেভনস্ (Jevons) ও গ্র্যাণ্ট অ্যালেন (Grant Allen) যে বলেছেন, আগে বিশ্বাস করা হোত যে, মৃতের শত্রুভাব কেবলমাত্র অপরিচিতের প্রতিই আরোপ হোত এবং তার গোষ্ঠী ও বংশধরদের প্রতি স্নেহ ও কল্যাণের দৃষ্টি থাকত—সে-কথা ভুল।

জীবন্ত ও মৃতের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখাতে গিয়ে সভ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আত্মার প্রতি পুরনো বিশ্বাসের টুকরো-টাকরা নিয়ে আর. ক্লেইনপল (R. Kleinpanl) এক চমকপ্রদ পুস্তক রচনা করেছেন।[৩৪] তাঁর মতেও মৃত ব্যক্তি রক্ত শোষণের জন্য জীবন্ত মানুষকে তার দিকে টানতে থাকে। অনেকদিন ধরে জীবন্ত মানুষ মৃতের এই অভিসন্ধির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ পায়নি। শেষে দুয়ের মাঝে জলের ব্যবধান রেখে এই সমস্যার সমাধান করেছে। সেইজন্য মৃত ব্যক্তিকে কোনো দ্বীপে বা নদীর অপর পারে কবর দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। এইভাবেই 'এপার' (here) ও 'ওপার' (beyond) কথা দুটির সৃষ্টি হয়েছে। কালে প্রশমিত হয়ে মৃতের অসদিচ্ছা যে-বিষয়ে ক্রোধের উদ্রেক হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকতে পরে সেই সেই বিষয়ে নিবদ্ধ করা

---

৩২. Wundt Religion and Myth, vol. II. p. 49.

৩৩. The Origin and Development of Moral Conception, see section entitled, 'Attitude towards the Dead'. Vol, II, p. 424. 'নোট' এবং বিষয়বস্তুর পরিচয় উভয় থেকেই প্রচুর সমর্থনকারী এবং প্রায়ই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রমাণ মেলে। যেমন—মাওরিরা বিশ্বাস করে যে, সবচেয়ে নিকট এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়জনের প্রকৃতি তাদের মৃত্যুর পর বদলে যায়, ফলে এমনকি তাদের অতি আপনজনের প্রতিও অনিষ্টকারী হয়ে পড়ে'। অস্ট্রেলীয় নিগ্রোরা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই বহুদিন ধরে হিংসাপরায়ণ থাকে; সম্বন্ধ যতই নিকট, ভয়ের কারণ ততই বেশি। কেন্দ্রীয় এস্কিমোদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মৃতেরা শান্ত হয় অনেক দেরিতে। প্রথমের দিকে তাদের ক্ষতিকর প্রেতাত্মা বলেই ভয় করা উচিত। এই সময়ে তারা রোগ, মৃত্যু এবং অমঙ্গল ছড়িয়ে বেড়াবার জন্য প্রায়ই গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। (Boas)

৩৪. R. Kleinpaul : The Living and the Dead in Folklore, Religion and Myth. 1898.

হয়েছে। যেমন, ঘাতকের পিছনে মৃতের আত্মা ঘুরে বেড়াবে। ক্লেইনপলের বিশ্বাস যে, গোড়াতে সমস্ত আত্মাই ক্রূর প্রকৃতির ছিল। সে সবসময়ই জীবন্ত মানুষের প্রতি বিরূপ থাকত এবং সর্বদাই তাদের অনিষ্ট করা বা হত্যা করার চেষ্টায় থাকত। আসলে, মৃতদেহটাই প্রথমে দুষ্ট আত্মার কল্পনার সূত্র জুগিয়েছে।

যাদের আমরা সবচেয়ে বেশি ভালবাসি তারাই মৃত্যুর পরে শত্রুতে পরিণত হয়, এই প্রকল্প স্বীকার করে নিলে আরও প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই এসে পড়ে—কিসের জন্য আদিম জাতিদের মনে প্রিয়জনের প্রতি মৃত্যুর পরে এই মনোভাবের পরিবর্তন হলো ? মৃতদের দৈত্য-দানব করে তুলল কেন ? ওয়েস্টারমার্কের (Westermark) মতে এ-প্রশ্নের উত্তর করা সোজা।[৩৫] 'যেহেতু মৃত্যুই মানবজীবনের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ শত্রু, মৃত ব্যক্তি তার মন্দ ভাগ্যের জন্য সবসময় অসন্তুষ্ট। আদিম জাতিদের বিশ্বাস যে, মৃত্যু কেবল হত্যার দ্বারাই ঘটতে পারে, তা সে গায়ের জোরেই হোক বা ম্যাজিক বলেই হোক। এবং এইটাই আত্মাকে হিংসাপরায়ণ ও ক্রুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আত্মা জীবিতদের হিংসা করে এবং তার আগের জীবনের আত্মীয়দের সঙ্গ কামনা করে। এর থেকে আমাদের মনে হয় যে, আত্মা তাদের সঙ্গে বাস করার মানসে জীবিতদের রোগাক্রান্ত করে মেরে ফেলতে চাইবে…'…ব্যাখ্যাস্বরূপ আরও বলা হয়েছে যে, মৃতের আত্মার প্রতি যে-অসদিচ্ছা আরোপ করা হয়েছে তার মলে রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সহজাত ভয়ের মধ্যে, এবং এই সহজাত ভয় হচ্ছে মৃত্যুর ভয়।'

বায়ুরোগীর (Psychoneurotic) কষ্টকর লক্ষণাদি অনুধাবন করে যে-ব্যাখ্যাতে পৌঁছতে পেরেছি তার মধ্যে ওয়েস্টারমার্কের মত তো আছেই, তা ছাড়া সে-ব্যাখ্যা আরও বিশদ।

যখন কোনো স্ত্রী স্বামীকে হারায় বা মেয়ে মাকে হারায় তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, তাদের মনে একটা অতি কষ্টকর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় 'আবেশজ গ্লানি'। এই গ্লানি-ভারাক্রান্ত মনে চিন্তা ওঠে—আমারই কোনো অসাবধানতাবশত বা অশ্রদ্ধার জন্য আমার প্রিয়জন মৃত্যুমুখে পতিত হলো না তো ? প্রিয়জনের জন্য যে যত্ন সে নিয়েছে সে-কথা স্মরণ করে বা এই অপরাধ ভাবকে সোজাসুজি অস্বীকার করার চেষ্টা অর্থাৎ শোকপ্রকাশের সময় পাগলের মতো ব্যবহারের দ্বারা এ গ্লানির হাত থেকে নিস্তার মেলে না, কেবল সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয়। মনঃ-সমীক্ষণের সাহায্যে এইরূপ মনোকষ্টের মূলের সন্ধান আমরা পেয়েছি। আমরা জানতে পেরেছি যে, এই সব আবেশজ গ্লানি জন্মানোর একদিক থেকে যথেষ্ট হেতু আছে এবং সেজন্য তাদের অস্বীকার বা আক্রমণ করলে কিছু ফল হয় না। আবেশজ গ্লানিতে মনে হলেও, বিলাপকারী যে সত্যিই মৃত্যুর জন্য দায়ী বা তার অসাবধানতার জন্য মৃত্যু ঘটেছে, তা নয়। তা না-হলে কী হবে, তার মনে এমন একটা ইচ্ছা বাসা বেঁধেছিল যে-ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে সজাগ ছিল এবং মৃত্যু হওয়াতে যে-ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হয়নি, এবং সেই ইচ্ছাই যদি আরও শক্তিশালী হোত তাহলে মৃত্যুও ঘটাতে পারত। গ্লানি এখন আপনজনের মৃত্যুর পর নির্জ্ঞান মনের এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে

৩৫. I.c., p. 426.

প্রযুক্ত হয়। যেসব ব্যক্তির সঙ্গে গভীর প্রক্ষোভজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তির প্রতি আপাতমধুর প্রেম-সম্পর্কের পিছনে নিজ্ঞান মনে একটি শত্রুভাব লুকিয়ে থাকে। সত্যি বলতে কি, এটা একটা চিরাচরিত ব্যাপার; মানুষের প্রক্ষোভজজীবনের উভয়বলতার প্রতিচ্ছবিমাত্র। অল্পবিস্তরভাবে এই উভয়বলতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান। স্বাভাবিক অবস্থায় এর শক্তি এত বেশি হয় না যে উপরোক্ত প্রকারের আবেশজ গ্লানির সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মন যদি আগে থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে ঐদিকে ঝুঁকে থাকে তাহলে যেসব লোককে আমরা ভালবাসি তাদের সম্বন্ধে আমাদের উভয়বলতা এমনভাবে দেখা দেয় যে আমরা অবাক হয়ে যাই। টাবু-সমস্যার সঙ্গে আমরা প্রায়ই যে-রোগীদের তুলনা করেছি সেই অনুকর্ষী উদ্‌বায়ু-গ্রস্ত ব্যক্তিরা এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ। তাদের মধ্যেই এই প্রক্ষোভীয় উভয়বলতার আদি ভাণ্ডারটি বিশেষভাবে পূর্ণ।

এখন আমরা বুঝতে পারছি, অধুনা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে কেন দৈত্য-দানব হিসাবে গণ্য করা হয়, এবং কেনই-বা তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানান টাবু-নিষেধের আশ্রয় নেওয়া হয়। মনঃসমীক্ষণ অনুকর্ষী-উদ্‌বায়ু রোগীদের প্রক্ষোভজ জীবনে যে-ধরনের উভয়বলতার অস্তিত্ব দেখিয়েছে, আদিম জাতিদের প্রক্ষোভজ জীবনেও সেই ধরনের উভয়বলতা বর্তমান এ-কথা ধরে নিলে বেশ বোঝা যাবে যে ঐ উদ্‌বায়ু রোগীদের অনুকর্ষী গ্লানির পিছনে নিজ্ঞান মনে আক্রোশ ভাবের বিরুদ্ধে যে-প্রকার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, আদিম জাতিদের বেলাতেও প্রিয়জন বিয়োগে ঠিক সেই প্রকারের প্রতিক্রিয়া হওয়ারই প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে-আক্রোশের ভাব মৃত্যুর পরে সন্তোষের আকারে নিজ্ঞান মনে দুঃখের ভাব জাগাচ্ছে তা আদিবাসীর ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে প্রকট হচ্ছে। তার বেলায় প্রতিরোধক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছে আক্রমণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মৃতের প্রতি অভিক্রান্তিতে। এরূপ প্রতিরোধক্রিয়াকেই—কি স্বাভাবিক, কি অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায়—আমরা অভিক্ষেপ আখ্যা দিয়ে থাকি। জীবিত ব্যক্তি কখনও স্বীকার করবে না যে সে মৃতের প্রতি কখনও এমন আক্রোশ মনে মনে পোষণ করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির আত্মা এরূপ আক্রোশের ভাব এখন পোষণ করছে এবং সারা অশৌচ অবস্থাকালীন আক্রমণ করার চেষ্টা করবে। অভিক্ষেপণের দ্বারা প্রতিরোধ সার্থক হলেও এই প্রক্ষোভীয় প্রতিক্রিয়ার শান্তিকারী ও দুঃখী প্রকৃতি প্রত্যাশিত হয়—সে ভয় পায়, স্বেচ্ছায় অনেক কিছু ত্যাগ করে এবং নানান বিধি-নিষেধ মেনে চলে। এগুলো গোপনে আংশিকভাবে ক্রুদ্ধ শয়তানের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের কাজ করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উভয়বলি প্রক্ষোভীয় মনোভাব থেকেই টাবুর উৎপত্তি হয়েছে। মৃতের টাবুও সৃষ্টি হয়েছে সজ্ঞান মনের দুঃখভাব ও নিজ্ঞান মনে সন্তোষভাবের দ্বন্দ্ব থেকে। এবং এই-ই যদি আত্মার অসন্তুষ্টির মূল কারণ হয় তাহলে জীবিতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও নিকট ব্যক্তিই যে সবচেয়ে বেশি ভয় পাবে তা স্বতঃসিদ্ধ।

উদ্‌বায়ুরোগের লক্ষণের মতো টাবু-নিষেধের মধ্যেও বিপরীত প্রকৃতির অনুভূতি দেখা যায়। তাদের নিরমতান্ত্রিক দিকটা শোকপ্রকাশ করে। অপরদিকে আর একটি মনোভাব সেটাকে নাকচ করছে, এই ভাবটিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। যেমন মৃতের প্রতি আক্রমণাত্মক ব্যবহার যা এখন আত্মরক্ষাস্বরূপ ব্যবহার হচ্ছে। এ পর্যন্ত

আমরা দেখলাম যে টাবু-নিষেধের কিছুটা অংশ হচ্ছে প্রলোভনজনিত ভয়। মৃত লোকটি এখন আত্মরক্ষাহীন ; অতএব তার বিরুদ্ধে মনে যেসব আক্রমণাত্মক ইচ্ছা জমা হয়েছিল এই সময়ে সেগুলি পূরণ করে নেওয়ার প্রেরণা জাগাবে। এই প্রলোভনকে নিষেধের বেড়াজাল দিয়ে প্রতিরোধ করতে হয়।

আদিম জাতিরা যে স্বাভাবিক মৃত্যু এবং হত্যার দ্বারা মৃত্যু এ-দুটোকে ভিন্ন চোখে দেখে, এ-কথা স্বীকার না করে ওয়েস্টারমার্ক ঠিকই করেছেন। আমরা পরে দেখাব যে,[৩৬] নিজ্ঞান মনের চিন্তাধারায় স্বাভাবিক মৃত্যুও হত্যার পর্যায়েই পড়ে, অর্থাৎ সে-ক্ষেত্রে দুষ্ট ইচ্ছাই মৃত্যু ঘটিয়েছে। কেউ যদি নিকট আত্মীয় বা প্রিয়জনের, যেমন বাবা, ভাই, বোন প্রভৃতির মৃত্যুসংক্রান্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও তার আসল কারণ জানবার চেষ্টা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে ছোট বড়, সভ্য অসভ্য সকলের বেলাতেই ঐ উভয়বলতাই মৃতের প্রতি এরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছে।[৩৭]

ভুণ্ড (Wundt) টাবুর ব্যাখ্যা করেছেন দৈত্যের প্রতি ভয়ের উপর নির্ভর করে। তাঁর এই মতকে আমরা স্বীকার করে নিইনি, সে-কথা একটু আগেই বলেছি। তবুও আমরা স্বীকার করছি যে, লোকটি মরে দৈত্য হয়ে গেলে তার সেই অবস্থার আত্মা থেকে ভীতির সঙ্গে মৃত্যু-টাবু নির্ভর করে। এটা কেমন পরস্পরবিরোধী শোনায়। কিন্তু এটাকে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর নয়। আমরা দৈত্যের প্রকল্পকে গ্রহণ করেছি সত্যি কিন্তু আমাদের এই ধরে নেওয়া প্রকল্পটাই শেষকথা নয়। মনোবিদ্যার সাহায্যে একে আরও মৌলিক উপাদানে বিশ্লেষণ করা যাবে। বলতে গেলে আমরা দৈত্যকে ধরে ফেলেছি। সে তো জীবিত ব্যক্তির মনের ক্রুদ্ধ অনুভূতির মৃতের প্রতি অভিক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মৃতের প্রতি একই সঙ্গে যে ভালবাসা ও শত্রুভাব দুটো অনুভূতিই রয়েছে সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। অশৌচকালীন এই দুই অনুভূতিই, অর্থাৎ শোকপ্রকাশ বা কান্নাকাটি করা এবং খুশির আকারে প্রকাশ পায়। যেমন ধরুন, আমাদের প্রিয় ব্যক্তি যদি আমাদের আঘাত দ্বারা আহত করে, তাকে আমরা ক্ষমা করি। এই প্রক্রিয়া একটি বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে আপনাকে খাপ খাইয়ে নেয়। এই বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার নামই 'অভিক্ষেপণ'। এই অজানা আক্রোশ এবং যাকে আমরা জানতেও চাই না তাকে, আমাদের মনের ভিতরের অনুভূতি থেকে বাইরে অভিক্ষেপ করে দিই ; সেই অমার আক্রোশ তখন আর আমার থাকে না, সে হয়ে যায় অন্য লোকের—অর্থাৎ যার উপর অভিক্ষিপ্ত হয়েছে তার। আমরা যারা বেঁচে থাকলাম তারা, ঐ ব্যক্তি মারা যাওয়ায় তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলাম বলে খুশি হলাম না, বরঞ্চ তার জন্য আমরা দুঃখিত হলাম, শোকান্বিত হলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই মৃত ব্যক্তি এখন দুষ্ট দানবে পরিণত হলো ; সে আমাদের দুর্ভাগ্য দেখে খুশি হবে, এমনকি আমাদের যাতে মৃত্যু হয় সে চেষ্টাও করবে। জীবিতরা এখন দুষ্ট শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করুক। তারা এখন মনের ভিতরের তাড়নার হাত থেকে মুক্ত।

---

৩৬. Cf. Chap III (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৩৭. ফ্রয়েডের Interpretation of Dreams দেখুন।

তবে এইভাবে ভিতরের দুঃখবোধটাকে কষ্টে পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছে মাত্র; কেননা, বাইরে থেকে আক্রমণের ভয়টা সব সময় রয়ে গেছে।

যে অভিক্ষেপণের সাহায্যে মৃতব্যক্তি দুষ্ট দানবে পরিণত হয় তা যে মৃতের আসল আক্রমণাত্মক ব্যবহারের সঙ্গে অর্থাৎ তার জীবিতকালীন আক্রমণাত্মক ব্যবহারের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধহীন সে-কথা বলা চলে না। জীবিতকালীন রূঢ় বা কটু ব্যবহারগুলি মৃত্যুর পরে জীবিত আত্মীয়েরা স্মরণ করে তাকে দোষ দিতেও পারে। মানুষে মানুষে গভীর সম্পর্কের পিছনে কর্কশ ব্যবহার, দাবিয়ে রাখার চেষ্টা, অন্যায় আচরণ প্রভৃতি মিলে একটা প্রতিশোধাত্মক ভাবের সৃষ্টি করে। কিন্তু এরূপ মনোভাব গঠনের প্রক্রিয়া এত সোজা নয় যে অভিক্ষেপের দ্বারা সৃষ্ট দানবের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পারে। মৃতের দুর্ব্যবহার জীবিতের আক্রমণাত্মক মনোভাব সৃষ্টিতে কিছু পরিমাণ সাহায্য নিশ্চয়ই করে। কিন্তু ঐরূপ মনোভাবে কিছুই ফল হোত না যদি না তার এই আক্রোশের সৃষ্টি করত। আর যাই হোক, মৃত্যুর সময়টা নিশ্চয়ই ঐ দুর্ব্যবহার, হাজার সত্যি হলেও, স্মরণ করার উপযুক্ত সময় নয়। অতএব, নির্জ্ঞান মনের আক্রমণাত্মক ভাব যে জবরদস্ত মনোভাব হিসাবে সর্বদা বর্তমান সে-কথা অস্বীকার করতে পারি না। নিকটতম ও প্রিয়তম লোকের প্রতি আক্রমণের এইভাব তাদের জীবিত অবস্থায় মনে সুপ্ত থাকে। তার মানে, তাদের প্রতি আসল মনোভাবকে অন্য কোনো কিছুর সাহায্যে প্রকাশ করে ফেলে নিজের মনকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু একাধারে ঘৃণা ও ভালবাসার পাত্র যখন মারা যায় তখন এইভাবে মনোভাবকে চেপে রাখা সম্ভব হয় না। এই সময়ে দ্বন্দ্বের মাত্রা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। মধুর ভাবের মাত্রাধিক্যবশত শোকোচ্ছ্বাস একদিকে সুপ্ত আক্রমণাত্মক বাসনার প্রতি খড়গহস্ত হয়ে ওঠে; অন্যদিকে আবার এটা ঐ সুপ্ত বাসনা আনন্দানুভূতির আসল উৎসের সন্ধান প্রকাশ করে দেবে না, তাও সহ্য করতে পারে না। এইজন্যই অভিক্ষেপণের সাহায্যে নির্জ্ঞান মনের আপত্তিকর বাসনা দমিত হয়ে যায় এবং তার ফলে লোকাচারের সৃষ্টি হয়, সেখানে দানবের থেকে শাস্তির ভয় প্রকাশ পাচ্ছে। শোকাবস্থা শেষ হয়ে গেলে মানসিক দ্বন্দ্বের শক্তিও কমে যায়; এইভাবে মৃতের টাবুও উপশমিত হয় এবং শেষে স্মৃতির তলে তলিয়ে যায়।

৪

মৃতের টাবু আমাদের অনেক খবর দিল। কীভাবে এই টাবুর সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যাখ্যাও আমরা করেছি। এই সূত্রে এখানে আরও কিছু বলে রাখতে চাই; ভবিষ্যতে সমস্ত টাবুকেই বোঝবার পক্ষে এগুলোর প্রয়োজন হতে পারে।

প্রক্ষেপণের সাহায্যে মৃতের টাবুর ব্যাপারে কীভাবে নির্জ্ঞান মনের আক্রোশ দৈত্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় সেকথা বলেছি। আদিম মানবের মানসিক জীবন গঠনে একের পর এক বহু প্রক্রিয়া কাজ করে যায়। এসবের মধ্যে যেগুলির অবদান সবচেয়ে বেশি উপরোক্ত উদাহরণটি তাদের মধ্যে মাত্র একটি। এই উদাহরণে দেখানো হয়েছে যে, প্রক্ষেপণের সাহায্যে একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছে। অন্যান্য আরও অনেক মানসিক অবস্থাতেও ঐ একই প্রকার উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাধিত হয়, যার ফলে উদ্‌বায়ু

রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রক্ষেপণ যে কেবল প্রতিরোধের জন্যই সৃষ্টি হয় তা নয়, কেননা, যেখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই সেখানেও প্রক্ষেপণ হতে পারে। অন্তরের রূপকে বাইরে অভিক্ষেপ করাটা আদিম প্রক্রিয়া। এটা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বোধকে বদলে দিতে পারে। অতএব, বহির্জগতের রূপায়ণে এর অবদান সবচেয়ে বেশি। যা সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট হয়নি এমন অনেক অবস্থাতে আমাদের ভাবনাজ এবং প্রক্ষোভ-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার আন্তর প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষের মতোই বহির্জগতের প্রক্ষেপণ হয়ে থাকে। এগুলি অন্তর্জগতেই থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল কিন্তু বাইরে আসাতে বহির্জগতের আকার বদলে দিয়েছে। এরূপ হয়েছে খুব সম্ভবত এইজন্য যে, প্রথমে অন্তর্জগতের প্রতি মনোযোগ পড়েনি, কেবল বাইরে থেকে যেসব উদ্দীপনার স্রোত এসেছে তার উপরই লক্ষ্য ছিল এবং অন্তরস্থ মানসিক ক্রিয়ার সুখও ব্যথা এই সাড়ার উপরই সন্তুষ্ট ছিল। আন্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন প্রথমে শুরু হয়েছে টুকরো-টাকরা শব্দের মাধ্যমে। সেই ভাঙা শব্দসমষ্টিকে সম্বন্ধযুক্ত করে ধীরে ধীরে যে-ভাষা গড়ে উঠেছে তা একদিন অবিমূর্ত চিন্তাকে প্রকাশ করেছে, এবং প্রত্যক্ষ করার শক্তি অর্জন করেছে। এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছবার আগে সেকালের মানুষ নিজের মনের ধারণাকে বাইরে অভিক্ষেপ করে দুনিয়ার ছবিটাকে তাদের নিজের মতন করে বদলে দেখত। আমরা এখন আমাদের সজ্ঞান প্রত্যক্ষ শক্তির জোরে পিছন ফিরে মনোবিদ্যার দিকে নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতে পারি।

নিজের মনের দুষ্ট ইচ্ছাকে দৈত্য-দানব কল্পনা করে তার উপর চাপিয়ে দেওয়াটা আদিম জাতিদের কল্পিত দুনিয়ার সামান্য একটা অংশকে প্রকাশ করেছে মাত্র। তাদের এই দুনিয়া সম্বন্ধে আমরা আরও জানতে পারব, যখন আমরা পরে সর্ব-প্রাণবাদ (**animism**) সম্বন্ধে আলোচনা করব। তখন আমরা এরূপ রীতি প্রবর্তনের মনোবৈজ্ঞানিক কারণ জানবার চেষ্টা করব। তখন দেখব যে, সেগুলো আমাদের মতকে সমর্থন করছে। এইভাবে আমরা সেই উদ্‌বায়ুর সামনা-সামনি এসে দাঁড়াব। এখন আমরা এইটুকু বলে রাখতে চাই যে, স্বপ্নের বেলায় গৌণ অনুযোজনার (secondary) **elaborarion)** যে-স্থান, এখানে এইসব রীতি প্রবর্তনের মূলে সর্বপ্রাণবাদও সেইরূপে কাজ করে থাকে।[৩৮]এরূপ রীতি বা তন্ত্র প্রবর্তনের প্রথম ধাপে সংবিৎ যেসব কাজের বিচার করেছে তার প্রত্যেকটির দুটি প্রধান মূল বর্তমান। যথা, রীতিবদ্ধতা ও আসল কিন্তু যার মূল নির্জ্ঞান মনে।[৩৯]

এই সম্পর্কে ভুন্ড (**Wundt**)[৪০] বলেছেন, 'অতিকথা বা রূপকথার মধ্যে দৈত্য-দানবের যেসব গুণাবলি বর্ণিত হয় তার মধ্যে দুষ্ট গুণগুলোরই প্রাধান্য বেশি। অতএব, জাতির ধর্ম হিসাবে দেখতে গেলে দুষ্ট দানবরা ভালো দানবের চেয়ে বেশি পুরনো।' এই সব থেকে মনে হয়, খুব সম্ভবত দানবের যাবতীয় ধারণা মৃতের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এইসম্পর্কের মধ্যে উভয়বলতা বর্তমান।

---

৩৮. **Interpretation of Dreams**, দেখুন।

৩৯. যেরূপ অস্মিতার মাধ্যমে কবি তাঁর বিক্ষুব্ধ ভাবাবেগকে ভিন্ন ব্যক্তির মতো বাহিরে প্রকাশ করে করে থাকেন, আদি মানবের অভিক্ষেপণক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সেইরূপ হয়ে থাকে।

৪০. **Myth and Religion**, ১২৯ পৃষ্ঠা।

মানবের প্রগতির সঙ্গে দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্মী মনোভাব প্রকাশ পেল ঐ একই মূল থেকে : সেই দুই বিরুদ্ধধর্মী মনোভাব হলো দানব বা ভূতের ভয় এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা।[৪১] যেসব ব্যক্তির মৃত্যু বেশিদিন হয়নি তাদেরই আত্মাদের উপর সব সময় দানবত্ব প্রয়োগ করা হয়। দানবের প্রতি বিশ্বাসের মূলে শোকতাপের যে-কার্যকারিতা আছে তা ঐ সত্য ঘটনার চেয়ে বেশি প্রমাণ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। শোকতাপ অত্যন্ত বিশিষ্ট রকমের মানসিক কর্তব্য সম্পন্ন করে ; এটা মৃতের থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে এবং তার স্মৃতিকে ভুলতে সাহায্য করে। এই কাজ যখন শেষ হয় তখন দুঃখ, বিষণ্ণতা, ভর্ৎসনা প্রভৃতির জোরও কমে যায়। যাদের আত্মাকে একদিন দুষ্ট দানব মনে করে মনে ভীতির সঞ্চার হোত, আজ তাদের পূর্বপুরুষ মনে করে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং দুঃখের দিনে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

যুগের পর যুগ জীবিতের সঙ্গে মৃতের সম্পর্কের পরিবর্তন যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, উভয়বলতার জোর অসাধারণ রকমের কমে গেছে। আমাদের নির্জ্ঞান মনে এখনও যে-জাতক্রোধই থাক-না কেন, তাকে দমন করার জন্য বিশেষ কোনো মানসিক শক্তি প্রয়োগ করার দরকার হয় না। আগে যেখানে তুষ্ট ঘৃণার সঙ্গে ব্যথিত কোমলতার লড়াই চলত এখন সেখানে দেখি ধর্মভাব—এ যেন ক্ষত শুকনো দাগের মতো ও দাবি জানাচ্ছে : *De mortuis nil nisi bonnm*। কেবল উদ্‌বায়ু রোগীরাই এখনও প্রিয়জনকে হারিয়ে অপরিহার্যভাবে কটুবাক্য বর্ষণ করে শোকপ্রকাশকে নিষ্প্রভ করে দেয়। এরূপ ব্যবহার যে পুরনো উভয়বলি প্রক্ষোভ-ভাবপ্রসূত তা মনঃসমীক্ষণ দেখিয়েছে। কীভাবে যে এই পরিবর্তন হলো বা কী পরিমাণে তার প্রকৃতির বদল হলো এবং উভয়বল মনোভাবের শক্তির উপশমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সত্যিকারের উন্নতি কতটা সাহায্য করল, তার আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। কিন্তু এই উদাহরণের সাহায্যে আমরা ধরে নিতে পারি যে, এখনকার সভ্য মানুষের তুলনায় তখনকার আদিম মানুষের মানসিক আবেগ খুব বেশি পরিমাণে উভয়বলতার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। এই উভয়বলতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে টাবু, যা উভয়বলি দ্বন্দ্বের আপসের লক্ষণ, তাও আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়। উদ্‌বায়ুরা এই দ্বন্দ্বের পুনঃপ্রবর্তনে বাধ্য হয় এবং এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে টাবুও জোরাল হয়। মনে হয়, তারা বহুপুরুষ আগে ফেলে আসা জিনিষকে প্রাচীনের প্রকৃতিরূপে সঙ্গে নিয়ে এসেছে এবং সাংস্কৃতিক দাবির খাতিরে এর ক্ষতিপূরণ করার জন্য উদ্‌বায়ুকে প্রাণান্তকর মানসিক প্রচেষ্টা করতে হচ্ছে।

ভুণ্ড যে টাবুর দুটো গোলমেলে রকমের মানে, অর্থাৎ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) আখ্যা দিয়েছিলেন, সে-কথা বোধহয় আমাদের স্মরণে আছে। তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, টাবু শব্দটির দ্বারা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ কিছুই না বুঝিয়ে

---

৪১. ছোটবেলায় যারা ভূতের ভয়ে কাতর থাকত বা এখনও আছে, এমন উদ্‌বায়ুগ্রস্ত লোকেদের মনঃসমীক্ষণের সময়, ভূত যে পিতার প্রতিরূপ তা প্রমাণ করা প্রায়ই শক্ত হয় না। এই সূত্রে P. Haeberlin সাহেবের লেখা Sexual Ghosts (Sexual Problems Feb. 1912)-এর সঙ্গে তুলনীয় ; যেখানে পিতার মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থায় আর একজন কামোন্মত্ত ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বুঝিয়েছে একটি দানবীয় কিছুকে, যাকে স্পর্শ করা যাবে না। এইভাবে পরবর্তী ধারণার পরস্পরবিরোধী উভয়প্রান্তের একই বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এই স্থায়ী গুণটি থেকে প্রমাণ হয় যে, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুয়ের মধ্যে গোড়াতে সম্পর্ক এই ছিল ; পরে অবশ্য তারা ভিন্ন হয়ে গেছে।

এই মতের তুলনায় আমাদের আলোচনায় আমরা ভিন্ন প্রকার অর্থ পাই। গোড়া থেকে টাবু শব্দের দুটো অর্থ ছিল, এবং এটা সব সময় নিশ্চিতভাবে উভয়বলতা সূচিত করত। টাবু নিজেই একটা উভয়বলি শব্দ, এবং এর সঙ্গে আরও একটু জোর করে আমরা বলতে পারি যে, এর নির্ধারিত অর্থ থেকে আমরা যা আন্দাজ করতে পারতাম সেইটাই আমরা আমাদের গভীর গবেষণার দ্বারা পেয়েছি : তা হচ্ছে এই যে, টাবু-নিষেধের মূল হলো প্রক্ষোভীয় উভয়বলতা। প্রাচীনতম ভাষার গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কোনো সময়ে এমন বহু শব্দ ছিল যাদের আর একটা অর্থ ছিল ঠিক উল্টো অর্থাৎ তাদের কিছু মাত্রায় উভয়বলি বলা যেতে পারে ; যদিও খুব সম্ভবত টাবু যে-অর্থে উভয়বলি ঠিক সেই অর্থে নয়।[৪২] এইরূপ পুরনো শব্দ যাদের দুটো পরস্পরবিরোধী অর্থ ছিল তাদের মৌখিকভাবে কিছু অদল বদল হয়েছে, এবং যে একটিমাত্র শব্দ দিয়ে দুটো মানে বোঝাত, পরে সেগুলো দুটো ভিন্ন শব্দ হয়ে গেছে।

টাবু শব্দটির অদৃষ্টে কিন্তু ভিন্ন কাণ্ড ঘটেছে। এর দ্বারা যে দ্ব্যর্থবোধ প্রকাশ হয় তার প্রয়োজনের অভাবে এই ভাব লুপ্ত হয়েছে কিংবা এর সমার্থবোধক শব্দমালা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এরূপ ধারণা করে নেবার পেছনে যে কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐতিহাসিক পরিবর্তন থাকতে পারে তা পরে খুব সম্ভবত আমি দেখাতে পারব। শব্দটি যে প্রথমে বিশেষ রকমের মানব সম্পর্ক সূচিত করত যার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রক্ষোভীয় উভয়বলতা এবং যা থেকে সমধর্মী অন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে গেছে তা-ও দেখানো যাবে।

আমরা ভুল না-করলে দেখতে পাব যে, মানুষের বিবেকের প্রকৃতি ও উৎপত্তির উপরও টাবু আলোকপাত করছে। টাবু-নিয়ম ভঙ্গ করার পর মনে অপরাধ ভাবের ও বিবেকদংশনের আবির্ভাব হয়। এটা প্রমাণ করার জন্য কল্পনার প্রয়োজন হয় না। টাবু-ভঙ্গজনিত বিবেকদংশন, এক কথায় টাবু-বিবেক (Taboo conscience), বোধহয় বিবেকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যত প্রমাণ পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রাচীনতম।

কারণ, 'বিবেক' (conscience) বলতে আমরা কী বুঝি ? পারিভাষিক প্রমাণ অনুযায়ী এর অর্থ হচ্ছে, যা নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত। কোনো কোনো ভাষায় চেতনা থেকে এর অর্থের প্রভেদ নেই বললেই চলে।

আমাদের মনে ইচ্ছা-বেগ (wish impulse) রয়েছে। এই ইচ্ছা-বেগের বিরুদ্ধে আপত্তির আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষীকরণই হচ্ছে বিবেক ; এই আপত্তি নিশ্চিতভাবে স্বয়ংক্রিয়, যে অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করে না। বিবেকের এই দিকটায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে। অপরাধী বিবেকের পক্ষে এটা খুব স্পষ্ট। সেখানে বেশ

---

৪২. Jahrbuch for Psychoanalytische and Psychopathologische Forschengen: 5 Abel-এর Gegensinn der Urworte উপর লিখিত আমার প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা কর। Bd II, 1910.

কতকগুলি ইচ্ছাবেগকে সফল করে তুলতে যেসব ক্রিয়া সাহায্য করে এমন সব ক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের মনের নিন্দাবাদ আমরা জানতে পারি। এর প্রমাণ করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে না। যে-ব্যক্তিরই বিবেক আছে সে নিজেই বুঝতে পারে মনের এই নিন্দাবাদ ও কৃত দুষ্কর্মের জন্য তিরস্কার কতটা সমীচীন। কিন্তু টাবুর প্রতি বর্বরদের মনোভাবের ক্ষেত্রেও ঠিক এই রকমটিই দেখা যায়। টাবু হচ্ছে বিবেকের আদেশ, এই আদেশ অমান্য হলে মনে সাংঘাতিক অপরাধভাবের সৃষ্টি হয়। এটা যেমন স্বতঃসিদ্ধ, অপরপক্ষে এর আরম্ভ কবে তাও তেমনি অনিশ্চিত।[৪৩]

অতএব, দেখা যাচ্ছে, মানব-সম্পর্কের মধ্যে যে উভয়বলতা রয়েছে সেইরূপ উভয়বলতা বোধ থেকেই বিবেকের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। টাবু ও অনুকর্ষী উদ্‌বায়ু উভয় ক্ষেত্রেই যেসব অবস্থা বর্তমান, সম্ভবত সেইসব অবস্থাতেই এর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, দুটি বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্যে একটি অপরটির জবরদস্ত চাপের দ্বারা অবদমিত হয়ে অজ্ঞাত থেকে যায়। উদ্‌বায়ু রোগের সমীক্ষণের দ্বারা আমরা যেসব জ্ঞান আহরণ করেছি তাই দিয়েই আমরা এই মতকে সমর্থন করতে পারি। প্রথমত, অনুকর্ষী উদ্‌বায়ুর ক্ষেত্রে দেখা যায়; নিজ্ঞান মনে বিচরণকারী প্রলোভনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার লক্ষণস্বরূপ পীড়াদায়ক বিবেকানুবর্তিতা প্রলক্ষণের প্রাচুর্য, যা রোগের উত্তরোত্তর অবনতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী বিবেকের (guilty conscience) সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। যদি অনুকর্ষী উদ্‌বায়ু রোগীর মাধ্যমে অপরাধীবিবেকের মূল উদ্‌ঘাটিত না হোত তাহলে এর আবিষ্কারের আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না, এ-কথা বেশ জোর দিয়েই বলা যেতে পারে। এই সমস্যাটির সমাধান নিউরোটিক ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে; এবং জাতিগুলির বেলাতেও যে এর সমাধান পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয়ত, স্পষ্টই দেখা যায় যে, অপরাধবোধের মধ্যে উৎকণ্ঠার অনেক কিছু লক্ষণই কর্তমান রয়েছে। বিনা দ্বিধায় একে বিবেক-ভীতি (conscience phobia) আখ্যা দেওয়া চলে। কিন্তু ভয়ের মূল রয়েছে নিজ্ঞান মনে। উদ্‌বায়ু রোগের মনোবিদ্যা চর্চা করে আমরা জেনেছি যে, যখন ইচ্ছানুভূতিগুলি (wish feelings) অবদমিত হয় তখন তাদের কাম (libido) উৎকণ্ঠার রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়াও আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, অপরাধবোধের মধ্যেও কিছুটা অজানা ও অজ্ঞাত (unconscious) জিনিস রয়েছে, যেমন, বর্জন করার প্রেষণা (motivation)। এই অপরাধবোধের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা তার প্রকৃতি থেকে এই অজানা পরিমাপের হদিস পাওয়া যেতে পারে।

টাবুর আত্মপ্রকাশ যদি প্রধানত নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে তাহলে একে স্বতঃসিদ্ধ বলেই গণ্য করা চলে। এর ভিত্তি যে সুনিশ্চিত বাসনাপূর্ণ আবেগের

---

৪৩. এর পাশাপাশি ঘটনা বিশেষ লক্ষণীয়। টাবু ভঙ্গ করে যে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়, অজানতে সেই নিয়ম ভঙ্গ করলেও অপরাধবোধের হ্রাস হয় না। (উপরের উদাহরণ দ্রষ্টব্য।) গ্রীসীয় উপকথার মধ্যে দেখা যায় যে, ইডিপস্ যে-কাজ সজ্ঞানে করেনি এমনকি যে-কাজ সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করেছিল সে-কথা জানা সত্ত্বেও তার অপরাধবোধ দূর হয়নি।

উপর স্থাপিত সে কথা উদ্‌বায়ুর সঙ্গে তুলনা করে জোর করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, যে-কাজ কেউই করতে চায় না সে-কাজ করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি, করারও দরকার হয় না। পরন্তু যা-কিছু করার বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে নিষেধাজ্ঞা আছে সেরূপ কাজের পিছনে নিশ্চয়ই প্রলোভনও আছে। যদি আমরা এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তটি আদিম জাতিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের এরূপ উপসংহার করতে হয় যে, আদিম জাতিদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রলোভনগুলির মধ্যে তাদের রাজা ও পুরোহিতদের হত্যা, অজাচারিতা, মৃত ব্যক্তিদের নিন্দা প্রভৃতি ইচ্ছা খুব প্রবল ছিল—এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যেখানে আমরা নিজেরাই আমাদের বিবেকের বাণী খুব স্পষ্টভাবেই শুনতে পাই সেইসব ক্ষেত্রে আমরা যদি এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করি তাহলে আমরা খুবই মতবিরোধের সৃষ্টি করব। কেননা, সে-ক্ষেত্রে আমরা খুব জোর দিয়ে এবং কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না-রেখে বলব যে, আমরা এই সব দৈবাদেশ অমান্য করতে এতটুকু প্রলুব্ধ হইনি। উদাহরণস্বরূপ—তুমি হত্যা করবে না, এবং এরূপ কথা মনে এলে আমাদের মনে ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছুর উদয় হয় না—এই দৈবাদেশটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু আমরা যদি আমাদের বিবেকের প্রামাণ্যের দাবি মেনে নিই তাহলে নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ টাবু ও আমাদের নৈতিক নিষেধাবলি অবান্তর হয়ে যায়। অপর-পক্ষে বিবেকের অস্তিত্ব অ-ব্যাখ্যাতই থেকে যায় এবং বিবেক, টাবু ও উদ্‌বায়ুর মধ্যে যোগসূত্রও অদৃশ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, আমরা আজ যেখানে আছি সেইখানেই থেকে যাই। অবশ্য যদি মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তাহলে অন্য কথা।

কিন্তু আমরা যদি মনঃসমীক্ষণের নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি সম্বন্ধে অবহিত হই তাহলে এই সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট অগ্রসর হবে; স্বভাবী সুস্থ মানুষের স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকে দেখা গেছে যে, হত্যা করার প্রলোভন সম্বন্ধে আমরা যতটা সন্দেহ করি আসল প্রলোভন তার চেয়ে ঢের বেশি জোরাল এবং এই ইচ্ছা অনেক বেশি ঘন ঘন মনে উদয় হয়। এমনকি, এটা সব সময় আমাদের চৈতন্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ না-করলেও মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে; এবং যখন আমরা জেনেছি যে কয়েকটি উদ্‌বায়ু রোগের আবেশজ সূত্রাবলি (obsessive rules) হত্যার নিমিত্ত শক্তিশালী আবেগের বিরুদ্ধে আত্মপ্রবোধ ও আত্মপীড়নের প্রতিবন্ধক খাড়া করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমাদের পূর্বোল্লিখিত প্রকল্পের, অর্থাৎ প্রত্যেক নিষেধের পিছনে যে-বাসনা লুক্কায়িত আছে তাকে পুনরায় সাধুবাদ দিতে হয়। এমতাবস্থায় আমরা ধরে নিতে পারি যে, হত্যা করার এই ইচ্ছা সত্যি করেই রয়েছে এবং টাবু ও নিষেধবিধিগুলি মনোবিদ্যার দিক থেকে মোটেই অবান্তর নয়। উপরন্তু এটি যে হননকারী আবেগের প্রতি উভয়বল (ambivalent) প্রতিন্যাস (attitude) এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব এবং তা সমর্থনযোগ্য।

এই উভয়বল সম্পর্কের প্রকৃতি অর্থাৎ নিঃসংশয় প্রচ্ছন্ন বাসনাটির আশ্রয় নির্জ্ঞান মনে তা যে মৌলিক, সে-কথা বার বার জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এই থেকেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখানোর এবং নানান সমস্যার ব্যাখ্যা দেওয়ার সম্ভাবনা

বেড়ে গেছে। আমরা জানি,সজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়া ও নিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়া হুবহু এক নয়। নিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি সুবিধা আছে, সজ্ঞান মনের বেলা সে-সুবিধাগুলি নেই। যেখানে আমরা নিজ্ঞাত (unconscious) আবেগকে প্রকাশমান হতে দেখি সেইখানেই যে তার শুরু হতে হবে এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। এর উৎপত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্র থেকেও হতে পারে এবং শুরুতে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন সম্বন্ধের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু অভিক্রান্তির (displacement) মাধ্যমে যখন এক বিশেষ অবস্থায় এসে পৌঁছয় তখনই তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এমনটি সম্ভব হবার মূলে রয়েছে নিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার অবিনশ্বরতা ও তার অসংশোধনীয়তা। এজন্যই আবেগটির প্রকাশস্থান নানান অসম অবস্থার মধ্যে হওয়াসত্ত্বেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করা সম্ভব। এসব আভাসমাত্র হলেওসাবধানেএগুলিকে বিস্তার করলে দেখা যাবে সভ্যতার বিকাশকে বুঝতে হলে এগুলির প্রয়োজন কত।

এই আলোচনা শেষ করার আগে কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়। এতে আগামীকালের গবেষণার সুবিধা হতে পারে। টাবু ও নৈতিক নিষেধের মধ্যে মূলত সাদৃশ্য বিষয়ে আমরা জোর দিলেও দুইয়ের মধ্যে মনোবিদ্যার দিক থেকে যে তফাত আছে সে-বিষয়ে আমাদের কোনো মতভেদ নেই। এমন নিষেধগুলি টাবুর আকারে যে দেখা যায় না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, মূল উভয়বলতার সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে ;

সমীক্ষণের বিচারে টাবুর ব্যাপারে অনুকর্ষী উদ্‌বায়ুর সঙ্গে এর মিল কীভাবে দেখানো যায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু টাবু উদ্‌বায়ু নয়—এটা একটা সামাজিক রচনা ; তাই এও প্রমাণ করা আমাদের দায়িত্ব যে, উদ্‌বায়ু ও সংস্কৃতিজাত টাবুর মধ্যে মূলত প্রভেদ কোথায়।

এখানে আমি পুনরায় একটিমাত্র ঘটনা নিয়ে আরম্ভ করব। আদিম জাতির লোকেরা টাবু-নিয়ম ভাঙার দরুন যে শাস্তির ভয় করে তা হয় কোনো কঠিন ব্যাধির ভয় নয়ত মৃত্যুর ভয়। এই শাস্তির ভয় কেবল তারই যে নিয়মভঙ্গ করে অপরাধী হয়েছে। অনুকর্ষী উদ্‌বায়ুর ক্ষেত্র কিন্তু অন্য প্রকার। এক্ষেত্রে রোগী যদি নিষিদ্ধ কিছু করতে চায়, তাহলে তার নিজের শাস্তি পাবার ভয় সে করে না, তার ভয় হয় অন্যের শাস্তির কথা ভেবে। এই অন্য ব্যক্তিটি সাধারণত এমন কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়। কিন্তু সমীক্ষণের দ্বারা দেখা গেছে যে,এই লোকটি রোগীরকোনোএকজনবিশেষ পরিচিত ও ভালবাসার পাত্র। অতএব দেখা যাচ্ছে, বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিটি যেন পরার্থবাদী (altruist) আর আদিম মানবটি যেন অহংবাদী (egotistical)। যখন স্বাভাবিকভাবে অপরাধীর শাস্তি না হয়, কেবল তখনই বর্বরদের মধ্যে আশঙ্কা জাগে যে, তাদের সকলেরই রীতিবিরুদ্ধ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। এবং সেইজন্য তারা নিজেরাই অপরাধীকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। এই দৃঢ়তার (solidarity) মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে খুব সোজা। এটা হচ্ছে সংক্রমণের ভয়, বা উদাহরণটি অনুকরণ করার প্রলোভনের অর্থাৎ টাবুর সংক্রামকশক্তিরভয়। যদি কোনো ব্যক্তি তার অবদমিত বাসনার তৃপ্তিদানে সমর্থ হয় তাহলে সেই বাসনা তারআরসকল সঙ্গীর মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করবে। অতএব, প্রলোভনকে দমন করে রাখার জন্য এই

ঈর্ষিত ব্যক্তিটিকে তার দুঃসাহসিকতার ফলভোগ থেকে বঞ্চিত করা একান্তই দরকার। প্রায়ই দেখা যায় যে, এই শাস্তিদান কাজের মারফত শাস্তিদাতারা প্রতিশোধ গ্রহণের নামে ঐ একই রীতিবিরুদ্ধ কাজ করার সুযোগ গ্রহণ করে। এটা সত্যই মানব রচিত অপরাধ সংহিতার (code) মূল সূত্রগুলির মধ্যে একটি। এই নিয়ম অনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তি (criminal) ও সমাজের যারা তার অপরাধের প্রতিশোধ নেয় উভয়ের ক্ষেত্রেই ঐ একই নিষিদ্ধ আবেগ বর্তমান, একথা ধরে নেওয়া খুবই সমীচীন।

ধর্মপ্রাণ লোকেরা যে বলে, আমরা সকলে একান্তই পাপীর দল, মনঃসমীক্ষণ সে-কথা অনুমোদন করে। কিন্তু তাহলে বায়ুগ্রস্তেরা যে তাদের নিজেদের ভয়ের কথা বিন্দুমাত্র না-ভেবে তাদের প্রিয়জনের জন্য এত চিন্তা করে, এ অপ্রত্যাশিত ঔদার্যের ব্যাখ্যা আমরা কী করে করব ?

মনঃসামীক্ষণিক (psychoanalytic) গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, এই ঔদার্য মৌলিক নয়। আসলে, অর্থাৎ রোগের সূত্রপাতে শাস্তির ভয়টা নিজের শরীরেই প্রযুক্ত হোত। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজেরই জীবননাশের ভয় ছিল। অন্য ব্যক্তি যে প্রিয়পাত্র, তার প্রতি মৃত্যু-ভয়টা পরে অভিক্রান্ত (displacement) হয়েছে। মানসিক ক্রিয়া এ-ক্ষেত্রে কিছুটা জটিল হলেও তার উপরে আমাদের সম্পূর্ণ দখল আছে। প্রিয়জনের মৃত্যু-কামনা-রূপ একটা দুষ্ট মানসিক আবেগ সব সময়ই যে-কোনো নিষিদ্ধকরণের মূলে বর্তমান থাকে। নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য এটা অবদমিত হয়। তারপর ঐ নিষেধটি একটি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়, যে-কাজ অভিক্রান্ত হয়ে সাধারণত শত্রুর বদলে প্রিয়পাত্রের প্রতি প্রযুক্ত হয়। এই কাজ সম্পন্ন করতে গেলেই মৃত্যুসাজার কোপে পড়তে হয়। এই প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে চলে। প্রিয়পাত্র তৃতীয় ব্যক্তিটি সম্বন্ধে আদি মৃত্যু-কামনা রূপান্তরিত হয় মৃত্যু-ভয়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উদ্‌বায়ুর কোমল পরার্থিতা মূলত উলটোমুখী বর্বর অহমিকার ক্ষতিপূরক ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি আমরা সামাজিক ক্ষেত্রের কথা বিবেচনা করি তাহলে এই প্রক্ষোভীয় আবেগগুলি যা যৌন বিষয় বাদ দিয়ে ভিন্ন মানুষের প্রতি সম্মানের মাধ্যমে নির্ণীত হয় সেই সব সামাজিক ব্যবহারের অন্তর্ধান যে উদ্‌বায়ুর বিশেষ লক্ষণ সে-কথা জোর দিয়েই বলা যায়। এই শেষোক্ত ব্যবহার পরে অতি ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে আত্মগোপন করে।

এই সব সামাজিক আবেগের উৎপত্তি ও মানুষের অন্যান্য মৌলিক আবেগের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি তাই নিয়ে আর কালক্ষেপ করব না। তার বদলে আর একটি উদাহরণের সাহায্যে উদ্‌বায়ুর দ্বিতীয় বিশেষত্বটির সন্ধান আমরা করব। যে রূপ নিয়ে টাবু আত্মপ্রকাশ করে তার সঙ্গে উদ্‌বায়ীদের স্পর্শভয়ের (touching fobia), *delire de toucher*, সাদৃশ্য আছে সবচেয়ে বেশি। সত্যি বলতে কি কামজ স্পর্শের (sexual touching) নিষিদ্ধতার সঙ্গে এই উদ্‌বায়ু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এবং উদ্দিষ্ট শক্তি (motive power) যা উদ্‌বায়ুরক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও অভিক্রান্ত হয়েছে তা যে মূলত কামজ সে-কথা মনঃসমীক্ষণ বেশ নির্বিশেষে প্রমাণ করেছে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, টাবুর বেলায় স্পর্শ সম্বন্ধে নিষেধ শুধু যে যৌনতার দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা নয়, বরং আক্রমণ, সংগ্রহণ ও ব্যক্তিগত প্রকাশের দিক থেকে আরও

সর্বজনগ্রাহ্য। যদি দলপতিকে বা তার স্পর্শিত কোনো জিনিসকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হয়, তার অর্থ হচ্ছে, একসময় যে-ইচ্ছা বা আবেগ দলপতিকে সন্দেহজনক ভেবে তার পাহারাদারিতে অংশগ্রহণ করেছে সেই ইচ্ছা বা আবেগটির উপরই এখন নিষেধবিধি জারি করা হচ্ছে। এমনকি এই আবেগটিই দলপতির অভিষেক হবার পূর্বে তার দৈহিক নির্যাতনেও অংশগ্রহণ করেছে (পূর্বোল্লেখ দ্রষ্টব্য)। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, আবেগের সামাজিক দিকটার উপরে যৌন অংশটির আধিক্যই হচ্ছে বায়ুগ্রস্ততার প্রকৃষ্ট লক্ষণ। কিন্তু সামাজিক মানসাবেগগুলি সৃষ্ট হয়েছে অহমিকা ও কামিতা উভয় অংশেরই সংমিশ্রণে গঠিত এক বিশেষ সত্তা থেকে।

টাবু ও অনুকর্ষী উদ্‌বায়ুর মধ্যে এই একটি তুলনা থেকেই আন্দাজ করা যায় যে, উদ্‌বায়ুর আকৃতিগত স্বতন্ত্রতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কী এবং কী হিসাবে উদ্‌বায়ুর মানসতার আলোচনা সংস্কৃতির প্রগতিকে বোঝার জন্য প্রয়োজন।

এদিক থেকে উদ্‌বায়ু চারুকলা, ধর্ম ও দর্শনের মহান সামাজিক সৃষ্টির সঙ্গে খুব চমৎকার ও সুদূরপ্রসারী ঐক্য রক্ষা করছে। অন্যদিকে আবার দেখে-শুনে মনে হয়, এগুলো ঐ সবের বিকৃতি। আমরা বলতে পারি যে, হিস্টিরিয়া হচ্ছে শিল্প-সৃষ্টির, অনুকর্ষী উদ্‌বায়ু, ধর্মের এবং ভ্রমবাতুলতার ভ্রান্ত দার্শনিক পদ্ধতির ব্যঙ্গাত্মক অভিব্যক্তি। এই বিচ্যুতির বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে, উদ্‌বায়ুর গঠন অসামাজিক। সমাজে যা সমষ্টিগত চেষ্টায় সাধিত হয়েছে উদ্‌বায়ু-গ্রস্তেরা তা নিজস্ব উপায়ে সাধন করতে চায়। উদ্‌বায়ুগ্রস্তদের আবেগের বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, যৌনধর্মী চালকশক্তিই তাদের মধ্যে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। অথচ অনুরূপ সাংস্কৃতিক সংগঠন নির্ভর করে সামাজিক আবেগগুলির উপর এবং অহমিকা ও যৌনতার উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত এই ধরনের বিষয়ের উপর। মনে হয়, আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মানুষকে যেভাবে বাঁধতে পারে, যৌন চাহিদা মানুষকে সেভাবে বাঁধতে পারে না। যৌনতার সন্তুষ্টি মূলত মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

উৎপত্তির ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায়, উদ্‌বায়ুগ্রস্তদের অসামাজিক প্রকৃতির সৃষ্টি হচ্ছে আসলে অপ্রিয় বাস্তব থেকে কল্পনারাজ্যের প্রিয়তর পরিবেশে বিচরণ করার বাসনা থেকে। উদ্‌বায়ুগ্রস্তেরা যে-বাস্তব জগৎকে পরিত্যাগ করে সেই জগৎ মানুষের সমাজ কর্তৃক এবং তাদের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান দ্বারা শাসিত; অতএব, এই বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মানব-সংসর্গ ত্যাগও ঘটে যাচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বপ্রাণবাদ, ইন্দ্রজাল ও চিন্তার সর্বশক্তিমত্তা

১

যাঁরা মানস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেন তাঁরা দুটো বিষয়ের কোনোটার প্রতিই সুবিচার করতে পারেন না। এই ধরনের আলোচনায় এটা যেন একটা অপরিহার্য ত্রুটি। অতএব, তাঁরা প্রেরণা যোগানোর কাজের মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেন যাতে তিনি তাঁর গবেষণার মধ্যে ঐ ইঙ্গিতের বিষয় বিবেচনা করেন। সর্বপ্রাণবাদের বিরাট আলোচনায় প্রবৃত্ত এই প্রকারের একটি রচনার মধ্যে খুব প্রকটভাবেই এই ত্রুটির বিষয় ধরা পড়ে।[১]

সর্বপ্রাণবাদ (animism) সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখলে মানস প্রত্যয়ের মতবাদ, এবং উদার দৃষ্টিতে সাধারণত এটা আধ্যাত্মিক জীবকে বোঝায়। নিসর্গভীতি (animatism), আপাতদৃষ্টিতে নির্জীব বস্তুতে প্রাণবন্ততার প্রয়োগ এই বিষয়ের একটি উপবিভাগ, যার মধ্যে নিসর্গভীতি ও সর্বপ্রাণবাদ উভয়ই বর্তমান। সর্বপ্রাণবাদ আগে একটি বিশেষ দার্শনিক মতের সঙ্গে প্রযুক্ত হোত ; মনে হয় পরে ই.বি.টাইলার-এর মারফত বর্তমান অর্থ পেয়েছে।[২]

কেন যে এরূপ নামকরণ হলো তা বুঝতে হলে একেবারে নিসর্গ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ধারণার প্রতি এবং ঐতিহাসিক ও আমাদের সমসাময়িক জ্ঞান দিয়ে আমরা যে আদিম জাতিদের জেনেছি, তাদের জগতে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এই জাতিরা মনে করে, এই পৃথিবীতে অগণিত আধ্যাত্মিক জীব রয়েছে। এই জীবগুলির মধ্যে কতকগুলি তাদের কল্যাণকামী আর কতকগুলি তাদের অকল্যাণকামী। এবং এদের বিশ্বাস প্রাকৃতিক ঘটনাবলি এই সব দেব-দানবগুলির দ্বারাই সাধিত হয়। তারা আরও মনে করে যে, শুধু প্রাণী আর উদ্ভিদ জগৎই নয় নিষ্প্রাণ বস্তুবর্গও ঐ আত্মাসকল কর্তৃক প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। সম্ভবত আদিম জাতিদের 'প্রকৃতি দর্শন'-এর তৃতীয় অংশটি, যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেইটি আমাদের কাছে তত আশ্চর্যজনক মনে হয় না, কারণ আমরা নিজেরাই এর প্রভাব থেকে বেশি দূরে যেতে পারিনি ; যদিচ আমরা প্রেতাত্মার অস্তিত্বের ক্ষেত্রকে বহুল পরিমাণে সংকীর্ণ করে ফেলেছি এবং আজকাল নৈর্ব্যক্তিক পদার্থবিদ্যার শক্তির প্রয়োগে প্রাকৃতিক সংঘটনগুলির ব্যাখ্যা

---

১. এই ধরনের বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যবশত বাধ্য হয়েই সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা দেওয়ার আশা ত্যাগ করতে হলো। তার পরিবর্তে হার্বার্ট স্পেন্সার, জে. জি. ফ্রেজার, এ. ল্যাঙ, ই. বি. টাইলর এবং ডব্লু. ভুণ্ড প্রণীত পুস্তকগুলির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই পুস্তকগুলি থেকেই আমি সর্বপ্রাণবাদ ও ইন্দ্রজাল বিষয়ের সমস্ত বিবরণ গ্রহণ করেছি, কেবল বিষয়বস্তু নির্বাচন ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রেই আমি আমার স্বাধীনতা অবলম্বন করেছি।

২. E. B. Tylor, Primitive Culture, Vol. I, p. 425, fourth edition, 1903. W. Wundt, Myth and Religion Vol. II, p. 173. 1906.

করছি। আদিম অধিবাসীরা কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রেও 'প্রাণবন্ততা'র (animation) কথা বিশ্বাস করে। মানুষের আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা তার বর্তমান আশ্রয় পরিত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে পারে ; এই আত্মা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের বাহক এবং খানিকটা দেহ-নিরপেক্ষও বটে। আদিতে আত্মা ও ব্যক্তিকে প্রায় একই গোত্রীয় বলে মনে করা হোত, কিন্তু ক্রমবিকাশের দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে আত্মা তার পার্থিব প্রকৃতিকে হারিয়ে 'আধ্যাত্মিকতা'র (spiritualization) উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে।[৩]

আত্মাবাদই যে সর্বপ্রাণবাদের আদি কারণ, প্রায় সব গ্রন্থকারই এই মত বিশ্বাস করতে পছন্দ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, যে-আত্মা স্বাধীন হয়েছে প্রেতাত্মা হচ্ছে তারই অনুরূপ। এবং মানুষের আত্মা যেভাবে গড়ে উঠেছে সেইভাবেই জন্তুর, উদ্ভিদের ও বস্তুর আত্মা গড়ে উঠেছে।

আদিবাসীরা কী করে সর্বপ্রাণবাদের মূল এই অদ্ভুত দ্বৈতবাদী মৌলিক মতবাদে এসে পৌঁছল ? নিদ্রা ও তার সঙ্গে স্বপ্ন, এবং নিদ্রারই অনুরূপ মৃত্যুর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং এই অবস্থাগুলির—যা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এত গভীরভাবে প্রভাবিত করে—ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। সর্বোপরি মৃত্যু-সমস্যাই মনে হয় এই মতবাদ সৃষ্টির আদি কারণ। আদিম মানবের কাছে জীবনের ধারাবাহিকতা—অবিনশ্বরতা—স্বতঃসিদ্ধ। মৃত্যু সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া হয়েছে পরে, এবং তাও অনেক দ্বিধার সঙ্গে। সেটা অকারণ নয়, এমনকি আমাদের কাছেও এখন পর্যন্ত এটি সারহীন এবং উপলব্ধি বহির্ভূত। খুব সম্ভবত মৃত্যুর সেই সব অংশগুলিই আলোচিত হয়েছে যেগুলি স্বপ্ন, প্রতিরূপসমষ্টি, ছায়া, প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও তাদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা সর্বপ্রাণবাদের মূল ধারণাগুলিকে পুষ্ট করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এইসব আলোচনা কোনো উপসংহারে পৌঁছতে পারেনি।[৪]

যদি আদিম মানব তার আত্মা সম্বন্ধে ধারণাকে মূর্ত করতে গিয়ে যেসব ঘটনা তার চিন্তাকে উত্তেজিত করেছে তার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়, এবং তারপর ঐ সবের ফলাফল বহির্জগতের বস্তুর উপর চালিত করে তাহলে তার মনোভাবকে স্বাভাবিকই বলতে হয় এবং কোনোক্রমেই একে রহস্যময় বলা যায় না। যেহেতু সর্বপ্রাণবাদের ধারণা সব সময়ে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই রকম হতে পারে বলে দেখানো হয়েছে, সেই সূত্রে ভুণ্ড বলেন যে, এগুলি 'অতিকথা-সংগঠনী সচেতনা'র (myth-forming consciousness) আবশ্যিক মানস বিষয়বস্তু এবং আদি সর্বপ্রাণবাদকে যতদূর পর্যন্ত আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের অন্তর্গত করতে পারি ততদূর পর্যন্ত একে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার আধ্যাত্মিক প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে।'[৫] হিউম (Hume) পূর্বেই তাঁর *Natural History of Religion* নামক পুস্তকে

---

৩. Wundt, l.c. Chapter IV , Die See lenvorstellungen.

৪. ভুণ্ড ও এইচ. স্পেন্সার এবং Encyclopaedia Britannica 1911তে শিক্ষণীয় প্রবন্ধগুলির সঙ্গে (Animism, Mythology, and so forth) তুলনীয়।

৫. l.c. p. 154.

নির্জীবের প্রতি জীবনের আরোপের কথা প্রতিপন্ন করেছেন। এই পুস্তকে তিনি বলেছেন: 'মানুষ অন্য সব বস্তুকে তাদের নিজেদের মতো মনে করে এবং তারা নিজেরা যেসব গুণাগুণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং যেগুলি সম্বন্ধে তারা বিশেষভাবে সজাগ সেইগুলি প্রত্যেক বস্তুতেই আরোপ করে থাকে—মানুষের এই মনোভাবটা বিশ্বজনীন।'[৬]

সর্বপ্রাণবাদ একটি চিন্তাধারা। এটা যে কেবল একটিমাত্র বিষয়েরই ব্যাখ্যা দিতে পারে তা নয়। এই চিন্তাধারা, এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবীকে সামগ্রিকভাবে, নিরবচ্ছিন্নরূপে দেখতে সাহায্য করেছে। লেখকগণ মনে করেন, কালক্রমে এরূপ তিনটি চিন্তাধারা, তিনটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ব চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছিল। সেইগুলি হচ্ছে সর্বপ্রাণবাদ (পৌরাণিক), ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রাণবাদই প্রথম। এটাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সঙ্গত এবং সম্পূর্ণ। এবং একমাত্র এটাই সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর প্রকৃতির ব্যাখ্যা দিতে পারে। মানুষের এই সর্বপ্রথম জগৎজোড়া ব্যবস্থাটি এখন মনোবিদ্যার একটি সিদ্ধান্ত। এই মতবাদ আমাদের ক্ষেত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবে আজকের দিনের জীবনেও এর প্রভাব কতদূর প্রতিপন্ন করা যায়। দেখা যাবে এটার অকিঞ্চিৎকর উদ্‌বর্তন (survival) রয়েছে আমাদের কুসংস্কারের মধ্যে, কিংবা সজীব আকারে বর্তমান আমাদের ভাষার ভিত্তিরূপে, আমাদের অন্ধবিশ্বাসরূপে ও আমাদের দর্শনশাস্ত্রে।

এই তিনটি বিশ্ব-চিন্তাধারার পরপর স্তরগুলির সূত্র ধরেই আমরা বলি যে, সর্বপ্রাণবাদ নিজে ধর্ম হিসাবে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু তখন তার মধ্যে এমন অনেক আবশ্যকীয় উপাদান ছিল যা থেকে পরে ধর্মমত গড়ে উঠেছে। পুরাণ বা অতিকথা যে সর্বপ্রাণবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পুরাণ ও সর্বপ্রাণবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এমন অনেক বিষয় আছে যার ব্যাখ্যা আজও হয়নি বলেই মনে হয়।

২

আমাদের মনঃসমীক্ষণের কাজ শুরু হবে ভিন্ন দিক থেকে। মানুষ যে কেবল জ্ঞানতৃষ্ণাবশত তার চিন্তার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বচিন্তা শুরু করেছে তা ধরে নেওয়া উচিত নয়। পৃথিবীকে বশে রাখবার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে কাজ করেছে। তাহলে, এই সর্বপ্রাণবাদের পাশাপাশি অন্য কোনো একটা কিছু কাজ করছে এ-কথা শুনে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মানুষের, পশুর, বস্তুর, এমনকি প্রেতাত্মার উপর প্রভুত্ব করার বাসনায় নিজস্ব শক্তির উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এস্ রেইনাক্ (S. Reinach)[৭] এই পদ্ধতিগুলিকে—যেগুলি জাদু ও ইন্দ্রজাল নামে প্রচলিত—সর্বপ্রাণবাদের রণকৌশল বলে উল্লেখ করেছেন। ম-অস্ (Mauss)

৬. Tylor, Primitive Culture, Vol. I. p. 477, দেখুন।

৭. Cultes, Mythes et Religions, T. II Introduction, p. XV, 1909.

ও হিউবার্ট (Hubert)-এর সঙ্গে আমি এইগুলিকে টেকনিক বা বিশেষ কৌশলের সঙ্গে তুলনা করার পক্ষপাতী।[৮]

জাদু ও ইন্দ্রজাল (sorcery and magic) এই দুটি ধারণাকে কি পৃথক করা যায় ? হ্যাঁ, করা যায়, যদি অবশ্য আমরা ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবহারের খামখেয়ালীর উপর নির্ভর না করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রয়োগে ইচ্ছুক হই। মানুষের প্রতি ব্যবহারের মতোই প্রেতাত্মাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ব্যবহারের দ্বারা প্রভাবিত করার কলাকৌশলই হচ্ছে আসল জাদুবিদ্যা (sorcery)। অর্থাৎ, তাদের খোশামোদ করে, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে, দরকার মতো কারও প্রতি তাদের মেজাজকে খুশি করিয়ে, অনেক সময় তাদের শাসনের ভয় দেখিয়ে কিংবা অন্য কারও ইচ্ছার বশবর্তী করিয়ে, যেমন করেই হোক তাদের প্রভাবিত করা। মানুষের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত প্রক্রিয়া কার্যকর হয়ে থাকে সেই সমস্ত প্রক্রিয়া এ-ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়।

ম্যাজিক কিন্তু অন্য জিনিস। ম্যাজিক মূলত প্রেতাত্মাদির ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত নয় এবং এ-ক্ষেত্রে সাধারণ মনোবিদ্যার পদ্ধতির ব্যবহারের বদলে বিশেষ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সর্বপ্রাণবাদের চেয়ে ম্যাজিক যে আরও পুরনো এবং এটা যে সর্বপ্রাণবাদের একটি প্রয়োজনীয় অংশ তা সহজেই অনুমেয়। কারণ, যে-সমস্ত প্রক্রিয়া প্রেতাত্মাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য প্রয়োগ করা হয় সেগুলি ম্যাজিকের মধ্যেও দেখা যায়।[৯] এবং যেখানে প্রকৃতির প্রেতাত্মীকরণ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এমন সব জায়গায় এখনও ম্যাজিক প্রযুক্ত হয়ে থাকে বলেই আমাদের মনে হয়।

ম্যাজিককে হরেক রকমের উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। এটা প্রাকৃতিক কার্য-প্রক্রিয়াকে মানুষের ইচ্ছার বশবর্তী করবে, ব্যক্তিকে তার শত্রু ও বিপদ থেকে রক্ষা করবে এবং ঐ ব্যক্তিকে তার শত্রু নিধনের জন্য শক্তি যোগাবে। কিন্তু যেসব মূল নীতির উপর ম্যাজিক প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ম্যাজিকের যেগুলি মূল নীতি তা এতই স্পষ্ট যে সকল গ্রন্থকারই তা বুঝেছিলেন। আমরা যদি ই. বি. টাইলরের মতামতের প্রকাশ্য অর্থটাই ধরি তাহলে খুব সংক্ষেপে কয়েকটিমাত্র কথায় প্রকাশ করা যেতে পারে : 'একটি কাল্পনিক যোগসূত্রকে আসল বলে ভুল করা'। এই বৈশিষ্ট্যটি আমরা ম্যাজিকের ক্রিয়াকাণ্ডের দুটি বিভাগের মধ্যে বিশদভাবে দেখবার চেষ্টা করব।

শত্রুকে শায়েস্তা করার জন্য ম্যাজিকের একটি খুব প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে যে-কোনো বস্তু নিয়ে ঐ শত্রুর একটি প্রতিকৃতি তৈরি করা। মূর্তির সাদৃশ্য নিয়ে কিছু যায় আসে না, আসলে যে-কোনো বস্তুকেই তার মূর্তি বলে 'নামকরণ' করলেই হলো। এই প্রতিমূর্তির প্রতি পরে যেরূপ ব্যবহার করা হবে ঠিক সেই রকমটিই ঐ ঘৃণিত শত্রুর ক্ষেত্রে ফলবে। যেমন, যদি প্রতিকৃতিটির কোনো অঙ্গহানি করা হয় তাহলে কোনো অসুখের দ্বারা শত্রুর শরীরের অনুরূপ অংশটিই আক্রান্ত হবে। ম্যাজিকের এই কলাকৌশল শুধু ব্যক্তিগত শত্রুর বিরুদ্ধেই কাজ করে না, সৎ উদ্দেশ্যেও প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন, দুষ্ট দানবের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য দেবতাদের সাহায্য করার

---

৮. Anne Sociologique, Seventh Vol. 1904.

৯. গোলমাল ও চিৎকার করে ভূত তাড়ানোটা জাদুবিদ্যার একটি রূপ। আর ভূতের নাম নিয়ে তাকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করানোটা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ম্যাজিকের প্রয়োগ।

কাজে লাগানো যেতে পারে। আমি ফ্রেজারের পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি[১০]: 'প্রাচীন মিশরে সূর্যদেব রা (Ra) দিনের শেষে রক্তিম পশ্চিমাকাশে তাঁর নিজের আবাসে ফিরে যাবার পর শয়তান আপেপির (Apepi) নেতৃত্বে একদল দুষ্ট দানব দ্বারা আক্রান্ত হন। সারা রাত্রি তিনি ঐ দুর্বৃত্তদের সঙ্গে লড়াই করেন এবং এক এক সময় দিনমানেও অন্ধকার রাজ্যের দুর্বৃত্তেরা মিশরের নীল আকাশের মধ্যে মেঘ পাঠিয়ে দিয়ে সূর্যদেবের শক্তি ও আলোক ম্লান করে দিত। দৈনন্দিনের এই যুদ্ধে সূর্যদেবকে সাহায্য করার জন্য থেবিসে (Thebes) তাঁর মন্দিরে প্রত্যেক দিন পূজা করা হোত। কুৎসিত মুখবিশিষ্ট একটি কুমীরের আকারে, কিংবা বহু কুণ্ডলাকৃতি একটি সাপের আকারে সূর্যদেবের শত্রু আপেপির একটি ব্যঙ্গ প্রতিকৃতি মোম দিয়ে তৈরি করা হোত এবং এইটির উপর সবুজ কালি দিয়ে ঐ দানবটির নাম লিখে দেওয়া হোত। এক প্রকার ঘাসের তৈরি (papyrus) বাক্সে এটিকে মুড়ে তার উপর আবার আপেপির একটি অনুরূপ মূর্তি সবুজ কালি দিয়ে আঁকা হোত। তারপর ঐ মূর্তিটিকে আবার কালো চুল দিয়ে বেঁধে তার উপরে থুতু ফেলা হোত এবং একটি পাথরের ছুরি দিয়ে সেটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খণ্ডবিখণ্ড করে মাটিতে ফেলে দেওয়া হোত। তারপর সেখানে পুরোহিত তাঁর বাঁ পা দিয়ে সেটার উপর বার বার লাথি মারতেন এবং সবশেষে এক প্রকার ঘাসের আগুনে তাকে দগ্ধ করা হোত। এইভাবে আপেপির ব্যঙ্গ মূর্তি নিঃশেষে দগ্ধ হবার পর তার প্রধান প্রধান সহকারি দানবগুলির একটি করে মোমের মূর্তি গড়ে তার সঙ্গে তাদের মাতা, পিতা ও সন্তানদের নকল মূর্তি একসঙ্গে করে আগের মতোই দগ্ধ করা হোত। কতকগুলি নির্বাচিত মন্ত্র পাঠ করে এই সঙ্গে প্রার্থনা চলত। এই প্রার্থনা শুধু সকাল দুপুর ও রাত্রিব্যাপী চলত না, যখনই ঝড় উঠত বা ভারী বৃষ্টি নামত কিংবা সূর্যের জ্যোতির্ময় চক্রটি ঢাকবার জন্য আকাশের এপার ওপার মেঘের লুকোচুরি চলত তখনই ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হোত। অন্ধকারের, মেঘের ও বৃষ্টির শয়তানগুলি তাদের প্রতিকৃতির উপর নিক্ষিপ্ত আঘাতকে এমনভাবে অনুভব করত যাতে মনে হোত যেন তাদেরই শরীরের উপর ঐ আঘাত হানা হয়েছে। তারা সরে যেত, অন্তত সাময়িকভাবে, এবং তখন আবার কল্যাণময় সূর্যদেব হাসিমুখে তাঁর কিরণ বিকীরণ করতেন।'[১১]

এমন রাশি রাশি ম্যাজিকের ক্রিয়াকলাপ আছে যেগুলি একই রকম উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমি এখানে বিশেষ করে মাত্র দুটির কথা উল্লেখ করব। এই দুটি আদিম জাতির জীবনে সব সময়ই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে এবং ক্রমোন্নতির উচ্চস্তরে পুরাণ ও ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আংশিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। যেমন, ম্যাজিকের দ্বারা বৃষ্টি ও উর্বরতা বৃদ্ধির কলাকৌশল। ম্যাজিকের সাহায্যে বৃষ্টি তৈরি করা হয় বৃষ্টির নকল করে, এবং সম্ভবত যে মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি

---

১০. The Magic Art, II, p. 67.

১১. কোনো কিছু জীবিত জিনিসের প্রতিমূর্তি গঠনের বিরুদ্ধে বাইবেলের অনুশাসন যে মূর্তি গঠনের মূল নীতিকে বর্জন করার জন্য বলেছিল তা মনে হয় না। পরন্তু মনে হয় ম্যাজিক, যা হিব্রুধর্মে নিষিদ্ধ, সেই ম্যাজিককে তার একটি অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করাই ছিল এটার উদ্দেশ্য। Frazer, l.c., p. 87-note.

আনে তাদের নকল করে। দেখে মনে হয়, যেন তারা বৃষ্টি-বৃষ্টি খেলা করতে চায়। যেমন, জাপানের আইনো-রা (Ainos) মস্ত বড় একটা ছাঁকনিতে জল ঢেলে বৃষ্টি তৈরি করে। কেউ কেউ আবার মস্ত বড় একটা পাত্রে পাল ও দাঁড় লাগিয়ে এমনি করে যে, দেখে মনে হয় যেন একটা জাহাজ। সেইটিকে তখন গ্রাম ও বাগানের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু জমির উর্বরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার ম্যাজিক কৌশল হচ্ছে জমিকে মানুষের রতিক্রিয়া প্রদর্শন। এমন বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করছি। জাভা দ্বীপের কোনো এক অংশে যখন ধানগাছগুলির ফুল ফোটার সময় হোত তখন চাষীরা রাত্রে মাঠের মধ্যে স্ত্রীসম্ভোগের জন্য যেত। উদ্দেশ্য, তাদের দৃষ্টান্ত দেখে ধানগাছগুলিও ফলবতী হবে।[১২] এইসঙ্গে অবশ্য এ-ভয়ও ছিল যে, নির্বিক্ক অনাচার ক্রিয়া ঘটলে আগাছার জন্ম হবে এবং ধানগাছ নিষ্ফল হবে।[১৩]

উপরোক্ত প্রথম বিভাগের সঙ্গে কয়েকটি নিষেধাত্মক নিয়ম অর্থাৎ ম্যাজিকের কয়েকটি সতর্কতাও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদি দেয়াক্ (Dayak) গ্রামের কয়েকজন অধিবাসী বুনো শুয়োর শিকারের জন্য যাত্রা করে থাকে, তাহলে যারা গ্রামে থাকল তারা ইতিমধ্যে তেল বা জল কোনোটাই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবে না ; যদি করে, তাহলে শিকারীদের আঙুল নরম হয়ে যাবে এবং তাদের হাত ফসকে শিকার পালিয়ে যাবে।[১৪] কিংবা যখন কোনো গিল্যাক (Gilyak) শিকারী বনের মধ্যে শিকারের অনুসরণ করে চলেছে তখন তার ছেলেরা কোনো কাঠের উপর কিংবা বালির উপর কোনো ড্রইং করবে না। কেননা, তাহলে ঘন জঙ্গলের মধ্যের রাস্তাগুলো ড্রইং-এর রেখার মতো গোলমেলে হয়ে যেতে পারে এবং উক্ত শিকারী তার বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে না পেতে পারে।[১৫]

এই সমস্ত এবং ম্যাজিকের শক্তি সম্বন্ধে আরও রাশিকৃত দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখা যায় যে, এখানে দূরত্বের কোনো ভূমিকাই নেই। এইসঙ্গে অবশ্য টেলিপ্যাথির দৃষ্টান্ত এসে পড়ে ; এ থেকে ম্যাজিকের বৈশিষ্ট্য বুঝতে কোনো কষ্ট হবে না।

এই সব উদাহরণের মধ্যে যে একটা কার্যকর শক্তি আছে সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে মানুষ যা করছে এবং যা সে আশা করছে এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটি লক্ষণীয়। এই জন্য ফ্রেজার সাহেব এইরূপ ম্যাজিকের নাম দিয়েছেন অনুকরণপ্রিয় বা হোমিওপ্যাথিক। যদি আমি বৃষ্টি চাই তাহলে আমার যা করা দরকার তা হচ্ছে, আমাকে এমন কিছু করতে হবে যা বৃষ্টির মতো দেখতে হবে বা বৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আমাদের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পরবর্তীকালে এই ম্যাজিকের যাদুমন্ত্র প্রয়োগের বদলে দেবতার মন্দিরে শোভাযাত্রার প্রচলন হয়েছে। যাতে ঐ দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং বারি বর্ষণ করেন। আরও পরে এই ধর্মপ্রক্রিয়া ত্যাজ্য হবে এবং তার পরিবর্তে অনুসন্ধান চলবে, কী করে বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে বৃষ্টি ঘটানো যায়।

---

১২. The Magic Art, II. p. 98.

১৩. এই ধরনের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে Sophocles-এর Oedipus Rex পুস্তকে।

১৪. The Magic Art, II. p. 120.

১৫. I.c., p. 122.

ম্যাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের আর একটি বিভাগে এই সাদৃশ্যের নীতি অনুসৃত হয় না ; কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য আর একটি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সেইটির প্রকৃতি নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে সুস্পষ্ট হবে।

ম্যাজিকে আর একটি পন্থা ব্যবহৃত হয়ে থাকে শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য। এজন্য তুমি শত্রুর চুল, নখ কিংবা সে ফেলে দিয়েছে এমন যে-কোনো জিনিস, এমনকি তার পোশাকের যে-কোনো অংশ সংগ্রহ কর এবং সেইগুলির উপর অনিষ্টকর কোনো কিছু কর। ঐ লোকটিকে সশরীরে তোমার আয়ত্তাধীনে পেলে তোমার ঐ কাজটি যেমন কার্যকর হোত, এই প্রক্রিয়াতে ঠিক তেমনই কাজ হবে এবং ঐ ব্যক্তিটির অধিকৃত যে কোনো জিনিসের উপর তুমি যেমন ব্যবহার করবে ঐ লোকটির কপালে ঠিক সেই-রূপটিই ঘটবে। আদিম জাতির লোকেদের কাছে নাম হচ্ছে অস্মিতার একটি অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। অতএব, যদি তুমি কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রেতাত্মার নামটি জানতে পার তাহলে তুমি ঐ নামের মালিকের উপর খানিকটা জোর খাটাতে পারবে। এই থেকে নামের ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সাবধানতা ও সংযমের তাৎপর্য বেশ পরি-স্ফুট হয়। এই বিষয় আমরা টাবু-প্রবন্ধের মধ্যে আগেই উল্লেখ করেছি।[১৬] এই দৃষ্টান্তগুলিতে সাদৃশ্যের বদলে সম্পর্ক বা সম্বন্ধের প্রকাশ খুবই স্পষ্ট।

আদিম জাতিদের মানুষের মাংস খাওয়ার অভ্যাস এইরূপ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত। কোনো ব্যক্তির শরীরের কোনো অংশ ভক্ষণ করে তার সেই অংশের গুণগুলি অর্জন করাই হলো উদ্দেশ্য। এর থেকেই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় খাদ্য সম্বন্ধে বাদ-বিচারের সৃষ্টি। যেমন, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এমন কোনো প্রাণীর মাংস খাবে না যাতে ঐ প্রাণীর অবাঞ্ছনীয় ধর্মগুলি, যেমন কাপুরুষতা, তার ভ্রূণস্থ শিশুতে প্রচালিত হয়। এই যোগাযোগ পূর্বেই ঘটে থাকুক বা কেবল একবারের মতো খুবই দরকারি যোগাযোগ হয়ে থাকুক ম্যাজিক শক্তির ক্ষেত্রে তাতে কিছুই আসে যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন বলা যায়, কোনো অস্ত্রের দ্বারা আহত স্থানের যে ম্যাজিক-সম্বন্ধ ঘটেছে তা হাজার হাজার বছরেও পরিবর্তন হবে না বলে বিশ্বাস করা হয়। যদি কোনো মেলানেশীয়া-বাসী কোনো ধনুকের দ্বারা আহত হয় তাহলে সে সেই ধনুক সংগ্রহ করতে পারলে তা ঠাণ্ডা জায়গায় সন্তর্পণে রক্ষা করবে, যাতে তার আহত স্থানের জ্বালা-যন্ত্রণা কম থাকে। কিন্তু যদি ধনুকটি শত্রুর দখলে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই ঐটিকে আগুনের খুব নিকটে রাখবে যাতে তার শত্রুর আহত স্থানে যন্ত্রণা বাড়ে এবং জ্বলে পুড়ে যায়। প্লিনি (Pliny) তাঁর *Natural History* নামক পুস্তকের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন, যদি অসাবধানে কাউকে আঘাত করে দুঃখিত হয়ে আহত ব্যক্তির হাতে থুতু দেয় তাহলে আহত স্থানের ব্যথা তৎক্ষণাৎ কমে যাবে। ফ্রান্সিস বেকন (FrancisBacon) তাঁর *Natural History* নামক পুস্তকে একটি সর্বসাধারণের গভীর বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন ; যে-অস্ত্রটি কাউকে আহত করেছে তার উপরে কোনো ক্রীতদাসকে স্থাপন করলে ঐ আহত স্থানটি আপনা থেকেই সেরে যাবে। শোনা যায়, ইংরেজ চাষী আজও এই নিয়মটি অনুসরণ করে। যদি তাদের কাস্তে দিয়ে নিজেদের শরীরের

১৬. পূর্বোল্লিখিত 'টাবু' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কোনো অংশ কেটে যায় তাহলে সেই মুহূর্তে এ অস্ত্রটিকে পরিষ্কার করে রাখবে, যাতে ক্ষতটি না দূষিত হয়। ১৯০২ সালের জুন মাসে একটি স্থানীয় ইংরেজি পত্রিকায় দেখা যায় যে, নরউইচের মাটিলদে হেনরি (Matilde Henry) নামে এক মহিলার পায়ের তলায় একটি লোহার পেরেক ফুটে যায়। তখন ক্ষত স্থানটি পরীক্ষা না-করে, এমনকি পায়ের মোজা পর্যন্ত না-খুলেই ঐ মহিলা তাঁর মেয়েকে আদেশ করেন ঐ পেরেকটিতে বেশ করে তেল মাখাতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই ক্ষত বিষাক্ত হয়ে কয়েকদিন পরে ধনুষ্টঙ্কারে তাঁর মৃত্যু হলো।[১৭]

এই শেষ বিভাগের উদাহরণগুলি থেকে ফ্রেজার বর্ণিত **ছোঁয়াচে** ম্যাজিক এবং **অনুকরণ** ম্যাজিকের মধ্যে যা তফাত তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যা কার্যকর বলে মনে হয় তা সাদৃশ্য নয়, স্থানিক সম্পর্ক, সান্নিধ্য কিংবা অন্ততপক্ষে কল্পিত সান্নিধ্য অথবা ঐ সান্নিধ্যের স্মৃতি। কিন্তু সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য দুটোই ভাবানুষঙ্গের (association of ideas) অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক তত্ত্ব; সেই হেতু উপসংহার করা যায় যে, ম্যাজিকের নিয়মের সব পাগলামির সত্যিকারের ব্যাখ্যা ভাবানুষঙ্গের প্রাধান্য দিয়েই করা সম্ভব। টাইলর (Tylor) থেকে উদ্ধৃত ম্যাজিকের বৈশিষ্ট্যের 'একটি কাল্পনিক যোগসূত্রকে আসল বলে ভুল করার' সত্যতা এখন বোঝা যাবে। ফ্রেজারের ধারণা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। তিনিও প্রায় একই ভাষায় বলেছেন: 'মানুষ তাদের নিজেদের ধারণাকে প্রকৃতির নিয়ম বলে ভুল করেছে এবং এইজন্য সে কল্পনা করেছে যে, তার চিন্তার উপর নিজের আধিপত্য আছে কিংবা আছে বলে মনে করে তার জোরে সে অন্যান্য বস্তুর উপর অনুরূপ আধিপত্য করবে।'[১৮]

ম্যাজিকের এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাকেও কয়েকজন গ্রন্থকারের বাতিল করে দেওয়াটা প্রথমে খুব আশ্চর্যজনক বলে মনে হবে।[১৯] কিন্তু ভালোভাবে বিবেচনা করে দেখলে এই আপত্তি আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে, ম্যাজিকের অনুষঙ্গতত্ত্ব কেবল ম্যাজিকের গণ্ডিটুকুরই ব্যাখ্যা করতে পারে, তার আসল প্রকৃতির ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যে-ভুল বোঝার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তে মনোবিদ্যার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। স্পষ্টতই একটা গতীয় কারণের (dynamic factor) অভাব আমরা এখানে অনুভব করছি। এই অনুসন্ধানের ফল ফ্রেজারের সমালোচকদের পথভ্রষ্ট করলেও অনুষঙ্গতত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে এবং তার আরও গভীরে প্রবেশ করে ম্যাজিকের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ হবে।

প্রথমে সহজতর ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুকরণ-ম্যাজিকের বিষয়টাই পরীক্ষা করে দেখা যাক। ফ্রেজারের মতে এর ব্যবহার নিজের থেকেই হতে পারে অর্থাৎ এটা পরনির্ভরশীল নয়। কিন্তু ছোঁয়াচ-ম্যাজিক অনুকরণকে আগে থেকে অনুমান করে নেয়।[২০] যে-উদ্দেশ্যের তাগিদে কেউ ম্যাজিক ব্যবহার করে তা সহজেই বোঝা

---

১৭. Frazer, The Magic Art, pp. 201-3.

১৮. The Magic Art, p. 420.

১৯. Encyclopaedia Britanica, ১১শ সংস্করণ, Magic নামক প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনীয়।

২০. l.c., p. 54.

যায় সেটা হচ্ছে মানুষের মনের ইচ্ছা। এখানে আমাদের কেবল স্বীকার করে নিতে হবে যে, আদিম মানবের মনে তার নিজের ইচ্ছার শক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ম্যাজিক দিয়ে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ যে, সেটা সে করতে দিয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় তার ইচ্ছাই প্রবল হয়ে কাজ করছে।

শিশু অবস্থাতেও এই রকম মানসিক অবস্থা থাকে। যখন শিশু তার অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা কোনো কাজ করতে পারে না সেই অবস্থায় শিশু অমূল প্রত্যক্ষের (hallucination) দ্বারা তার ইচ্ছা পূরণ করে ; এ-কথা আমরা অন্যত্র সমর্থন করেছি। এজন্য শিশু তার সংবেদজ ইন্দ্রিয়স্থানের (sensory organ) কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) উত্তেজনার দ্বারা সন্তোষজনক পরিস্থিতি তৈরি করে নেয়।[২১] একটি কর্মজ আবেগ (motor impulse)-সংকল্প, তার ইচ্ছার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এবং এই সংকল্প, যা ইচ্ছা পূরণের জন্য পরে পৃথিবীর রূপ পর্যন্ত বদলে দেবে, তাই-ই এখন সন্তুষ্টির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছে, যাতে সত্যিই যেন কর্মজ অমূল প্রত্যক্ষের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। পরিতৃপ্ত ইচ্ছার এরূপ প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে শিশুদের খেলার হুবহু তুলনা করা চলে। শিশুদের এই খেলায় সন্তুষ্টিসাধনের আসল সংবেদজ পদ্ধতিকেই স্থানচ্যুত করে। যদি খেলা এবং অনুকরণপ্রিয় প্রতিনিধিত্ব শিশু এবং আদিম মানুষের পক্ষে যথেষ্ট হয় তাহলে আমাদের বেলায় এটা শিষ্টতার চিহ্ন হিসাবে কিংবা তাদের অক্ষমতা জানার জন্য আত্মসমর্পণ হিসাবে ধরা উচিত হবে না। পরন্তু এটা তাদের ইচ্ছা এবং ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল সংকল্প ও ইচ্ছা যে-পথ অনুসরণ করে সেই পথ—এসবেরই অত্যন্ত বেশি মূল্য দেওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল। সমরকালে মানসিক ঝোঁকটা ম্যাজিকের উদ্দেশ্য থেকে সরে উপায়ের উপর অর্থাৎ ক্রিয়াকর্মের উপর এসে পড়েছে। বরং এই কথাই হয়ত বলা ঠিক হবে যে, যতক্ষণ না কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয় ততক্ষণ আদিম মানব তার মানসিক ক্রিয়ার অতিমূল্যের কথা জানতেই পারে না। এ-ও মনে হতে পারে যে ম্যাজিক ক্রিয়াই ঈপ্সিত বস্তুর সঙ্গে মিল থাকার জন্য—ইচ্ছা পূরণ করতে বাধ্য করে। সর্বপ্রাণবাদের স্তরে ব্যাপারটা যে কী হচ্ছে তা আজও চাক্ষুষ প্রদর্শন করা যায় না। এরূপ সম্ভব হয়েছে পরে, যদিও আগের পদ্ধতি এখনও চলছে, যখন অবদমনের প্রবণতা থেকে সন্দেহবাদের মানসিক প্রক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। সেই অবস্থাতে মানুষ বিশ্বাস করেছে যে, যদি মনে বিশ্বাস না থাকে তাহলে আত্মার প্রতি যাদুমন্ত্রের কোনো ফল হবে না, এবং প্রার্থনার ঐন্দ্রজালিক কার্যকারিতা সফল হবে না যদি সেই ভক্তি না থাকে।[২২]

ছোঁয়াচ-ম্যাজিকের সম্ভাবনা সান্নিধ্য-অনুষঙ্গের উপর নির্ভর করে। এই থেকে আমরা দেখতে পাব যে, ইচ্ছা ও সংকল্পের মানসিক গুরুত্ব প্রসারিত হয়েছে সেই সব মানসিক প্রক্রিয়ার দিকে যেসব ক্রিয়ং সংকল্পের শাসনাধীন। আমরা বলতে পারি যে

---

২১. Formulation of Two Principles of Psychic Activity, Jahrbfur Psychoanalyst Forchungen, Vol. III, 1912, p. 2.

২২. The King in Hamlet (Act III, scene 4) :

May words fly up, my thoughts remain below,
Words without thoughts never to heaven go.

বর্তমানে সব মানসিক প্রক্রিয়াকেই অতি মূল্যবান মনে করার যেন একটা চেষ্টা চলছে, অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন মনোভাব দেখা যাচ্ছে যা আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী মনে হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে চিন্তার সম্বন্ধের মধ্যে চিন্তার দিকটায় আতিশয্য দেখা দিয়েছে। বস্তু জগৎ সাধারণত ঐ বিষয়ের চিন্তার দ্বারা সমাচ্ছন্ন। যা চিন্তার বেলায় ঘটেছে তা অবশ্যই বস্তুর বেলায় ঘটবে এবং বিভিন্ন ভাবের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান, বস্তুর মধ্যেও সেইরূপ সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ। যেমন, চিন্তা দূরত্বকে স্বীকার করে না এবং স্থান ও কালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বস্তুকে চেতনার একটিমাত্র ক্রিয়ার দ্বারা তাদের একত্রীভূত করতে পারে, তেমনি ম্যাজিকও টেলিপ্যাথির সাহায্যে দূরত্বকে অস্বীকার করে এবং অতীত অনুষঙ্গকে বর্তমানের মতো করে দেখে। সর্বপ্রাণবাদের যুগে অন্তরাত্মার প্রতিফলন আমাদের পরিচিত পৃথিবীর চিত্রকে ঝাপসা করে দেবেই।

অনুষঙ্গের দুটো মূল নীতি, সাদৃশ্য ও সান্নিধ্য যে যোগসম্পর্কের উচ্চতর পর্যায়ে মিলে যায়, সেদিকটাতেই আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সান্নিধ্য-অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে সম্পর্কটা হচ্ছে সোজাসুজি এবং সাদৃশ্য-অনুষঙ্গের বেলায় সম্পর্ক হচ্ছে বদলি অর্থে। মানসিক প্রক্রিয়ার আরও একটা ঐক্য আছে, সেটা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। খুব সম্ভবত সেটা লুকিয়ে আছে দুই রকম অনুষঙ্গের জন্য একই শব্দের ব্যবহারের মধ্যে। আমরা টাবুর ব্যাখ্যাকালীন সম্পর্কের যে প্রত্যয় (concept) লক্ষ করেছি, এ ক্ষেত্রের প্রত্যয়ও ঐ একই গোত্রীয়।[২৩]

উপসংহারে এখন আমরা বলতে পারি যে, যে-তত্ত্ব ম্যাজিককে সংযত করে এবং যা সর্বপ্রাণবাদী চিন্তার কৌশল-কলা, তা হচ্ছে চিন্তার সর্বশক্তিমত্তা।

৩

'চিন্তার সর্বশক্তিমত্তা' কথাটা আমি একজন খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। ইনি পূর্বে অনুকর্ষী-উদ্‌বায়ুর এক রোগী ছিলেন। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে নীরোগ হওয়ার পর তিনি তাঁর কর্মকুশলতার ও কার্যকরী বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দেখাতে পারতেন।[২৪] তিনি এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করতেন সেই সব অদ্ভুত ও বিরক্তিকর ঘটনাকে বোঝাবার জন্য যেগুলো তাঁকে অনুসরণ করত বলে তাঁর মনে হোত। অনুরূপ রোগীদের আজও যেমন অনুসরণ করে। যেমন, তিনি যদি কোনো লোকের কথা ভাবতেন তাহলে সত্যি করেই সেই লোকের মুখোমুখি হতেন, মনে হোত যেন তিনি ঐ ব্যক্তিকে যাদু করেছেন। অনেক দিন দেখা হয়নি এমন কোনো পূর্ব পরিচিত ব্যক্তি কেমন আছেন সে-খোঁজ হঠাৎ যদি করেন তাহলে নিশ্চিত তিনি শুনবেন যে, ঐ পরিচিত ব্যক্তি এক্ষুনি মারা গেছে। এমন যদি হোত, তাহলে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঐ মৃত ব্যক্তি টেলিপ্যাথির সাহায্যে নিজেরপ্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যদি তিনি কোনো অপরিচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৌখিক অভিশাপ বাক্য

২৩. 'তৃতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনীয়।

২৪. অনুকর্ষী উদ্‌বায়ুর একটি রোগী সম্বন্ধে মন্তব্য, (Remarks upon a case of Compulsion Neurosis) Jahrb. Fur Psychoanalyst and psychopath. Forschungen, Vol. I, 1909.

উচ্চারণ করতেন তাহলেই তিনি আশা করতেন যে ঐ ব্যক্তি তারপরে শীঘ্রই মারা যাবে এবং তার মৃত্যুর জন্য তাঁকে দায়ী হতে হবে। এই সমস্ত ঘটনাগুলিই তিনি চিকিৎসাকালীন ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কেমন করে এই অধ্যাসের (illusion) সৃষ্টি হলো এবং তিনি নিজেই এই কুসংস্কারগ্রস্ত বাসনা কী করে গড়ে তুলেছেন তাও তিনি বলতে পারতেন।[২৫] সমস্ত অনুকর্ষী-উদ্‌বায়ু রোগই এইরূপ কুসংস্কারগ্রস্ত এবং প্রায়ই দেখা যায় তাদের সুবিবেচনার বিরুদ্ধেই তারা এই রকম হয়ে উঠেছে।

অনুকর্ষী-উদ্‌বায়ুর মধ্যে চিন্তার সর্বশক্তিমত্তার নিদর্শন সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট দেখা যায়। চিন্তারাজ্যের এই আদিম প্রক্রিয়ার ফলাফল এইসব রোগীদের জীবনে, তাদের সজ্ঞান জীবনেই হামেশা দেখা যায়। কিন্তু এর মধ্যে এই ধরনের উদ্‌বায়ুর একটি বিশেষ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কেননা, সমীক্ষণের দ্বারা দেখা গেছে যে, এইরূপ লক্ষণ অন্য প্রকারের উদ্‌বায়ুর মধ্যেও রয়েছে। প্রত্যেক উদ্‌বায়ুর বেলাতেই দেখা যায়, চিন্তার বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে রোগের লক্ষণ সৃষ্টি হয়েছে, অভিজ্ঞতার উপর নয়। উদ্‌বায়ু রোগীরা বা নিউরোটিকরা একটি বিশেষ রাজ্যে বাস করে যেখানে (আমি অন্যত্র এ-কথা উল্লেখ করেছি) কেবল-মাত্র 'নিউরোটিকদের মুদ্রা-মানই' (neurotic standard of currency) চলে। অর্থাৎ তারা সেই সব বিষয়ই বিশেষ করে চিন্তা করবে বা অনুরাগের সঙ্গে বুঝবে যেগুলি তাদের মনে লাগে ; এই বিষয়গুলি সত্যিকারের বাস্তব জগতের সঙ্গে খাপ খায় কিনা সে সম্বন্ধে তারা পরোয়া করে না। হিস্টিরিয়া রোগী তার রোগের আক্রমণের মধ্যে যেসব ঘটনা তার কল্পনারাজ্যেই ঘটেছিল কেবলমাত্র সেইগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে কিংবা তার রোগলক্ষণের মাধ্যমে ঐসবে সংবদ্ধ হয়, যদিও সমীক্ষণের শেষের দিকে সে আসল ঘটনাতে বা ঘটনা সংশ্লিষ্ট বাস্তবে ফিরে যায়। যদি সত্যিকার অপরাধের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে নিউরোটিকের অপরাধ-বিবেকও এমনি অবোধ্য মনে হবে।

অনুকর্ষী উদ্‌বায়ু এমন অপরাধবোধের দ্বারা পীড়িত হতে পারে যা পুরোদস্তুর হত্যাকাণ্ডজনিত অপরাধের সমতুল্য ; কিন্তু একই সঙ্গে সে তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ব্যবহারে খুবই সহানুভূতিশীল ও যত্নবান হতে পারে এবং এইরূপ ব্যবহারের পরিচয় সে শিশুকাল থেকেই দিয়ে আসে। তবুও তার অপরাধবোধ থাকার যথেষ্ট কারণ আছে ; এই কারণ খুব জোরাল এবং মনে বারংবার মৃত্যু ইচ্ছা জাগার ওপর এর ভিত্তি যা তার সাথীদের প্রতি তার অজান্তে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই অপরাধবোধের প্রেষণা নির্জ্ঞান চিন্তার দিক থেকে আসে। কিন্তু এটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। এইরূপে চিন্তার সর্বশক্তিমত্তা, বাস্তব-দ্বন্দ্বী মানসিক প্রক্রিয়ার আতিশয্য নিউরোটিকের আধুনিক জীবনে এবং এই জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে অপরিসীম কাজ করে। যদি আমরা এমন লোককে মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত করি, যে চিকিৎসা নির্জ্ঞান মনের চিন্তাকে সজ্ঞান মনে আনতে পারে, তাহলে সে বিশ্বাস করে না যে, চিন্তা স্বাধীন হতে পারে, এবং সব সময় তার দুষ্ট বাসনাকে প্রকাশ করতে ভয় পায়

২৫. যে সমস্ত বিশ্বাস চিন্তার শক্তিমত্তাকে এবং সাধারণভাবে সর্বপ্রাণবাদ চিন্তাকে মেনে নেয়, এমন সমস্তকেই মনে হয় 'ভৌতিক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যদিও আমাদের বিচারে একে অপাঙ্‌ক্তেয় করেছি।

পাছে তার বলার ফলে ঐ চিন্তাগুলি সফল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই মনোভাবের মাধ্যমে এবং তার জীবনে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এমন সব কুসংস্কারের মাধ্যমে সে যে সেই আদিম মানুষের, যে-মানুষ বিশ্বাস করে যে সে তার চিন্তার জোরেই বাহ্যিক জগৎকে বদলে দিতে পারে, তার কত কাছাকাছি রয়েছে তা প্রকাশ পায়।

এই নিউরোটিকদের প্রাথমিক অনুকর্ষী ক্রিয়াগুলি সত্যিই সর্বতোভাবে ম্যাজিক প্রকৃতির। যদি ম্যাজিক না হয়, অন্ততপক্ষে ম্যাজিকের বিপরীত ; যে-বিপদ দিয়ে উদ্‌বায়ু রোগের শুরু হয় সেই বিপদের আশঙ্কাকে দূরকরার জন্য সে বদ্ধপরিকর। আমি যখনই এই রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়েছি তখনই দেখেছি যে, এই আশঙ্কার বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃত্যু। শোপেনহাওয়ারের (Schopenhauer) মতে প্রত্যেক দর্শনের আদিতে আছে এই মৃত্যু সমস্যা। আমরা শুনেছি যে, আত্মার ধারণা এবং দৈত্য দানোয় বিশ্বাস, যা সর্বপ্রাণবাদের বৈশিষ্ট্য, এ-সবেরও মূল হচ্ছে মৃত্যু মানুষের উপর যে ছায়া ফেলে তাই। এই প্রাথমিক অবস্থায় অনুকর্ষী ও রক্ষাপ্রদ ক্রিয়াগুলি সাদৃশ্যতত্ত্ব না বৈসাদৃশ্যতত্ত্ব কোন্‌টা মেনে চলে তা সঠিকভাবে বলা খুব কঠিন, কেননা, উদ্‌বায়ুর বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ে খুবই সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর ক্রিয়ার উপর অভিক্রান্ত হয়ে সাধারণত তাদের বিকৃতি ঘটে।[২৬] ম্যাজিকের মন্ত্র-তন্ত্রের মধ্যে অনুকর্ষী উদ্‌বায়ুর রক্ষাপ্রদ সূত্রের একটি হুবহু মিল আছে। অনুকর্ষী ক্রিয়ার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যে দেখানো যেতে পারে কিভাবে এই ক্রিয়াগুলি অসদিচ্ছার বিরুদ্ধে মন্ত্রের মতো শুরু হয়। এগুলি কোনো প্রকারেরই যৌন ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। এগুলি নিষিদ্ধ যৌনক্রিয়া, যেগুলি তারা যথাসম্ভব বিশ্বস্ততার সঙ্গে নকল করে চলে তাদের বিনিময়ে একটি নিষ্পত্তিমাত্র।

আমরা যদি বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড সম্বন্ধে মানুষের ধারণার ক্রমোন্নতি, যা আগে উল্লিখিত হয়েছে এবং যে-ধারণা অনুযায়ী সর্বপ্রাণবাদের পরে ধর্মযুগ ও তারপরে বিজ্ঞানযুগের সৃষ্টি হয়েছে, তা গ্রহণ করি তাহলে এই সমস্ত যুগের মধ্যে চিন্তার সর্বশক্তিমত্তার অদৃষ্টে কী ঘটেছে তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হবে না। সর্বপ্রাণবাদের যুগে মানুষ সর্বশক্তিমত্তাকে নিজের শক্তি বলেই বুঝেছে ; ধর্মযুগে এই শক্তিকে সে দেবতাতে ন্যস্ত করেছে। কিন্তু একেবারেই সবটাই সে সমর্পণ করেনি। কারণ তার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনো না-কোনো উপায়ে দেবতাদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা সে নিজের হাতে রেখেছে। জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের যুগে মানুষের সর্বশক্তিমত্তা প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। সে তার ক্ষুদ্রতাকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং বশ্যতার মনোভাব নিয়ে সমস্ত প্রাকৃতিক প্রয়োজনের মতো মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করেছে। যাই হোক, মানুষের আত্মার শক্তির প্রতি আমাদের বিশ্বাস, যা বাস্তব জগতের নিয়মের সঙ্গেই তুলনীয় তারই মধ্যে চিন্তার সর্বশক্তিমত্তার প্রতি আদিম বিশ্বাসেরই এক-আধটু বেঁচে রয়েছে।

ব্যক্তির কামজ আবেগগুলির পরিণত অবস্থা থেকে পিছিয়ে শিশুকাল অবধি ক্রম-বিকাশের পুনরনুসন্ধান করে আমরা প্রথমে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করেছি।

২৬. সামান্য ক্রিয়ার উপর অভিক্রান্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কী তা নিম্নলিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

একথা আমি *Three Contributions to the Theory of Sex* নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছি। শিশু অবস্থাতেই কামজ আবেগের প্রকাশ লক্ষিত হয়েছে, তবে সেই সব আবেগ বহির্জগতের কোনো বস্তুতে প্রযুক্ত হয় না। কামজ আবেগের প্রত্যেকটি অঙ্গ আনন্দের অনুসন্ধানে ফেরে এবং এই আনন্দ নিজের শরীরের মধ্যেই পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। ক্রমোন্নতির এই প্রাথমিক অবস্থাকে বলে স্বতঃকাম (autoerotism) এবং বস্তু বরণের অবস্থা থেকে এটি পৃথক।

এ বিষয়ে আরো গবেষণার ফলে মনে হয়েছে যে, এই দুই অবস্থার মাঝে আরো একটি অবস্থা সন্নিবেশ করা বিশেষ প্রয়োজন এবং কার্যকরী। ইচ্ছা করলে প্রথম স্বতঃকাম অবস্থাকে দুইভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যতই অনুসরণ করা যাবে এই মধ্যবর্তী অবস্থার গুরুত্ব ততই বেড়ে যাবে। যৌন আবেগ, আগে যা পৃথক ছিল তা ইতিমধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পৃথক সত্তা পেয়েছে এবং বস্তু চয়ন করে নিয়েছে। কিন্তু এই চয়িত বস্তু বাইরের অপরিচিত কোনো বস্তু নয়, এটি তার নিজেরই অহম্ (ego)। এই অহমের সৃষ্টি এই সময়েই হয়। এই অবস্থার অস্বাভাবিক সংবর্ধন হেতু, পরে যা আমরা দেখতে পাব, এই নতুন মাধ্যমিক অবস্থাকে বলা হয় সকাম (narcissism) অবস্থা। এই ব্যক্তি এমন ব্যবহার করে যা দেখে মনে হয় সে নিজেকেই ভালবাসে। আমাদের বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এই অবস্থার অহম্-আবেগ (ego-impulse) ও কামজ-বাসনাকে (libidinous wish) আর পৃথক করা যায় না।

যদিও এই স্বকাম অবস্থার বিক্ষিপ্ত যৌন-আবেগগুলি একত্রিত হয়ে পৃথক সত্তা পেয়েছে এবং অহম্‌কে তার বস্তু বা পাত্র-হিসাবে চয়ন করেছে তবুও এই অবস্থাকে খুব নিখুঁতভাবে আলাদা করা যায় না। আমরা ধরে নিতে পারি যে এই স্বকাম-সংগঠনকে কোনো সময়েই আর সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা যাবে না। কিছুটা পরিমাণে মানুষ স্বকামী থেকেই যায়, এমনকি তার কামশক্তি বা লিবিডোর জন্য পাত্র নির্বাচন হয়ে যাবার পরও। এবং যে লিবিডো তার অহমের সঙ্গে জড়িত, তা যখন কোনো বস্তুতে প্রসারিত হয় তখন এই বস্তু বা পাত্রটি লিবিডোর প্রতিনিধির মতো, যেন প্রকাশনীর মতো কাজ করে। পরে এই প্রসারিত লিবিডোকে বস্তু থেকে আবার সঙ্কুচিত করে নেওয়া যেতে পারে। আত্মপ্রীতির তুলনায় মানুষের প্রেমে পড়ার অবস্থাটা মনো-বিজ্ঞানের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অবস্থাকে বাতুলতার এক স্বাভাবিক আদর্শ নমুনা হিসাবে ধরা চলে। এটি লিবিডো প্রসারণের এক চূড়ান্ত অবস্থা।

মানসিক ক্রিয়ার এরূপ উচ্চ ধারণা আদিবাসী ও নিউরোটিকদের মধ্যে দেখা যায়। আগে যা অত্যুক্তি মনে হয়েছে এখন তাকে স্বকামের সমগোত্রীয় বললে এবং স্বকামের একটি বিশেষ অংশ মনে করলে শোভন বলেই মনে হবে। আমরা বলব যে, আদি-বাসীদের চিন্তা খুব বেশি রকমের কামসিক্ত এবং চিন্তার সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসের কারণই হলো এই। পৃথিবীকে বশ করবার শক্তির অবিচলিত বিশ্বাসের পরিচয় এবং পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত স্থান কোথায় সে প্রশ্নের সহজ উত্তর সম্বন্ধে দুর্ভেদ্যতা সৃষ্টির মূলে রয়েছে ঐ একই কারণ। নিউরোটিকদের মধ্যে এই আদিম মনোবৃত্তির অনেকখানিই মনের স্বাভাবিক গঠনের অঙ্গ হিসাবে রয়েছে। কিন্তু ওদিকে আবার তাদের মধ্যে যৌনজাত অবদমনের ফলে তাদের চিন্তার ধারার মধ্যে এক নতুন যৌনতা

বোধের সৃষ্টি হয়েছে। আদি কামশক্তিপ্রসূত (libidinous) চিন্তাই হোক কিংবা প্রত্যাবৃত্তিজনিত (regression) চিন্তাই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক ফল একই ; অর্থাৎ প্রাজ্ঞীয় (intellectual) স্বকাম ও চিন্তার সর্বশক্তিমত্তা।[২৭]

অধুনা প্রমাণিত চিন্তার সর্বশক্তিমত্তাকে এখন যদি আমরা আদিম জাতিদের স্বকামের পরিচয় বলে ধরে নিই তাহলে বিশ্বের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা আছে তার সঙ্গে মানুষের লিবিডীয় ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলির তুলনা করতে পারব। দেখা যাচ্ছে যে, কাল এবং পাত্র বা বিষয়বস্তু উভয়দিক থেকেই সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে স্বকামের মিল রয়েছে। ধর্মীয় স্তরের সঙ্গে মিল রয়েছে বস্তু নির্বাচনের, যে-অবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাতাপিতার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া আবার বৈজ্ঞানিক স্তরের মানুষের ব্যক্তিগত পরিপক্কতা প্রাপ্তির অবস্থার অনুরূপমাত্র বলা চলে, যে-সময়ে মানুষ সুখ-সূত্র (pleasure principle) ত্যাগ করে এবং বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বস্তু নির্বাচন করে।[২৮]

আমাদের সভ্য জগতের কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে চিন্তার সর্বশক্তিমত্তা সংরক্ষিত হয়েছে, সেই ক্ষেত্রটি হচ্ছে কলাবিদ্যা। কেবলমাত্র কলাবিদ্যার ক্ষেত্রেই ব্যক্তি নিজের বাসনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন একটা কিছু সৃষ্টি করে যা তার এই বাসনাকে চরিতার্থ করে। তার এই ফলস্বরূপ যা সৃষ্টি হয় তা যেন সত্যিকারের বাস্তব জগতের জিনিস। শিল্পীর বিভ্রমকে ধন্যবাদ। এজন্য শিল্পীকে অনেক সময় যাদুকরের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়—তিনি যেন তুলির যাদুকর, এ-কথা খুবই সত্যি। তাছাড়া এমন তুলনা থেকে যা অর্থ প্রকাশ পায় তা ছাড়াও বিষয়টি আরো অর্থপূর্ণ। শিল্পকলা প্রথমে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র শিল্পসৃষ্টির জন্যই শুরু হয়নি। যেসব তাগিদ মেটাবার জন্য এর শুরু হয়েছিল আজ তার অধিকাংশই বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের সন্দেহ হয় এই সব তাগিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ম্যাজিক সৃষ্টি ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৯]

৪

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, জগৎ সম্বন্ধে মানুষ সর্বপ্রথম সর্বপ্রাণবাদের যে ধারণা করেছিল তার মূলে রয়েছে মনোবিদ্যা। এই ধারণা করতে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়নি,

---

২৭. এই বিষয়ের লেখকদের কাছে এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে, এক ধরনের 'solipsism' বা Berkleyanism মনে কাজ করে, (অধ্যাপক Sully বলেছেন, তিনি শিশুদের মধ্যে এইটি লক্ষ্য করেছেন) যার ফলে সে মৃত্যুকে সত্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। Marrett, Pre-animistc Religion ; Folklore, Vol. XI. 1900, Page 178.

২৮. আমরা এখানে কেবলমাত্র এইটুকু বলতে চাই যে, শিশুর প্রাথমিক স্বকাম তার পারত্রিক উন্নতির ব্যাপারে পক্ষে চূড়ান্ত এবং এটির সঙ্গে শিশুর অসহায় অবস্থার সম্পর্ক আছে। এইরূপ সেকেলে ধারণার কোনো যোগ নেই।

২৯ S. Reinach, L, Art of a Magic ; Cultes, Mythes et Religious-এর সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১২৫-৩৬। Reinach মনে করেন ফ্রান্সের গুহার মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের যেসব আঁচড় কাটা ছবি বা অঙ্কন দেখা যায় সেগুলি আনন্দের উদ্রেক করার জন্য শিল্পীরা আঁকেনি, ভেল্কি দেখানোর জন্য এঁকেছিল। এগুলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এগুলি গুহার গভীরতর প্রদেশে এবং অন্ধকারতম অংশে আঁকা হয়েছে এবং এদের মধ্যে ভয়ঙ্কর বা শিকারী জন্তুর ছবি নেই।

কেননা, বিজ্ঞানের সৃষ্টি তখনই হয়েছে যখন মানুষ বুঝতে পেরেছে, যে, সে জগতকে জানে না, অতএব জগতকে জানার উপায় তাকে বার করতে হবে। কিন্তু সর্বপ্রাণবাদ আদিম মানুষের কাছে ছিল খুব স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। সে জেনেছিল, কেমন করে জাগতিক জিনিস সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ নিজেকে বুঝেছে। অতএব আদিম মানুষ কেমন করে নিজের সত্তাকে বহির্জগতে আরোপ করেছে[৩০] তার খোঁজ এখন আমরা করতে পারব। অপরপক্ষে, আমরা এ-ও জানবার চেষ্টা করব সর্বপ্রাণবাদ বস্তুজগৎ সম্বন্ধে মানুষের মনে কিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছে।

ম্যাজিক হচ্ছে সর্বপ্রাণবাদের কৌশল-কলা (technique)। এই ম্যাজিক থেকে আমরা খুব স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে দেখতে পাই, কেমন করে মনোজগতের নিয়মগুলিকে জোর করে সেই সব পরিস্থিতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যেখানে প্রেতাদির কোনো সম্পর্কই নেই। এবং এইভাবে সাধারণ ব্যাপারকেও ম্যাজিকের বিষয়বস্তু করে তোলা হয়। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, সর্বপ্রাণবাদের মূল যে আত্মবাদ তার চেয়েও প্রাচীন হচ্ছে এই ম্যাজিক। আর. আর. ম্যারেট-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বপ্রাণবাদের আগেও একটি প্রাক্-সর্বপ্রাণবাদী অবস্থা আছে। এই পূর্ব অবস্থার প্রকৃতি যে কেমন তা নিসর্গভীতি (animatism সাধারণত প্রাণবন্তবাদ) এই নাম থেকেই পরিচয় পাওয়া যাবে। ম্যারেটের এই মতের সঙ্গে আমাদের মনঃসমীক্ষণের মত হুবহু মিলে যায়। এই সর্বপ্রাণবাদ-পূর্ব অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো ধারণা নেই বললেই চলে। কেননা, আত্মবাদের বাইরে কোনো মানব জাতিই এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।[৩১]

ম্যাজিক এখনও পর্যন্ত চিন্তা বা মনোভাবের সর্বশক্তিমত্তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করে চলেছে। এদিকে সর্বপ্রাণবাদ তার এই শক্তির কিছুটা আত্মার স্বার্থে ত্যাগ করেছে, এবং এইভাবেই ধর্মের পথ প্রস্তুত হয়েছে। আদিম মানবের সর্বপ্রথম এই স্বার্থত্যাগ কী করে সম্ভব হলো ? তার অনুমানের ভুলের প্রতি অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যে এমন সম্ভব হয়েছে তা নিশ্চয়ই নয়, কেননা আদিম মানব তখনও ম্যাজিকের কলা-কৌশল অনুসরণ করে চলেছে।

অন্যত্র আমি দেখিয়েছি যে, ভূত-প্রেত বা দেব-দানব আদিম মানবমনের আবেগ-গুলির অভিক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩২] প্রথমে সে তার নিজের আধান (affect)-এ ও বস্তুতেও নরত্বারোপ (Personification) করছে। এইভাবে সারা পৃথিবীকে সে নরসমাকীর্ণ করেছে। তারপর আবার সে নিজে তার অন্তর্নিহিত মানসিক ক্রিয়াগুলিকে পুনরাবিষ্কার করেছে। এ ঠিক সেই সব ভ্রমবাতুলতা (paranoia) আক্রান্ত রোগী Sehrber-এর মতো, যে তার আবিষ্কৃত 'ঈশ্বর-রশ্মি'র (God rays)

---

৩০. ইহার বোধ তথাকথিত আন্তর্মানসিক (endopsychic) অনুভূতির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৩১. R, R. Marrett. Per-animistic Religion in Folklore. Vol. XI. No. 2. 1900, comp. Wundt. Myth and Religion, Vol. II. p. 171.

৩২. আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই প্রাথমিক স্বকামীয় স্তরে লিবিডোর অনুভূতি ও উত্তেজনা ও অন্যান্য উৎসগুলি খুব সম্ভবত তখনো এমনভাবে পরস্পর মিশ্রিত থাকে যে তাদের পৃথক করা সম্ভব নয়।

প্রতিফলনের মধ্যে তার নিজের লিবিডোর সংবন্ধন (fixation) ও বিভাজন (detachment) দেখতে পেত।[৩৩]

আগের মতোই[৩৪] এখানেও কেন মানসিক ক্রিয়াগুলি বহির্জগতে অভিক্ষেপ করার ইচ্ছা হয় সে সমস্যাটি এখানেও তুলতে চাই না। তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, যেসব ক্ষেত্রে অভিক্ষেপের ফলে মানসিক চাপের উপশম হয় সেই সব ক্ষেত্রে অভিক্ষেপ বেশি হয়ে থাকে। একথা নিশ্চয় করেই বলা যায় যে, এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব তখনই হয় যখন একসঙ্গে কয়েকটি মানসাবেগ সর্বশক্তিমত্তা অর্জন করার চেষ্টার ফলে পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়; কারণ এ অবস্থায় সবগুলি আবেগই সর্বশক্তিমান হতে পারে না। প্যারানোইয়া বা ভ্রমবাতুল ব্যাধিগ্রস্তেরা ঠিক এই কারণেই তাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার জন্য এই মানসিক ক্রিয়াকে কাজে লাগায়। যাই হোক, দেখা যায় যে কোনো বৈষম্যের দুইটি অংশের মধ্যে একটি আদর্শ দ্বন্দ্বের ফল হচ্ছে উভয়বলি ভাব। এ বিষয় আমরা পূর্বে স্বজনবিধুরার শোকালাপের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এই ধরনের ঘটনা অভিক্ষেপের মনোভাব তৈরির পক্ষে খুব উপযোগী বলে আমাদের মনে হয়। এই প্রসঙ্গে অনেক গ্রন্থকার বলেছেন যে, প্রেতাত্মাদের মধ্যে যেগুলি দুষ্টাত্মা সেইগুলি জন্মেছে সর্বপ্রথম এবং মৃত জীবিত লোকদের মনে যে ছাপ ফেলে যায় তার উপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আত্মার কল্পনা। এই ব্যাপারে আমরাও গ্রন্থকারদের সঙ্গে একমত। তবে তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের যেটুকু পার্থক্য তা এই যে, এঁদের মতো আমরা জীবন্তের উপর মৃত্যু যে ছায়া ফেলে যায় সেই বিষয়টিকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিষয় হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চাই না। তার পরিবর্তে যে-শক্তি ভাবের দ্বন্দ্বে আলোড়ন তুলেছে তাকে সমস্ত মানুষের শোক-সমুদ্রের প্রধান শক্তি বলে গণ্য করতে চাই।

মানুষের সর্বপ্রথম তাত্ত্বিক কৃতকার্য, অর্থাৎ তার সৃষ্ট আত্মা এবং যে নৈতিক নিষেধ-গণ্ডির দ্বারা সে স্বয়ং আবদ্ধ, অর্থাৎ টাবু নিষেধাবলি, এদুয়ের উৎস একই। কিন্তু উৎসমূল এক বলেই যে এদের উৎপত্তি একই সঙ্গে হয়েছে সে-কথা ধরে নেওয়া উচিত হবে না। মৃত্যুকে দিয়ে জীবিতকে যদি সত্যিই কখনও এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়ে থাকে, যা আদিম মানবের আদি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ও যেজন্য তাকে আত্মার সর্বশক্তিমত্তার প্রতি বিশ্বাসের খানিকটা ত্যাগ করতে হয়েছিল তাহলে বলতে হয় যে এসব সাংস্কৃতিক সৃষ্টিই তার অক্ষমতার (impotence) প্রথম পরিচয় এবং এটা মানুষের স্বকামিতার বিরোধী। মৃত্যুর অমোঘ শক্তিকে আদি মানব যেভাবে অস্বীকার করে বলে মনে হয়, ঠিক সেইভাবেই আবার মৃত্যুর কাছেসে নতি স্বীকারও করে।

আমাদের অনুমানকে যদি আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার সাহস আমাদের থাকে তাহলে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি যে, আত্মার ভূত-প্রেতের অভিক্ষেপণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে

---

৩৩. Schreber, Denkwurdiykeiten eines Nervenkranken, 1903-Freud, Psychoanalytic observations concerning an autobiographically described case of Paranoia, Jahrbuch fur Psychoanalyt. Forsch Vol. III, 1911.

৩৪. Schreber, page 59.

আমাদের মানসিক সংগঠনের কোন্ অত্যাবশ্যকীয় অংশটি এর মধ্যে প্রতিফলিত ও পুনর্বিবেচিত হচ্ছে। আত্মা সম্বন্ধে আদিম ধারণা পরবর্তী অবস্থা থেকে বহুদূরে সরে গেছে এবং সম্পূর্ণরূপেই এটা বস্তুহীন ; তা সত্ত্বেও এর প্রকৃতি দ্বিধাবিভক্ত। যার ফলে মানুষ বা বস্তু দ্বিত্ব হিসাবে প্রতীত হচ্ছে। এই দুই উপাদানের উপর সমষ্টির পরিচিত গুণাবলি ও পরিবর্তনগুলি ভাগাভাগি হয়ে রয়েছে—এই মত সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। এই 'দ্বিত্ব' শব্দটি হার্বার্ট স্পেন্সার থেকে গ্রহণ করেছি।[৩৫] এটা দ্বৈতবাদের সঙ্গে অভিন্নই রয়েছে, যে দ্বৈতবাদ আমাদের চিরাচরিত নিয়মানুসারে আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং যার অক্ষর-রূপী ভাষাতাত্ত্বিক প্রকাশকে আমরা স্বীকার করি। যেমন, যে-ব্যক্তি মূর্ছা যায় বা প্রলাপ বকে তাকে আমরা বলি 'ভরপ্রাপ্ত' বা 'ভূতে পেয়েছে'।[৩৬]

আমরা বহির্জগতে আদিম মানুষের মতোই যা অভিক্ষেপ করে থাকি তা একটি মানসিক অবস্থার স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে অবস্থার মধ্যে বস্তুটি সংজ্ঞান জীবনে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে বর্তমান, এবং যার পরে আরও একটি মানসিক অবস্থা হয়েছে, যেখানে বস্তুটি 'সুপ্ত' কিন্তু তার পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে, অর্থাৎ স্মৃতি ও প্রত্যক্ষণের সহাবস্থান। কিংবা সাধারণভাবে বলা যায়, সজ্ঞান মনের পিছনে অজ্ঞাত মানসিক প্রক্রিয়ার অবস্থান।[৩৭] বলা যেতে পারে যে, বিশ্লেষণের অন্তিম অবস্থার মানুষ বা বস্তুর আত্মা হচ্ছে, যখন কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সংজ্ঞান প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে থাকে না তখন তাকে স্মরণ করা বা বিচিত্রিত করার শক্তি।

যাই হোক, আত্মা সম্বন্ধে আদিম কিংবা চলতি ধারণা থেকে আমাদের এমন আশা করা উচিত নয় যে, অন্যান্য অংশ থেকে এর সীমারেখা ততটা স্পষ্ট হবে যতটা নাকি আজকের বিজ্ঞান সংজ্ঞাত ও অজ্ঞাত মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে স্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছে। অপরপক্ষে কিন্তু সর্বপ্রাণবাদী আত্মা উভয় দিকের উপাদানগুলিকে সংযুক্ত করে এর চঞ্চলতা এবং গতিশীলতা, দেহ থেকে পলায়ন প্রবৃত্তি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অন্য দেহে আশ্রয় গ্রহণ, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই সংজ্ঞানের প্রকৃতিতেই নির্ভুলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ব্যক্তির মানবমূর্তির অন্তরালে এটার আত্মগোপনের পদ্ধতি আমাদের নির্জ্ঞান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকে আর আমরা এর অপরিবর্তনশীলতা ও অবিনশ্বরতার জন্য সংজ্ঞান ক্রিয়াকে দায়ী করি না, করি অজ্ঞাত মানসিক ক্রিয়াকেই এবং এদেরকেই মানসিক ক্রিয়ার আসল প্রতিভূ মনে করি।

সর্বপ্রাণবাদ একটি চিন্তাধারা, এটি পৃথিবীর সর্বপ্রথম একটি সম্পূর্ণতত্ত্ব—এ কথা আমরা আগেই বলেছি। এখন আমরা এমনই একটি পদ্ধতির মনঃসমীক্ষণীয় ব্যাখ্যার সাহায্যে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাই। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা

---

৩৫. Principles of Sociology, Vol. I.

৩৬. l.c., p. 179.

৩৭. Society for Psychical Research, Part LXVI. Vol. XXVI, 9112-কার্য বিবরণী প্রকাশিত আমার ছোট একটি প্রবন্ধ : A note on the Unconscious in Psycho-analysis, দ্রষ্টব্য।

থেকে এরকম 'পদ্ধতির' প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় সর্বদাই পাই। রাত্রে আমরা স্বপ্ন দেখি, দিনের বেলায় সেই স্বপ্নের বিশ্লেষণ কী করে করতে হয় তা আমরা জেনেছি। স্বপ্ন তার স্বভাবের বিরুদ্ধে না গিয়েও বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্নরূপে দেখা দিতে পারে। আবার মনে অভিজ্ঞতার যে ছাপ পড়ে স্বপ্ন তার নিয়মকেও অনুসরণ করতে পারে, একটা ঘটনা থেকে অন্য ঘটনার সূত্র বার করতে পারে, এবং এক অংশের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্য অংশের বিষয়বস্তুর যোগসূত্রের নির্দেশ করতে পারে। স্বপ্নের অল্পবিস্তর সার্থকতা এখানেই ; কিন্তু এটা ততদূর সার্থক কখনও হতে পারে না যাতে স্বপ্নের মধ্যে কোথাও অসংগতি বা ফাঁক না থাকে। আমরা যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে চাই তো দেখব যে, স্বপ্নের উপাদানের এই অস্থায় এবং সামঞ্জস্যহীন বিন্যাস স্বপ্নকে বোনার জন্য আমাদের বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। স্বপ্নের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে স্বপ্ন-চিন্তা, যা একান্তই অর্থবোধক এবং সুসংবদ্ধ হওয়া চাই। কিন্তু এই স্বপ্ন-চিন্তার ধারা স্বপ্নের বক্তাধেয় বা প্রথম প্রকাশ্য উপাদান যা আমাদের স্মরণে থাকে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বপ্ন-চিন্তার যে সংবদ্ধতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যেতে পারে, কিংবা স্বপ্নবস্তুর নতুন সংগতির দ্বারা স্থানপূরণ করা যেতে পারে। এছাড়া সেখানে স্বপ্নবস্তুর সংক্ষেপণ প্রায় নিয়মিতভাবেই ঐ একই জিনিসের পুনর্বিন্যাস, কিন্তু অল্পবিস্তরভাবে পূর্বধারা থেকে স্বাধীন। আমরা উপসংহার করে বলতে পারি যে, স্বপ্ন-চিন্তা থেকে যেসব স্বপ্ন ক্রিয়া হয়েছে সেগুলি একটি নতুন প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যাকে বলা হয় 'গৌণ অনুযোজনা'। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন 'অর্থের' সন্ধানে স্বপ্নক্রিয়া ঘটিত অসংবদ্ধতা ও দুর্বোধ্যতা দূর করা। গৌণ অনুযোজনার সাহায্যে এই যে নতুন অর্থ পাওয়া যায় সেটাতে কিন্তু আর স্বপ্ন-চিন্তার অর্থ থাকে না।

কোনো রীতি বা তন্ত্রের প্রকৃতি এবং যোগ্যতা বিচারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বপ্নক্রিয়াপ্রসূত এই গৌণ অনুযোজনা। আমরা যা অনুভব করি এবং চিন্তা করি আমাদের বিচারবুদ্ধি সেইগুলিকে সংযোজন, সংবন্ধন এবং সংগঠন করতে চায়, এমনকি যদি বিশেষ কোনো অবস্থায় ঠিক জিনিসটিকে ধরতে না পারে তাহলে একটা ভুল যোগাযোগ স্থাপনেও ইতস্তত করে না। স্বপ্ন থেকেই যে শুধু এরকম রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, আতংক, অনুকর্ষী চিন্তা এবং বিভিন্ন ভ্রান্তি থেকেও এর পরিচয় মেলে। এই রীতির উদ্ভব সবচেয়ে বেশি বৈচিত্রপূর্ণ হয় ভ্রমবাতুল (paranoia) অবস্থায় এবং এটা রোগচিকিৎসার ক্ষেত্রকে খুব প্রভাবিত করে। কিন্তু তাই বলে অন্য ধরনের বায়ুরোগের ক্ষেত্রে থাকে না তেমন মনে করা উচিত নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে মানসিক উপাদানের পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ সাংঘাতিক ধরনের ঘটে তা-ও আমরা দেখতে পাব যদি নাকি সিস্টেম বা রীতির দিক থেকে তা আমাদের বোধগম্য মনে হয়। কোনো সিস্টেম বা রীতি সৃষ্টি হয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেতে হলে আমাদের দেখতে হবে এর প্রত্যেকটি ফলাফলের মধ্যে অন্ততপক্ষে দুটি প্রেষণা শক্তি আছে কিনা। একটি প্রেষণা শক্তি হবে ঐ সিস্টেমের অনুমান থেকে উদ্ভূত, অতএব শেষ পর্যন্ত ভ্রান্তিমূলক এবং অন্যটি লুক্কায়িত, যেটাকে আমরা অবশ্যই আসল বলে এবং প্রেষণা সৃষ্টির পক্ষে কার্যকর বলে ধরব।

উদ্‌বায়ু থেকে একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। টাবু পরিচ্ছেদে আমি একটি রোগীর কথা উল্লেখ করেছিলাম যার অনুকর্ষী নিষেধগুলি মাওরিদের টাবুর খুব সুস্পষ্টভাবে অনুরূপ। এই স্ত্রীলোকটির উদ্‌বায়ু(neurosis) তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত নিজ্ঞান মনে স্বামীর মৃত্যুকামনার বিরুদ্ধে দারোয়ানীতে নিযুক্ত হয়েছিল; কিন্তু তার বাঁধাধরা নিয়মমাফিক ভীতির যেটুকু বাইরে প্রকাশ পেয়েছে সেখানে মৃত্যুকে খুব সাধারণভাবে দেখিয়েছে, যাতে তার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে উহ্য থেকে গেছে এবং সজ্ঞান মনে কখনও উৎকণ্ঠার উদ্রেক করেনি। একদিন সে শুনল তার স্বামী কাউকে হুকুম করেছে তাঁর ক্ষুরখানা কোনো এক দোকান থেকে শান দিয়ে আনবার জন্য। তখন অদ্ভুত রকমের এক অস্থিরতা বোধ করল সেই মহিলা। সে নিজেই ঐ দোকান অভিমুখে যাত্রা করল এবং দোকানটি তদারক করে ফিরে আসার পর সে তার স্বামীকে ঐ ক্ষুরটি আর কখনও ব্যবহার করার জন্য নিষেধ করল, কারণ সে তার স্বামী-বর্ণিত দোকানটির পাশের দোকানটি যে শবাধার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সরঞ্জামের একটি গুদাম ঘর তা-ও দেখে এসেছে। মহিলার অভিযোগ হচ্ছে ক্ষুরটির সঙ্গে মৃত্যুর চিরসম্পর্ক স্থাপন করাই ছিল তাঁর স্বামীর অভিপ্রায়। এইটিই তাহলে হচ্ছে নিষিদ্ধ কারণের বিধিমত প্রেরণা। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে উক্ত মহিলা রোগীটি যদি কাছাকাছি কোথাও ঐরূপ গুদাম ঘরের সন্ধান না-ও পেত তাহলেও সে ক্ষুরটির সঙ্গে মৃত্যুর নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন করত, তার দোকানে যাবার পথে যদি একটি শবাধার বহনকারী গাড়ি, কিংবা কোনো শোকচিহ্ন ধারণকারী ব্যক্তি বা ফুলের মালা বহনকারী কোনো মানুষকে সে দেখত তাহলে সেইটাই তার কাছে ঐরূপ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যথেষ্ট মনে হোত। যেমন করেই হোক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সংকল্পের জাল অনেকদূর পর্যন্তই বিস্তৃত হয়েছিল, এখন কেবলমাত্র অপেক্ষায় ছিল সে জাল সে টেনে তুলবে কি তুলবে না। অন্য কোনো ক্ষেত্রে সে যে এরূপ সংকল্পকে কাজে লাগায়নি তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে হয়ত সে বলবে যে, তখন তার 'সুদিন' ছিল তাই। ক্ষুরটিকে নিষিদ্ধকরণের আসল উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্য আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তা হচ্ছে, তার স্বামী ধারাল ক্ষুর দিয়ে নিজের গলাটা কেটে ফেলতে পারে, এরূপ ধারণা-জনিত আনন্দানুভূতির আধিক্যের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক।

যদি লক্ষণটি একবার অজ্ঞাত ইচ্ছার মুখপাত্র হয়ে উঠতে পারে এবং এর বিরুদ্ধে পাহারা বসাতে পারে তাহলে প্রায় একই প্রকারে ক্রিয়াজ বাধ বা ক্রিয়াশক্তির রোধ, স্বাভাবিকভাবে গমনাগমনে অক্ষমতা, কিংবা মুক্তস্থানের ভয় প্রভৃতি লক্ষণগুলি এক একটি করে নিখুঁত রূপ নিতে থাকে। এই লক্ষণের বহিঃপ্রকাশের দ্বার একবার উন্মুক্ত হলে তখন রোগীর নিজ্ঞান মনের আর সমস্ত অবাস্তব কল্পনা এবং বাস্তব পূর্ব-স্মৃতিগুলি এই ছিদ্রপথে লক্ষণের রূপ নিয়ে বেরোবার চেষ্টা করে এবং চলচ্ছক্তির অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে সুবিধামত তাদের নতুনভাবে সাজিয়ে ফেলে। অতএব কোনো বিষয়ের, ধরা যাক খোলা মাঠের আতঙ্ক, আদি প্রকল্পের ভিত্তিতে তার আক্ষরিক সংগঠন এবং তার খুঁটিনাটি বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করাটা নেহাত পণ্ডশ্রম ও খুব বোকামির কাজ হবে। কেননা, যাবতীয় যুক্তি এবং যোগাযোগের কড়াকড়ি সবই

অন্তঃসারহীন। আরও খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে, স্বপ্নের মুখবন্ধ সংগঠনের মতো দেখা যাবে যে, লক্ষণ সংগঠনের মধ্যেও যথেষ্ট অসংগতি এবং খেয়ালীপনা রয়েছে। এরূপ সুসংগঠিত ভীতির ছোটখাট বিষয়গুলি তাদের সত্যিকারের প্রেষণা পায় কতকগুলি লুকানো উপাদান থেকে যাদের সঙ্গে চলনভঙ্গির বাধা-নিষেধের কোনো সম্পর্কই নেই। এবং এই কারণেই এরূপ ভীতির প্রকৃতি বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এতো বিপরীত এবং রকমারি।

এখন যদি আমরা সর্বপ্রাণবাদের পুনর্বিচার করার চেষ্টা করি, এবং সেইটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহলে মনোবিদ্যার অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে আমাদের পরিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বলতে পারি যে, এরূপ কোনো রীতি বা প্রথা-ই যে একমাত্র প্রেষণা হবে তা নয়; এমনকি আদিম জাতিদের ক্ষেত্রেও না। অতএব অদৃশ্য কোনও প্রেষণার অনুসন্ধানের দায়িত্ব আমাদের থেকেই যায়। সর্বপ্রাণবাদের প্রভাবাধীনে প্রত্যেক নিয়ম বা ক্রিয়া, যাকে আমরা 'কুসংস্কার' বলি, তার একটা ভিন্ন প্রেষণা থাকতেই হবে। কিন্তু 'কুসংস্কার' ও 'দুশ্চিন্তা', 'স্বপ্ন' ও 'দৈত্য-দানবে'র মতো মনোবিদ্যার প্রাথমিক উপাদানের মধ্যে একটি, এটা মনঃসমীক্ষণের দ্বারা চূড়ান্তভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এইসব সংগঠন, যা পর্দার মতো অর্থবোধের প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে তাদের অন্তরালে যদি যেতে পারি তাহলে বুঝতে পারব যে, বর্বরজাতিদের মানসিক জীবন এবং সভ্যতার মান অদ্যাবধি তার প্রাপ্য মর্যাদার খুব কমই পেয়েছে। আবেগের অবদমনকে যদি সভ্যতার মানদণ্ড বলে আমরা মনে করি তাহলে আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, সর্বপ্রাণবাদের মধ্যেও উন্নতি এবং ক্রমবিকাশ ঘটেছে; তবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রেষণার জন্য অন্যায়ভাবে আমরা তাদের উপযুক্ত মূল্য দিইনি। আমরা শুনি যে, বর্বরজাতীয় যোদ্ধারা যখনই যুদ্ধপথে[৩৮] বাহির হয় তখনই তারা নিজেদের উপর শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বআরোপ করে। তার সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে যে তারা তাদের ময়লা এমনভাবে ত্যাগ করে যাতে কোনো শত্রু তাদের শরীরের এই অংশের উপর ভর করে যাদুর দ্বারা কোনো অনিষ্টসাধন করতে না পারে। এবং এছাড়া তাদের সংযমের জন্য আমরা অনুরূপ কুসংস্কারীয় প্রেষণার কথা আন্দাজ করে নিতে পারি। যাই হোক, আসল কথাটা হচ্ছে আবেগকে ত্যাগ করতে হচ্ছে এবং আমরা যদি ধরে নিই যে, বর্বর যোদ্ধা ক্ষতিপূরণ হিসাবে বাধা-নিষেধগুলি তার নিজের প্রতি করছে তাহলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। ক্ষতিপূরণ বলা হচ্ছে, কারণ যেসব নিষ্ঠুর এবং আক্রমণাত্মক আবেগ তার কাছে নিষিদ্ধ ছিল এখন সেইগুলিকে পরিতৃপ্ত হতে দেবার অনুমতি দিতে চলেছে। যখন সে কঠিন এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজে অভিনিবিষ্ট থাকে সেই সময়কার বহু যৌন সংযমের বেলাতেও এই একই কথা খাটে।[৩৯] এমনকি যদি এই সব নিষেধের মূল কারণের সঙ্গে যাদুর বা ম্যাজিকের কোনো সম্বন্ধ থেকে থাকে তথাপি বাসনার ভোগসুখের পরিত্যাগের দ্বারা যে অধিকতর শক্তি লাভ করা যায় এই মূল ধারণাটি থেকেই যায়। নিষিদ্ধতার যাদু-যুক্তাভ্যাস (magic

৩৮. Frazer—Taboo and the Perils of the soul, p. 158.

৩৯. Frazer—l,c., p. 200,

rationalisation) ছাড়াও এর স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দিকটাও উপেক্ষা করা উচিত নয়। বর্বরজাতির পুরুষরা যখন শিকার করতে, মাছ ধরতে, যুদ্ধ করতে কিংবা মূল্যবান গাছ সংগ্রহে বাহির হয় সেই সময়ে স্ত্রীলোকেরা বাড়িতে বহু কষ্টকর নিষেধ পালন করতে থাকে। তাদের বিশ্বাস স্ত্রীলোকেদের এই কর্তব্যগুলি বহুদূরে পুরুষদের অভিযানকে কৃতকার্য করতে প্রভাবিত করে। এইটুকু আন্দাজ করতে আর বেশি বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয় না যে, দূরে যে-শক্তিটি কাজ করছে তা বাড়ির জন্য চিন্তা এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিটির প্রতি অদম্য বাসনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং পুরুষেরা তখনই তাদের কাজ সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারবে যখন তাদের অধীনস্থ স্ত্রীলোকদের অবস্থিতি সম্বন্ধে তারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারবে। এইসব মৌলিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিজ্ঞানকে নানা ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন করে রাখে। অন্যান্য সময়ে ম্যাজিক-প্রেষণা ছাড়াই চিন্তাটি সোজাসুজি প্রকাশ পায়, স্ত্রীর বিবাহিত জীবনে বিশ্বস্ততার অভাবই অনুপস্থিত স্বামীর চেষ্টার ব্যর্থতা আনে।

বর্বরজাতিদের স্ত্রীলোকেরা রজঃস্বলাকালীন যেসব অগণিত বাধা-নিষেধ পালন করে সেগুলি রক্ত সম্বন্ধে ভয়ের কুসংস্কারের সঙ্গে জড়িত, এরূপ ধারণা যে সত্যি হতে পারে তার সপক্ষে যথেষ্টযুক্তি আছে। সৌন্দর্যবোধও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সব সময় ম্যাজিক প্রেষণার দ্বারা প্রভাবিত হলেও রক্তভয়ও এইসব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সহায়ক সে সত্য উপেক্ষা করা ভুল হবে।

এরূপ ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ভুল বুঝবেন না এবং এই বলে দোষী করবেন না যে আমরা সমসাময়িক আদিম জাতিদের মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে খুব অসম্ভব রকমের কোনো গুণারোপ করছি।

আমার মনে হয়, আদিম জাতিরা, যারা সর্বপ্রাণবাদের স্তরে রয়ে গেছে, তাদের মনোবিদ্যার ব্যাপারে সহজেই আমরা সেই ভুল করতে পারি যা আমরা শিশুদের মানসিক জীবনের হদিস করতে গিয়ে করে থাকি। পূর্ণবয়স্ক আমরা, তাই শিশুর মানসিক জীবন ভালো বুঝি না, এবং তার গুরুত্ব ও অনুভূতির সূক্ষ্মতাকে তাই আমরা যথাযোগ্য মূল্য দিই না।

এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি এমন কতকগুলি টাবু-নিয়মের কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। কারণ এইগুলির যা ব্যাখ্যা হতে পারে সে সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষক সুপরিচিত আছেন। বহু বর্বর জাতির মধ্যে কয়েকটি অবস্থাতে বাড়ির মধ্যে কোনো ধারাল অস্ত্র বা ছেদনযন্ত্র রাখা নিষেধ।[৪০] ফ্রেজার সাহেব একটি জার্মান কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, কোনো ছুরির ধারাল দিকটা উপরের দিকে করে রাখা নিষিদ্ধ; কারণ এমনভাবে রাখলে ভগবান এবং দেবদূতরা আহত হতে পারেন। এরূপ টাবুর মধ্যে কি পাছে অজ্ঞাত দুষ্ট আবেগের বশে ঐ ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করা হয় এমন 'পাক্ষনিক ক্রিয়া'র অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি না?[৪১]

---

৪০. Frazer—l.c., p. 237.

৪১. The Psychopathology of Everyday life—(S. Freud) দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

টোটেমবাদের অপোগণ্ডীয় পুনরাবৃত্তি

যে মনঃসমীক্ষণ প্রথমে মনের গঠন ও মানসিক ক্রিয়ার নিয়মিত অতি-নিয়তির (overdetermination) কথা প্রকাশ করছে সেই মনঃসমীক্ষণই যে একটিমাত্র উৎস ধরে ধর্মের মতো এত জটিল বিষয় থেকে একটা কিছু অর্থ আবিষ্কার করবে, পাঠকের সেরূপ আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই। তবে এই (মানসিক) প্রতিষ্ঠানটির উৎসগুলির মধ্যে একটির পরিচয় লাভের জন্য যদি মনঃসমীক্ষণ নেহাত প্রয়োজনবশে কোনো অর্থ আবিষ্কার করে বা করতে বাধ্য হয়, তাহলে সেই উৎসটি যে অন্যান্য সহধর্মী কারণগুলি থেকে নিরপেক্ষ হবে, বা সেইটিকে সর্বোত্তম কারণ বলে মনঃসমীক্ষণ দাবি করবেই, সেকথা বলা যায় না। যে মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের আলোচ্য বিষয় তার প্রতি (অন্যান্য বিষয়ের তুলনায়) ধর্মের উৎপত্তির গুরুত্ব কতটা তা বিভিন্ন গবেষণা ক্ষেত্রের সংশ্লেষণই ঠিক করে দেবে। কিন্তু এমন দুরূহ কাজ মনঃসমীক্ষকের সামর্থ্যের বাইরে এবং এ কাজ করার অভিপ্রায় তার নেই।

১

এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আমরা টোটেমবাদের ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমরা শুনেছি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি আদিম জাতির মধ্যে টোটেমবাদ এমন একটি পদ্ধতি যা ধর্মের স্থান অধিকার করতে পারে এবং এটাই হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি। আমরা জানি, ১৮৬৯ সালে স্কচম্যান ম্যাকলেন্নান্ (Scothman Mac Lennan) টোটেমবাদের ঘটনাবলির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তখন থেকে সেটাকে একটা কৌতূহলের বিষয় হিসাবেই দেখা হয়েছে। তাঁর অনুমান অনুযায়ী বিভিন্ন পুরাতন এবং নূতন সমাজের মধ্যে বহু আচার ও চলিত প্রথাকে টোটেমযুগের ভগ্নাবশেষ বলেই ধরা উচিত। সেই থেকে বিজ্ঞান টোটেমবাদের এই অন্তর্নিহিত অর্থকে পুরোপুরি মেনে নিয়েছে। ভ্রুঃ ভুণ্ড্ (W. Wundt)-এর *Elements of Psychology of Races* (1912) নামক পুস্তক থেকে উক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি,[১] 'এই সবকিছু একত্র করলে বিশেষ করে যা খুবই সম্ভব বলে মনে হয় তা হচ্ছে, প্রত্যেক পরবর্তী বিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় এবং দেবতা ও বীরদের যুগ থেকে আদিমানব অবস্থায় ক্রমবিকাশের মধ্যমবর্তী কালে এই টোটেম কৃষ্টিই বর্তমান ছিল।'

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে টোটেমবাদের প্রকৃতির আরো গভীরে প্রবেশ করা দরকার। আমি এখানে এস. রেইনাক-এর (S. Reinach) একটি খসড়ার

১. ১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(sketch) উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। এমন করার কারণটা পরে জানা যাবে। ইনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বারটি প্রবন্ধের মাধ্যমে টোটেমীয় ধর্মের প্রশ্নোত্তরমালার অনুরূপ নিম্নলিখিত খসড়াটি—টোটেমবাদের সংহিতা (code du Totemisme) লিপিবদ্ধ করেছিলেন[২] :

১. কতকগুলি প্রাণী বধ করা বা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু লোকে এই জাতীয় প্রাণী পালন করে এবং তাদের যত্ন নেয়।

২. যদি কোনো জন্তুর হঠাৎ মৃত্যু হয় তাহলে তার জন্য বিলাপ করা হয় এবং আদিম মনুষ্যজাতির একজন মানুষের মতোই সম্মান সহকারে তার কবর দেওয়া হয়।

৩. ভক্ষণ সম্বন্ধে যে নিষেধ আছে তা কেবল জন্তুটির কোনো কোনো অংশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

৪. যেসব জন্তুকে সাধারণত হত্যা করা হয় না এমন জন্তুকে যদি প্রয়োজনের খাতিরে হত্যা করতে হয় তাহলে কোনো-না-কোনো অজুহাত দেখিয়ে তা করা হয় এবং টাবু-নিষেধ ভঙ্গের অপরাধ লঘু করার চেষ্টা করা হয় : যেমন নানাবিধ ছল-চাতুরির সাহায্যে হত্যা করা হয়।

৫. যদি কোনো ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে হত্যা করা হয় তাহলে ভক্তিভরে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

৬. ধর্মীয় উৎসবের মতো বিশেষ বিশেষ পবিত্র কার্যোপলক্ষে কোনো কোনো পশুর চর্ম পরিধান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেখানে আজও টোটেমবাদ বর্তমান সেখানে এরাই হবে টোটেম পশু।

৭. টোটেম পশুদের নামেই জাতি বা ব্যক্তিবর্গের নাম রাখা হয়।

৮. অনেক আদিম জাতি পশুদের ছবি সামরিক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করে। পুরুষরা তাদের শরীরে পশুর ছবি রক্তাঙ্কিত করে বা উল্কি করে দেয়।

৯. টোটেম যদি ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক প্রাণী হয় তাহলে ঐ প্রাণীর নামে যে মনুষ্যদল পরিচিত তারা ঐ প্রাণী হত্যা করবে না।

১০ টোটেম প্রাণী নিজ টোটেম দলকে রক্ষা করবে এবং সেই টোটেম দলকে সাবধান করে দেবে।

১১. যারা তাদের টোটেম প্রাণীর প্রতি অনুরক্ত তাদের ভবিষ্যৎ টোটেম বলে দেয় এবং তাদের নেতৃত্ব করে।

১২. টোটেম জাতির লোকদের প্রায়ই বিশ্বাস করতে দেখা যায় যে তারা এবং টোটেম পশু একই বংশোদ্ভূত।

টোটেম ধর্ম সম্বন্ধে এই প্রশ্নোত্তরমালার মূল্য আরো ভালভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা মনে রাখি যে, এখানে রেইনাক সাহেব সেইসব লক্ষণ ও সূত্রগুলিরও সন্নিবেশ করেছেন যা থেকে প্রমাণ হয় যে, একদিন টোটেম প্রথা প্রচলিত ছিল। টোটেমবাদের অত্যাবশ্যকীয় প্রলক্ষণগুলিকে কতকটা উপেক্ষা করার জন্য এবং সমস্যার প্রতি

---

২. Reveu Scientiffique, October 1900 reprinted in the four volume work of the author, Cultes Mythes et Religions, 1908, Tome I, p. 17.

গ্রন্থকারের অদ্ভুত প্রতিন্যাসের বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে, এবং আমরা পরে দেখতে পাব যে, টোটেমবাদ সম্বন্ধীয় দুটি মতের মধ্যে তিনি একটিকে পিছনে হঠিয়ে দিয়েছেন এবং অপরটিকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছেন।

টোটেমবাদের বৈশিষ্ট্যের আরো নির্ভুল চিত্র পেতে হলে আর একজন গ্রন্থকারের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো দরকার। ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত জে. জি. ফ্রেজার। এই বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় পর্যবেক্ষণের উপাত্তের সুসম্পূর্ণ সংগ্রহের সঙ্গে এবং এর মধ্যে যেসব সমস্যার কথা উল্লিখিত হয়েছে সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা একত্রিত করে ফ্রেজার সাহেব চারখণ্ডের একটি পুস্তক লিখেছেন, তাঁর এই পুস্তকের নাম, *Totemism and Exogamy*।[৩] মনঃসমীক্ষণের অনুসন্ধানের ফল ও ফ্রেজারের বক্তব্যের মধ্যে যদিও অনেক প্রভেদ আছে,[৪] তথাপি তিনি এর মাধ্যমে যে আনন্দ পরিবেশন করেছেন এবং সমস্ত তথ্য আমাদের দিয়েছেন সেজন্য তাঁর কাছে আমরা যথেষ্ট ঋণী।

---

৩. ১৯১০।

৪. এরূপ ক্ষেত্রে সত্যতা প্রমাণ করা যে কত শক্ত তা পাঠককে প্রথম থেকেই দেখিয়ে দেওয়া ভালো।

যারা উপাত্ত সংগ্রহ করে আর যারা সেগুলির আলোচনা করে এবং সার সংগ্রহ করে তারা এক লোক নয়। প্রথম দলের লোক হচ্ছেন ধর্মযাজক এবং পর্যটক। আর অন্য দলে আছেন বৈজ্ঞানিক, খুব সম্ভবত এঁরা তাঁদের গবেষণার বস্তুকে কখনো চোখে দেখেননি। বর্বরদের সঙ্গে কোনো একটি বোঝাপড়ায় পৌঁছনো খুব সহজ কাজ নয়। সকল পর্যবেক্ষকের স্থানীয় ভাষাজ্ঞান ছিল না, অনেককেই দোভাষীর সাহায্য নিতে হয়েছিল কিংবা গেঁয়ো অশুদ্ধ ইংরেজিতে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিল। বর্বররা তাদের সংস্কৃতির গূঢ় বিষয়গুলির ব্যাপার মোটেই বলতে চায় না। এসব তারা মাত্র তাদের কাছেই বলে যারা বহুদিন থেকে তাদের সঙ্গে বাস করছে। নানা উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে তারা ভুল এবং ভ্রমাত্মক সংবাদ দিয়ে থাকে (ফ্রেজার সাহেব লিখিত The Beginings ol Religion and Totemism Among the Australian Aborigines, Fortnightly Review 1905, Totemism and Exogamy, Vol. I, page 150-এর সঙ্গে তুলনীয়: একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, বর্বরজাতি যে-কোনো সুসভ্য জাতির মতোই প্রাচীন, নতুন জাতি নয়। তারা তাদের সুরক্ষিত প্রাচীন ভাবধারা ও নিয়ম-আচারাদি সম্বন্ধে সংবাদাদি প্রক্ষেপ বা পরিবর্তন না করে আমাদের বলবে এরূপ আশা করা আমাদের উচিত হবে না। পরন্তু বর্বর-জাতিদের মধ্যে যে বিভিন্ন দিকে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে এই কথাটিও নিশ্চিত করে বলা চলে। এইজন্য তাদের বর্তমান কোনো কোনো অবস্থা এবং মতামতের মধ্যে অতীতের মূলটি সংরক্ষিত রয়েছে—যেন প্রস্তরীভূত হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে রয়েছে, এবং কোনগুলি মূলটিকে প্রক্ষিপ্ত এবং পরিবর্তিত করেছে সেকথা আমরা দ্বিধাহীন-ভাবে বলতে পারি না। এইজন্য বর্বর সভ্যতার মধ্যে কোনটি প্রাথমিক যুগে এবং কোনটি পরবর্তীকালে অনুযোজিত সে সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে এত মতভেদ দৃষ্ট হয়। অতএব আসল অবস্থাটি যে ঠিক কী তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ব্যাখ্যা করার ওপর। সব শেষে বলা যায় যে, আদিম জাতিদের চিন্তাধারার সঙ্গে নিজের চিন্তাকে খাপ খাওয়ানো সোজা কথা নয়। কারণ, শিশুদের মতো আমরা এদেরও সহজেই ভুল বুঝি, এবং সব সময়েই আমরা আমাদের মানসিক গঠন অনুযায়ী এদের ক্রিয়াকর্ম ও মনোভাবের অর্থ করে থাকি।

ফ্রেজার সাহেব তাঁর প্রথম প্রবন্ধে[৫] লিখেছেন, 'টোটেম হচ্ছে এক জাতীর বাস্তব বস্তুসমষ্টি যেগুলির প্রতি বর্বর জাতির প্রত্যেকের অন্ধ ভক্তি আছে। তাঁর বিশ্বাস যে, ঐ বস্তুগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠ এবং একটি সম্পূর্ণ বিশেষ ধরনের সম্বন্ধ আছে। এই টোটেম ও ব্যক্তিটির মধ্যে যে সম্পর্ক তা পরস্পরের পক্ষে হিতকর। টোটেম ব্যক্তিটিকে রক্ষা করে এবং ব্যক্তিটি নানাভাবে ঐ টোটেমকে সমীহ করে থাকে। যেমন টোটেম যদি কোনো প্রাণী হয়, সে তাকে হত্যা করে না; যদি কোনো উদ্ভিদ হয় তাহলে তাকে কাটে না বা সংগ্রহ করে আনে না। বস্তু-প্রীতির সঙ্গে টোটেমের প্রভেদ আছে। বস্তু-প্রীতির মতো টোটেম কখনো একটিমাত্র বস্তু না হয়ে এক শ্রেণীর বস্তু হয়; সাধারণত এক প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ হয়ে থাকে। কখনও কখনও একজাতীয় প্রাকৃতিক বস্তুও হয়ে থাকে এবং কোনো একজাতীর অপ্রাকৃতিক বস্তু-সমষ্টি ক্বচিৎ টোটেম বলে গণ্য হয়।'

টোটেমকে অন্ততপক্ষে তিনটি ভাগে পৃথক করা যায়, যেমন—

১. আদিম জাতীয় টোটেম। এই জাতীয় টোটেমকে জাতির সকল লোকে মেনে চলে। এবং এটি পুরুষানুক্রমিক—এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে প্রসারিত হয়,

২. লিঙ্গ-সম্বন্ধীর টোটেম। এটি আদিম জাতির সমস্ত পুরুষের মধ্যে কিংবা সমস্ত নারীর মধ্যে বর্তমান (বিপরীত লিঙ্গ বর্জিত) এবং

৩ ব্যক্তিগত টোটেম। এটি ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, পরবর্তী অংশে প্রসারিত হয় না।

আদিম জাতীয় টোটেমের তুলনায় শেষোক্ত দুই প্রকার টোটেমের তত গুরুত্ব নেই। আমরা যদি ভুল না করি তাহলে দেখতে পাব যে শেষোক্ত দুটি টোটেমের গুরুত্বও বিশেষ কিছু নেই।

আদিম জাতীয় টোটেম (গোষ্ঠী টোটেম) হচ্ছে একদল পুরুষ ও নারীর সম্মানের বস্তু। এরা টোটেম থেকেই নিজেদের নামকরণ করে এবং নিজেদেরকে একই পূর্ব-পুরুষের সগোত্র সন্তান বলে মনে করে। এবং পরস্পরের প্রতি একটি সাধারণ কর্তব্যবোধে এবং টোটেমের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে সুসংবদ্ধ।

টোটেমবাদ একটি ধর্মীয় তথা সামাজিক ব্যবস্থা। ধর্মের দিকটি হচ্ছে, পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং টোটেম ও তার নিজের মধ্যে বোঝাপড়া করা। এবং এক গোষ্ঠীর প্রতি অন্য গোষ্ঠীর কোনো এক গোষ্ঠীর ব্যক্তির প্রতি অন্য গোষ্ঠীর ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ববোধকে নিয়ে হলো সামাজিক ব্যবস্থা। টোটেমবাদের পরবর্তী ইতিহাসে এই দুই ব্যবস্থাকে পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে দেখা যায়। ধর্মীয় ব্যবস্থার চেয়ে সামাজিক ব্যবস্থাটাই বেঁচে রয়েছে, এইটাই প্রায়শ লক্ষ করা যায়। উল্টোটাও আবার রয়েছে। যেমন, যে দেশের সমাজব্যবস্থা টোটেমবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল অথচ এখন তা আর বোঝা যায় না, সেই দেশের ধর্মব্যবস্থার মধ্যে এই টোটেমবাদের অবশিষ্টাংশ বেঁচে রয়েছে। টোটেমবাদের এই দুইদিক আদিতে কিভাবে

---

৫. Totemism (Edinburgh. 1887), তাঁর বিখ্যাত রচনা Totemism and Exogamy-র প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

সংযুক্ত ছিল তা আমরা টোটেমবাদের সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান অজ্ঞানতা দিয়ে সঠিক করে বলতে পারি না। তবে আদিতে টোটেমবাদের এই দুটো দিককে একের থেকে অন্যকে পৃথক করা সম্ভব ছিল না—এরূপ বিশ্বাস করার কারণ যথেষ্টই রয়েছে, একথা মোটামুটিভাবে বলা যায়। অর্থাৎ যতই আমরা গোড়ার দিকে দৃষ্টি দেব ততই পরিস্ফুট হবে যে, কোনো আদিম জাতির মানুষ নিজেকে তার টোটেমের সমগোত্রীয় বলে মনে করেছে এবং টোটেমের প্রতি তার মনোভাবের সঙ্গে, সজাতীয় সঙ্গীদের প্রতি তার মনোভাবের কোনো ভিন্নতা সে করেনি।

টোটেম ধর্ম ব্যবস্থার বিশেষ বিবরণ দিয়ে গিয়ে ফ্রেজার সাহেব জোর দিয়ে বলেছেন যে, আদিম জাতির লোকেরা তাদের টোটেমের নামানুযায়ী নিজেদের নামকরণ করে এবং তারা যে টোটেমের অধস্তন পুরুষ সে-কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস থাকার জন্যই তারা তাদের টোটেমকে কখনো শিকার করে না বা হত্যা করে না কিংবা ভক্ষণ করে না। এবং টোটেম যদি প্রাণী না হয়ে কোনো বস্তু হয় তাহলে তারা সেই বস্তুকে কোনো প্রকারে ব্যবহার করে না। টোটেমকে হত্যা করা বা ভক্ষণ করাই একমাত্র নিষেধ নয়, কখনো কখনো দেখা যায় টোটেমকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না, এমনকি তাকে দর্শন করাও নিষিদ্ধ। বহুক্ষেত্রে টোটেমের আসল নাম ধরে ডাকাও নিষিদ্ধ। টোটেম-রক্ষণকারী এইসব টাবু-নিষেধ অমান্য করলে তার শাস্তিস্বরূপ কঠিন ব্যাধি বা মৃত্যু অবধারিত।[৬]

মাঝে মাঝে দেখা যায় কোনো কোনো গোষ্ঠী টোটেম প্রাণীর বাচ্চা তুলছে এবং তাকে আবদ্ধ অবস্থায় রেখে লালন পালন করছে।[৭] টোটেম প্রাণীটির যদি মৃত্যু হয় তাহলে তার জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। মানুষ মারা গেলে যেভাবে তার জন্য শোক প্রকাশ করে এই মৃত প্রাণীটির জন্যও ঠিক সেইভাবেই শোক প্রকাশ করা হয়। যদি কোনো টোটেম প্রাণীকে কখনো হত্যা করতে হয় তাহলে বিধিবদ্ধ আচার অনুযায়ী সে কাজের হেতু দেখাতে হবে।

এই আদিম জাতি তাদের টোটেমের কাছ থেকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাবার আশা করে। টোটেম জীবটি যদি ভয়ঙ্কর হয় (যেমন শিকারী পশু বা বিষধর সর্প) তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে, সে কোনো ক্ষতি করবে না। যেখানে এই অঙ্গীকার ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে সেখানে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জাতি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। ফ্রেজার মনে করেন আজকে যা শপথ, তা আদিতে ছিল কঠিন পরীক্ষা। এইভাবে বংশানুক্রম এবং বিশুদ্ধতা বিচারের পরীক্ষার ভার ক্রমশ টোটেমের উপর এসে পড়েছে। অসুখ-বিসুখের সময় টোটেম সাহায্য করে এবং জাতিকে প্রত্যাদেশ ও সাবধান বাণী শোনায়। কোনো বাড়ির নিকটে টোটেম প্রাণীর আবির্ভাবকে মনে করা হয় টোটেম তার আত্মীয়কে সঙ্গে নেবার জন্যই এসেছে। এরূপ ঘটনাকে প্রায়ই মৃত্যুর শমন বলে ধরে নেওয়া হয়।[৮]

---

৬. টাবু অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনীয়।

৭. যেমন আজও আমরা রোমে জুপিটারের মন্দিরের সিঁড়ির ধাপের ওপর খাঁচার মধ্যে নেকড়ে রাখি এবং বের্নিতে (Berne) গর্তের মধ্যে ভল্লুক রাখি।

৮. বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে শ্বেতবসনার কাহিনীর মতো।

কোনো কোনো গোষ্ঠীর ব্যক্তিবিশেষকে নানা অর্থপূর্ণ উপায়ে টোটেমের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির সম্পর্ক দেখানোর উপর জোর দিতে দেখা যায়। টোটেম প্রাণীর চর্মে সজ্জিত হয়ে তার বহিরাকৃতির অনুসরণ করে, নিজের শরীরে উল্কি কেটে টোটেম প্রাণীর চিত্র অঙ্কিত করে এবং এজন্য আরো অনেক উপায় অবলম্বন করে তা করা হয়। জন্ম-গ্রহণের শুভ মুহূর্তে, বয়ঃপ্রাপ্তি অনুষ্ঠানে কিংবা শব দাহকালীন আচারাদিতে টোটেমের সঙ্গে এই একাত্মতা কথায় ও কাজে দেখানো হয়ে থাকে। যেসব নৃত্যের মধ্যে একই গোষ্ঠীর সমস্ত লোকই টোটেমের বেশ ধরে এবং তার মতো ব্যবহার করে, সেগুলি বহুপ্রকার ম্যাজিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। সর্বশেষে দেখা যায়, এমন আনুষ্ঠানিকভাবে টোটেম প্রাণীটিকে হত্যা করা হচ্ছে।[৯]

টোটেমবাদের সামাজিক দিকটা সাধারণত প্রকাশ পায় কঠিনভাবে আদেশ পালনের মাধ্যমে এবং নিয়মের অসম্ভব কড়াক্কড়িতে। কোনো একটি টোটেম গোষ্ঠীর সব মানুষই ভাই-বোন। তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে এবং রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যদি এই গোষ্ঠীর কোনো একজন ব্যক্তি অপরিচিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হয় তাহলে তার জবাবদিহি ঘাতকের গোষ্ঠীর সকলকেই করতে হবে এবং রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মৃত ব্যক্তির গোষ্ঠীর সকলে একজোট হয়ে দাবি করবে। পারিবারিক বন্ধন সম্বন্ধে আমাদের ধারণার তুলনায় এদের টোটেমের বন্ধন অনেক বেশি দৃঢ়। আমাদের ধারণার সঙ্গে এদের বন্ধন হুবহু মেলে না। কারণ স্বাভাবিক নিয়মেই মাতৃবংশের মাধ্যমে টোটেমের উত্তরাধিকার প্রচলিত হয়েছে এবং খুব সম্ভবত গোড়ার দিকে পিতৃবংশের মাধ্যমে টোটেমের উত্তরাধিকারকে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করা হোত না। কিন্তু টাবু-নিষেধের বেলায় দেখা যায় একই গোষ্ঠীর অন্য ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ কিংবা পরস্পর যে কোন রকমের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়েছে। এইটিই হচ্ছে টোটেমবাদের সঙ্গে বহি-র্গোষ্ঠী বিবাহের বিখ্যাত এবং যুগান্তকারী সম্পর্ক। এই পুস্তকের প্রথমে পুরোটাই আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। কাজেই এইখানে কেবলমাত্র উল্লেখ করলেই চলবে যে অজাচার ভীতির প্রাধান্য থেকেই বহির্গোষ্ঠী বিবাহ উদ্ভূত হয়েছে। দল বিবাহের মধ্যে অজাচারের বিরুদ্ধে এটা যে রক্ষাকবচস্বরূপ তা সহজেই অনুমেয়। শুরুতেই এই ব্যবস্থা যুবকদের মধ্যে অজাচার নিবারণ করতে সমর্থ হয় এবং পরে এ-ব্যবস্থা আরো উন্নত হলে প্রাচীনদের মধ্যেও বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।[১০]

এই বিষয় সম্বন্ধে প্রাচীনতমের অন্যতম ফ্রেজারের বক্তব্যের যেসব সারাংশ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবারে আমি তাদের মধ্যে একটি থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি যোগ করব। ১৯১২ সালে প্রকাশিত *Elements of the Psychology of Races* (জাতি মনো-বিদ্যার উপাদান) পুস্তকে ডব্লু. ভুণ্ড বলেছেন,[১১] টোটেমপ্রাণী পূর্বপুরুষীয় জীব বলে গণ্য হয়। 'টোটেম তাহলে একাধারে দলগত ও জন্মগত নাম এবং শেষোক্ত দিক থেকে এর একটি পৌরাণিক অর্থ রয়েছে। কিন্তু এই ধারণার ব্যবহারিক দিকটার সব অর্থের সঙ্গেই যোগাযোগ আছে। এবং বিশেষ অর্থটি সম্ভবত লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যে-জন্য

---

৯. I.c., ৩৫ পৃষ্ঠা বলিদান সম্পর্কে আরো আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১০. প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে টোটেম আদিম জাতির মধ্যে শ্রেণীবিভাগের পরিভাষামাত্র হয়ে গেছে। অপরদিকে টোটেমের পুরুষানুক্রমিকের ধারণা কিংবা সংঘ (cult)-বোধক অর্থ প্রচলিত রয়েছে···।টোটেমের ধারণা থেকে আদিম জাতির বিন্যাস এবং সংগঠন সূচিত হয়। এই সব মানবোধ এবং জাতির সভ্যদের বিশ্বাস ও অনুভূতির মধ্যে এই মান-এর প্রতিষ্ঠা থেকেই প্রমাণ হয় যে, আদিতে টোটেম প্রাণী কেবলমাত্র দলের শাখার নামকরণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়নি ; সাধারণভাবে বলা যায় ঐ দলশাখার পূর্বপুরুষ হিসাবে গণ্য হয়েছে···। এই থেকে প্রমাণ হয় যে ঐ প্রাণী-পুরুষরা কোনো এক পন্থ (cult) বা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল···। এই প্রাণী-পন্থ (cult) প্রধানত টোটেম প্রাণীর প্রতি মনোভাবের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে ; বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ড বা আনুষ্ঠানিক উৎসব থেকে এ সম্পূর্ণ ভিন্ন ; কেবলমাত্র প্রাণীবিশেষ নয় একই প্রজাতির মধ্যে প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রতিনিধিমাত্রেই অন্তত কিছুটা পরিমাণে পবিত্র বলে পরিগণিত হয়। টোটেম দলের সভ্যদের পক্ষে টোটেম প্রাণীর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ, বড় জোর বিশেষ কোনো উপলক্ষে এই মাংস ভক্ষণ করার অনুমতি সে পেতে পারে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে যে অর্থপূর্ণ বিপরীত ঘটনা দেখা যায় তার সঙ্গে সংগতি রয়েছে, যেমন—কোনো কোনো অবস্থায় খুব ঘটা করে টোটেম মাংসের ভুরিভোজন হয়ে থাকে···।'

'·····এই টোটেমীয় উপজাতীয় ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখা যায় কতকগুলি নৈতিক নিয়মের অন্তর্বর্তী দলের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে। এইসব নিয়মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের নিয়মগুলি। এইভাবে এই উপজাতি বিভাগ টোটেমীয় যুগে সর্বপ্রথম আবির্ভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত। যথা, জ্ঞাতির বাইরে বিবাহ।'

পরবর্তী কালের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে জড়িত সবকিছুকে বাদ দিয়ে আমরা যদি প্রাথমিক টোটেমবাদের লক্ষণগুলির মূল অনুসন্ধান করতে চাই তাহলে নিম্নোক্ত সত্যগুলি দেখতে পাব : আদিতে টোটেমমাত্রেই প্রাণী ছিল এবং এই প্রাণী একটি উপজাতির পূর্বপুরুষ বলে গণ্য হোত এবং কেবলমাত্র মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকারত্ব প্রাপ্ত হোত। টোটেম হত্যা ছিল নিষিদ্ধ (কিংবা টোটেম ভক্ষণ, বর্বরকালীন অবস্থায় যার অর্থ একই)। কোনো টোটেমের সভ্যদের মধ্যে পরস্পর যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধ ছিল।[১২]

রেইনাক তাঁর *Code du Totemisme* নামক পুস্তকে জ্ঞাতির বাইরে বিবাহকে প্রধান টাবু বলে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু খুব আশ্চর্যের কথা, যেখানে তিনি টোটেম

---

১১. ১১৬ পৃষ্ঠা।

১২. ফ্রেজার এই বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় খণ্ডে টোটেম সম্বন্ধে যে উপসংহার করেছেন তাতে তিনি এই বক্তব্যের প্রতি সম্মতি জানিয়েছেন : 'অতএব ধর্ম এবং সমাজ উভয়দিক থেকেই টোটেমবাদকে সর্বত্র আদিম ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হয়েছে। বর্বরের সঙ্গে তার টোটেমের রহস্যময় সম্পর্ককে ঘিরে রয়েছে এর ধর্মব্যবস্থার দিক, আর সমাজব্যবস্থার দিকে রয়েছে একই টোটেম অন্তর্গত স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক এবং অন্যান্য টোটেম দলের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং এই ব্যবস্থার দুইটি দিকের অনুরূপ রয়েছে দুটি মোটামুটি ধরনের পরীক্ষা বা টোটেমবাদের নির্দেশ ; প্রথম

প্রাণী থেকে বংশধারার উৎপত্তি, এই দ্বিতীয় টাবুর প্রকল্পটি সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন সেখানে ঐ প্রথম টাবুর উল্লেখমাত্র নেই। তবুও এই বিষয়ে রেইনাক-এর মতো গ্রন্থকারের কাছে আমরা অনেক ঋণী। বিভিন্ন লেখকের মধ্যে মতভেদের আলোচনা করার প্রস্তুতির জন্য আমি তাঁর বক্তব্যর অবতারণা করেছি। এখন এই আলোচনায় আমরা মনোনিবেশ করব।

২

টোটেমবাদ প্রত্যেক সভ্যতার একটি নিয়মিত ধারাতে পরিণত হয়েছে বলে আমরা যতই নিশ্চিত হচ্ছি ততই একে ভালভাবে বোঝবার এবং এর গোলকধাঁধা প্রকৃতির ওপর আলোকসম্পাৎ করার প্রয়োজন জরুরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সোজা কথায় বলা যায়, টোটেমবাদের সবকিছুই হেঁয়ালিতে ভরা। এর চূড়ান্ত প্রশ্ন হচ্ছে—টোটেমের উৎপত্তি, জ্ঞাতির বাইরে বিবাহের প্রেষণা (কিংবা এই প্রথা যার প্রতিনিধিত্ব করছে সেই অজাচারনিষেধ) এবং টোটেম সংস্থা ও অজাচার-নিষেধ এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক।

এই জানার চেষ্টা হওয়া উচিত ঐতিহাসিক ও মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে। এদ্বারা আমাদের জানা দরকার কি কি অবস্থার মধ্যে এই অদ্ভুত সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং মানুষের মনের কোন্ কোন্ চাহিদার বিকাশে সে সাহায্য করেছে।

কতকগুলি বিভিন্ন মতামতের কথা বিবেচনা করে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ গবেষকদের মতের মধ্যে কতপার্থক্য রয়েছে সে-কথা শুনলে পাঠকগণ নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হবেন। টোটেম সম্বন্ধে যেসব কথা সাধারণভাবে নিশ্চয় করে বলা হয় তাদের প্রায় প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই সংশয় রয়েছে। এমনকি এ সম্বন্ধে ফ্রেজার কর্তৃক ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত প্রবন্ধ থেকে উপরোক্ত যে অভিমতটি নেওয়া হয়েছে সেটির প্রাধান্য যে লেখকের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী হয়েছে এরকম সমালোচনাকে মেতে নিতে হয়। আজকের দিনে ফ্রেজার নিজেই তাঁর মতের প্রতিবাদ করতেন, কেননা, তিনি বার বার এ-বিষয়ে তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন।[১৩]

আমরা একবার যদি উভয় সংস্থার মূলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি তাহলে

নির্দেশ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি তার টোটেম দলভুক্ত কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে না বা তাতে উপগত হবে না' (১০১ পৃষ্ঠা)। এরপর ফ্রেজার যা বলেছেন তাতে আমরা টোটেম-আলোচনার একেবারে মাঝখানে গিয়ে পড়ি : 'ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় দিকই সব সময় বর্তমান, কিংবা অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর নির্ভরশীল কিনা, সে প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দেওয়া হয়েছে।'

১৩. মতের এরূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে ফ্রেজার একটি চমৎকার উক্তি করেছেন : 'এইসব কঠিন প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি আমার শেষ কথা বলে দিয়েছি—এরূপ কথা বলার মতো বোকা আমি নই। আমি আমার মতের পরিবর্তন বারবার করেছি এবং প্রত্যেকটি প্রমাণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার মতের পরিবর্তন বার বার করব। কেননা, বহুরূপীর মতো অনুসন্ধানের ক্ষেত্রের রঙ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানকারীর উচিত তারও রঙ পরিবর্তন করা।'

—Totemism and Exogamy, 1990, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা।

টোটেমবাদের প্রকৃতি ও জ্ঞাতি বহির্ভূত বিবাহের ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারব, এ-কথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু অবস্থাটা ভালভাবে বোঝার সময় অ্যান্ড্রু ল্যাঙ (Andrew Lang)-এর মন্তব্যের কথা ভুললে চলবে না যে, এমনকি বর্বর ব্যক্তিরাও তাদের সৃষ্টির মৌলিক গঠন এবং শর্তগুলি রক্ষা করতে পারেনি। এই কারণে পর্যবেক্ষণের অভাব পূরণ করার জন্য আমরা প্রকল্পের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।[১৪] অদ্যাবধি যেসব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে মনোবৈজ্ঞানিকদের বিচারে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি একেবারে শুরু থেকেই অসম্পূর্ণ। সেগুলি আগাগোড়া যুক্তিতর্কের বাড়াবাড়িতে ভরা এবং বক্তব্য বিষয়ের অর্থ করার ব্যাপারে তার উপযোগিতার কথা বিবেচিত হয়নি। অন্যগুলির ভিত্তি অনুমানের ওপর, পর্যবেক্ষণের দ্বারা এগুলি প্রমাণ করা যায় না। এছাড়া আরো যেগুলিকে সত্য বলে ধরা হয় সেগুলির ভিন্ন অর্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এইসব বিভিন্ন মতগুলিকে খণ্ডন করা সচরাচর মোটেই শক্ত নয়। কারণ লেখকদের যুক্তি তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের চেয়ে অন্যের বক্তব্যের সমালোচনায় বেশি জোরাল। এজন্য যে সমস্ত নতুন সাহিত্য গড়ে উঠেছে—যাদের অধিকাংশই এখানে উল্লিখিত হয়নি, সেগুলি টোটেম সমস্যার কোনো সাধারণ সমাধান সম্ভব নয় বলে যে মত প্রকাশ করেছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই (উদাহরণস্বরূপ Journal of American Folklore ১৯৬৩, ২৩ সংখ্যার B. Goldenweiser-এর প্রবন্ধের সমালোচনা ১৯১৩ সালের *Britannica year Book* দ্রষ্টব্য)। এই পরস্পর-বিরোধী প্রকল্পগুলিকে তারিখ অনুযায়ী না সাজিয়ে নিম্নলিখিতরূপে সাজাবার স্বাধীনতা আমি নিয়েছি।

(a) টোটেমবাদের উৎপত্তি

টোটেমবাদের উৎপত্তির প্রশ্নটি নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ বর্বরেরা কিভাবে নিজেদের জন্য এবং তাদের আদিম জাতিভাইদের জন্য প্রাণী উদ্ভিদ ও নিষ্প্রাণ বস্তুগুলি পছন্দ করল ?[১৫]

স্কটল্যাণ্ডের ম্যাকলেন্নান (Mac Lennan), যিনি টোটেমবাদ এবং জ্ঞাতি-বহির্ভূত বিবাহকে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলে আবিষ্কার করেছিলেন,[১৬] তিনি টোটেমবাদ সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। অ্যান্ড্রু ল্যাঙ-এর[১৭] এক বিবরণীতে

---

১৪. 'টোটেমবাদের মূল যেখানে ঐতিহাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক্তিয়ারের বাইরে সেই অবস্থায় এবিষয়ে অনুমানের ওপর আমাদের নির্ভর করতেই হবে।' Andrew Lang, The Secret of the Totem, পৃষ্ঠা ২৭। 'একেবারে খাঁটি বর্বর কোনো ব্যক্তি এবং ঘটমান টোটেমীয় অবস্থা তো আমরা কোথাও দেখি না।' পৃষ্ঠা ২৯।

১৫. সম্ভবত প্রথমে কেবল প্রাণী।

১৬. The worship of Animals and Plants (Fortnightly Review 1869-70) Primitive marriage, 1865, এই দুইটি লেখাই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, Studies in Ancient History, 1876, 2nd edition, 1886, পত্রিকায়।

১৭. The Secret of the Totem, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ, ৩৪ পৃষ্ঠা।

জানা যায়, তিনি কোনো এক সময়ে দেহে উল্কি পরার প্রথার সঙ্গে টোটেমবাদের সম্পর্ক স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। টোটেমবাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় সম্বন্ধে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেগুলিকে আমি তিনটি ভাগে ভাগ করতে চাই : (ক) নামপ্রধান, (খ) সমাজবৈজ্ঞানিক ও (গ) মনোবৈজ্ঞানিক।

আমি এই শিরোনামা ব্যবহার কেন করেছি তার যথার্থতা এইসব মতবাদের সংক্ষিপ্তসার থেকে প্রমাণিত হবে।

ক. নামপ্রধান মতবাদ

Garcialaso de La Vegi হচ্ছেন **Peruvion Incas**-এর একজন বংশধর। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর জাতির এক ইতিহাস রচনা করেন। শোনা যায় তিনি, আদিম জাতিরা কেন নামের সাহায্যে এক থেকে অন্যকে ভিন্ন করে নিজেদের তফাত করেছিল সেই টোটেমীয় ব্যাপারটির গোড়ায় পৌঁছতে পেরেছিলেন।[১৮] কয়েক শতাব্দী পরে **A. K. Keane** রচিত ***Ethnology*** (জাতিতত্ত্ব) পুস্তকে ঐ একই কথা বলতে দেখা গেল যে, টোটেমের শুরু হয়েছে নকিবী নিদর্শন (**heraldic badges**) থেকে। এইসব চিহ্ন দিয়ে ব্যক্তি পরিবার ও জাতি নিজেদের পৃথক করতে চেয়েছেন।[১৯]

ম্যাক্সমুলার (**Max Muller**) টোটেমের অর্থ সম্বন্ধে তাঁর ***Contribution to the Science of Mythology***[২০] বা পৌরাণিক বিজ্ঞানে দান নামক পুস্তকে এই কথাই বলেছেন। টোটেম হচ্ছে : ১. উপজাতির একটি চিহ্ন (**clan**), ২. কোনো উপজাতির নাম, ৩. উপজাতির পূর্বপুরুষের নাম, ৪. উপজাতি কর্তৃক সম্মানিত বস্তুর নাম। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জে. পিক্‌লার (**J. Pickler**) লিখলেন যে, লোকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজের জন্য একটি স্থায়ী নামের প্রয়োজন বোধ করে যাতে সেটা লিখেরাখা যায় ··· । এইভাবে, কোনো ধর্মীয় প্রয়োজনে নয় একান্তই গদ্যময় প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে টোটেমবাদের সৃষ্টি হয়েছে। টোটেমবাদের মূল এই নামকরণ আদিম লিখনের কলাকৌশলের ফল। টোটেম যেন লিখন প্রতীকের সহজিয়া প্রতিনিধি। কিন্তু বর্বরেরা যদি প্রথমে এই জন্তুর নাম জেনে থাকে তবে সেই জন্তুর নাম থেকে সম্পর্কের কথা ভাবতে পারে।[২১]

হার্বার্ট স্পেন্সারও (**Herbert Spencer**)[২২] মনে করতেন যে, নামকরণের মাধ্যমেই টোটেমবাদের উৎসের সন্ধান মিলবে। তিনি দেখিয়েছেন যে, কোনো কোনো

---

১৮. পূর্বোক্ত নজির।

১৯. পূর্বোক্ত নজির।

২০. অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙ-এর মতে।

২১. **Pickler and Somlo, The Origin of Totemism,** ১৯০১। লেখকরা তাঁদের এই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাকে যথার্থই **Contribution to the Materialistic Theory of History** (ইতিহাসের জড়বাদী তত্ত্বের আলোচনা) বলেছেন।

২২. **The Origin of Animal worship (Fortnightly Review, 1870), Principles of Psychology. Vol 1. PP 169 to 170.**

ব্যক্তির গুণকীর্তনের সময় কোনো কোনো পশুর নাম নেওয়া হোত। এইভাবে তাদের সম্মানিত নাম বা ডাক নামের প্রচলন হয়েছে এবং পরে এইগুলি তাদের বংশধরদের মধ্যে চলে আসছে। আদিম ভাষার অনির্দিষ্টতা ও অবোধ্যতা হেতু পরবর্তী বংশধরেরা পশু থেকেই যে তাদের জন্ম, এই নামগুলিকে তার প্রমাণ বলে মেনে নিয়েছে। এই-ভাবে পূর্বপুরুষদের প্রতি মিথ্যা শ্রদ্ধার ফলে টোটেমবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

লর্ড আভবুরি (**Lord Avebury,** স্যার জন লাম্বাক নামে যিনি আরো বেশী পরিচিত) টোটেমবাদের মূল সম্পর্কে ঐ একইমতপ্রকাশ করেছেন : অবশ্য ভুল বোঝার ওপর তিনি বেশি জোর দেননি। পশুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হলে আমরা যে কতবার পশুর নাম মানুষের নামকরণে ব্যবহার করি সে-কথা ভুললে চলবে না। যদি কোনো লোককে ভল্লুক কিংবা সিংহ বলে ডাকা হয়ে থাকে, তাহলে তার সন্তান ও ভক্তরা যে ঐ নামটি নিজেদের পূর্বপুরুষদের নাম হিসেবে ধরে নেবে সেটি খুবই স্বাভাবিক। এইভাবে পশুটিকেই সমান ও সর্বশেষ গভীর শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে।

এইভাবে ব্যক্তির নাম থেকে টোটেমের নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ফিশন সাহেবের আপত্তিকে অকাট্য বলেই মনে হয়।[২৩] তিনি অস্ট্রেলিয়ার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছেন যে, টোটেম সব সময়েই একটি মনুষ্যদলের চিহ্ন হয়ে থাকে এবং কখনো কোনো ব্যক্তিবিশেষকে বোঝাতে ব্যহার করা হয় না। কিন্তু এটাই যদি উল্টো হোত অর্থাৎ টোটেম যদি আদিতে ব্যক্তিবিশেষের নাম হোত তাহলে মাতৃ-উত্তরাধিকার ব্যবস্থার মধ্যে সে নাম কখনো তার সন্তানদের মধ্যে প্রচলিত হোত না।

থিয়োরি বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এতক্ষণ যা বলা হলো তা যে যথেষ্ট নয় তা সহজেই অনুমেয়। ঐগুলি থেকে বড়জোর বোঝা যায় যে, আদিম জাতিদের মধ্যে জীবজন্তুর নাম কি করে এল। কিন্তু এই নাম দেওয়ার সঙ্গে যে-গুরুত্ব লিপ্ত রয়েছে, যার উপর নির্ভর করে টোটেমীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সে-প্রশ্নের উত্তর ঐসব থিওরি কখনো দিতে পারে না। এই দলের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত মতবাদ হচ্ছে অ্যান্ড্রু ল্যাঙ-এর। তিনি তাঁর এই মত *Social Origin* (১৯০৩) এবং *The Secret of the Totem* (১৯০৫), নামক দুইটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর এই মতবাদ এখনো নামকরণকেই সমস্যার কেন্দ্র বলে মনে করে। কিন্তু এতে দুইটি প্রণিধানযোগ্য মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং এইভাবে এটি টোটেমবাদের গোলকধাঁধার চরম সমাধানে অবদান জুগিয়েছে বলে দাবি করতে পারে।

অ্যান্ড্রু ল্যাঙ মনে করেন, উপজাতিরা কিকরে তাদের জীবজন্তুর নাম পেল তাতে কিছু আসে যায় না। ধরে নেওয়া যায় একদিন তারা হঠাৎ জানতে পারল যে, তারা এসব নাম পেয়েছে, কিন্তু কোথা থেকে পেয়েছে তার কোনো হদিস জানে না। এই নামগুলির উৎপত্তির কথা বিস্মৃত হয়ে গেছে। এসব ক্ষেত্রে তারা তাদের নামের চিন্তা গভীরভাবে করে সে-সম্বন্ধে আরো সংবাদ কিভাবে সংগ্রহ করা যায় সে-চেষ্টা করেছে এবং তাদের নামের গুরুত্বসম্বন্ধেদৃঢ় বিশ্বাসবশততারা অপরিহার্যভাবে যেসব আই-

২৩. **Kamilaroi and Kumai, p. 165. 1880 (Lang, The Secret of the Totem, etc.)**

ডিয়ার মধ্যে এসে পড়েছিল সেইসব আইডিয়াই টোটেম ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। আজকের দিনে বর্বররা, এমনকি আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো কোনো নাম সম্বন্ধে আমাদের মতো উদাসীন থাকে না, বা তাকে মামুলী জিনিস মনে করে না : তেমনি অতীতে আদিম মানুষেরাও নামকে সাধারণ বা মামুলী বিষয় মনে করত না এবং তারা নামকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য মনে করত। ব্যক্তির নাম তার প্রধান প্রধান দৈহিক উপাদানগুলির অন্যতম এবং খুব সম্ভবত আর মনেরও একটি অংশবিশেষ। যেহেতু জীবজন্তুর মতোই তাদের নাম সেইজন্য আদিম মানুষেরা নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছে তাদের দেহের সঙ্গে বিশেষ একজাতীয় প্রাণীর নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক আছে। রক্তের সম্পর্ক ছাড়া আর কী সম্পর্ক হতে পারে? কিন্তু নামের মিল থাকার জন্য যদি একবার এরকম অনুমান স্বীকৃত হয়ে থাকে তাহলে রক্ত-সম্পর্ক টাবুর বহির্জ্ঞাতি বিবাহ সমেত সমস্ত টোটেমীয় নিষেধের জবাবদিহি সোজাসুজি এইভাবেই হতে পারে। 'প্রাণীর নামে পরিচিত একটি দল কী করে হলো সে কারণ যার জানা নেই, একই নামের মানুষ ও পশু সকল বাহকের মধ্যে মনুষ্যজ্ঞানের অতীত সম্বন্ধের প্রতি বিশ্বাস এবং রক্ত-সংস্কারে বিশ্বাস—এই তিনটি মাত্র বিষয়ের সাহায্যেই বহির্জ্ঞাতি বিবাহ সমেত সমস্ত টোটেমীয় ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-বিচারের উৎপত্তির কারণ জানা যায়।' (*The Secret of the Totem*, ১২৫ পৃষ্ঠা)

ল্যাঙ সাহেবের ব্যাখ্যা দুইটি স্তরে বিস্তৃত। নামকরণের উৎপত্তির কারণ বিস্মৃত, এই অনুমানের উপর নির্ভর করে এটা টোটেম নাম থেকে মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে টোটেমীয় প্রথার সৃষ্টি—এই অর্থ করছে। এই মতবাদের অপর অংশ এইসব নামের উৎপত্তির কারণটি স্পষ্ট করতে যথেষ্ট। এই অংশ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করছে তা আমরা দেখতে পাব।

ল্যাঙ-এর মতবাদের অংশটি আমার দেওয়া 'নাম-প্রধান' নামের থেকে খুব তফাত নয়। ব্যবহারিক প্রয়োজনের খাতিরে প্রত্যেকটি জাতি আলাদা নাম নিতে বাধ্য হয়েছিল এবং এই জন্যই তারা অন্যের দেওয়া নামকে সহ্য করে নিয়েছিল। এই 'বাইরের থেকে নামকরণ' ল্যাঙ-এর মতবাদের বৈশিষ্ট্য। এইভাবে যে-নামগুলির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি জীবজন্তু থেকে গৃহীত হয়েছে। এরচেয়ে বেশি কিছু আর এ সম্বন্ধে বলার নেই এজন্য আদিম জাতির লোকেরা একে অপবাদ বা বিদ্রূপ বলে মনে করেনি।

এছাড়া পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগ থেকে ল্যাঙ প্রচুর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। এইসব ক্ষেত্রে আদিতে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই বাইরে থেকে নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু পরে যাদের উদ্দেশ্যে এইসব নাম বর্ষিত হয়েছিল তারা স্বেচ্ছায় সেগুলিকে বহন করেছে (The Guises, Whigs, Tories)। কালে এইসব নামের গোড়াপত্তনের কথা বিস্মৃত হয়েছে এই অনুমানই ল্যাঙ-এর মতবাদের দ্বিতীয় অংশকে এইমাত্র উল্লিখিত প্রথম অংশের সঙ্গে যুক্ত করছে।

খ. সমাজবৈজ্ঞানিক মতবাদ

এস. রেইনাক (S. Reinach), যিনি পরবর্তী যুগের ধর্মমত এবং প্রথার মধ্যে

টোটেম ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানে কৃতকার্য হয়েছিলেন, তিনি যদিও টোটেম প্রাণী থেকে জন্ম বৃত্তান্তের উপর আগাগোড়া সামান্যই গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তথাপি একবার তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন তাঁর কাছে টোটেমবাদ 'Une hypertrophie de l' instinct social' ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৪]

ই. ডার্কহাইম (E. Durkheim)-এর Les Formes Elementaires dela Vie Religieuse এবং Le Systeme Totemique en Australie, 1912—এই দুটি নতুন লেখার মধ্যে ঐ একই অর্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। টোটেম এইসব জাতিদের সামাজিক মর্মের চাক্ষুষ প্রতিনিধি। এটটি স্থানীয় সমাজকেই (Community) মূর্ত করেছে। এই সমাজই হচ্ছে গভীর শ্রদ্ধার আসল বস্তু।

টোটেমিক সংস্থাগুলি গড়ে তুলতে সামাজিক আবেগ যেভাবে কাজকরেছে তার দাবি বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য গ্রন্থকাররা আরো জোরাল যুক্তির অবতারণা করেছেন। এ. সি. হাড্ডন (A. C. Huddon) মনে করেন প্রত্যেক আদিম জাতি প্রথমে কোনো একটি উদ্ভিদ বা প্রাণী ভক্ষণ করে জীবনধারণ করত এবং খুব সম্ভবত এই খাদ্যবস্তু নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করত এবং অন্য আদিম জাতির লোকেদের সঙ্গে বদল করত। এইভাবে একটি জাতির লোক অন্য জাতির কাছে ঐ পণ্য প্রাণীটির নামে অনিবার্য-ভাবে পরিচিত হয়ে পড়েছিল। কেননা, এক্ষেত্রে ঐ পণ্যদ্রব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাথে সাথে ঐ প্রাণীটির সঙ্গে জাতিটির বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হলো এবং ক্ষুধার মতো সর্বাপেক্ষা আদিম এবং জরুরি প্রয়োজনবশত মানসিকপ্রেষণার ওপর ভিত্তি করে হলেও প্রাণীটির প্রতি মানুষের একটি বিশেষ আগ্রহের উদ্রেক হয়েছিল।[২৫]

সমস্ত টোটেম মতবাদের মধ্যে এই মতবাদ সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বক্তব্য হচ্ছে যে, আদিম লোকদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা কখনো ছিল না। বর্বরদের মধ্যে যারা সমাজের যত বেশি নিম্নস্তরে থাকে, তারা ততই বেশি সর্বভুক্ হয়। তা ছাড়া এমন একটি প্রিয়তম খাদ্যের ভোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়ে তারা এরকম একটিমাত্র খাদ্যের মাধ্যমে কী করে টোটেমের সঙ্গে প্রায় ধর্মপর্যায়ের একটি সম্বন্ধ সৃষ্টি করতে পারে সে-কথা বোধের অগম্য।

টোটেমের উৎপত্তি সম্বন্ধে ফ্রেজার বর্ণিত মতবাদের মধ্যে প্রথমটি মনোবৈজ্ঞানিক। এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

মধ্য এশিয়ার অধিবাসী দুইজন অনুসন্ধানকারী কর্তৃক প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফ্রেজার তাঁর দ্বিতীয় মতবাদটি লিপিবদ্ধ করেন।[২৬] এইটির আলোচনা আমরা এখানে করব।

স্পেনসার এবং গিল্লেন (Gillen) তথাকথিত অরুন্তা জাতি বলে পরিচিত একদল আদিম জাতির কতকগুলি অদ্ভুত ধরনের প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও মতামতের উল্লেখ

---

২৪. ছোট হরফ, প্রথম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা।

২৫. Address to the Anthropological section, British Association, Belfast. 1902. ফ্রেজারের মতানুসারে ছোট হরফ, প্রথম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

২৬. The Native Tribes of Central Australia, by Baldwin Spencer and H. J. Gillen, London 1891.

করেছেন। সেইগুলি সম্বন্ধে ফ্রেজার বলেন যে, এই অদ্ভুত ব্যাপারগুলিকে প্রাথমিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিতে হবে এবং এগুলির সাহায্যেই টোটেমবাদের প্রথম ও প্রকৃত অর্থ বোঝা যাবে। অরুন্তা আদিম জাতির মধ্যে (অরুন্তা জাতির একটি অংশবিশেষ) এই অদ্ভুত ব্যাপারগুলি নিম্নরূপ :

১, তারা টোটেম-গোষ্ঠীতে বিভক্ত কিন্তু টোটেম পুরুষানুক্রমিক না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে ঠিক হয় (পরে দেখানো হবে)।

২. টোটেম গোষ্ঠীতে বহির্জ্ঞাতি বিবাহ নেই। টোটেমের সঙ্গে সম্বন্ধবর্জিত সুসংগঠিত বিবাহ শ্রেণী দল সৃষ্টির দ্বারা বিবাহের বিধি-নিষেধ স্থাপিত হয়েছে।

৩. টোটেম গোষ্ঠীর কাজ হচ্ছে এমন অনুষ্ঠান পালন করা যা সূক্ষ্ম ইন্দ্রজালের মতো ভক্ষণীয় টোটেমের বৃদ্ধি ঘটাবে। (এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় Intichiuma)।

৪. গর্ভধারণ বা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে অরুন্তাদের এক অদ্ভুত মতবাদ আছে। তারা মনে করে, তাদের টোটেমভুক্ত মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনর্জন্মের জন্য কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে এবং সেই স্থান দিয়ে যখন কোনো স্ত্রীলোক যায় তখন তার শরীরে প্রবেশ করে। যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন আত্মার কোন্ আড্ডা থেকে গর্ভবতী হয়েছে সে-কথা মা খুলে বলে। এই ঘটনা থেকেই শিশুর টোটেম ঠিক হয়। এখনো বিশ্বাস করা হয় যে, আত্মাসকল (মৃতের এবং পুনর্জন্মপ্রাপ্ত শিশুর) এক প্রকার অদ্ভুত পাথরের চুড়ির দ্বারা বাঁধা থাকে, এইগুলিকে বলা হয় Churinga। এই সকল স্থানে Churinga পাওয়া যায়।

অরুন্তাদের সংস্থার মধ্যেই যে টোটেমবাদের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যাবে এই বিশ্বাস ফ্রেজারের মনে সম্ভবত দুটি কারণে হয়েছে। প্রথমত, এমন কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী আছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বপুরুষরা সব সময় টোটেম প্রাণী ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করত। এবং নিজেদের টোটেমযুক্ত স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করত না। দ্বিতীয়ত, গর্ভধারণের ব্যাপারে যৌনক্রিয়ার প্রতি তাদের অস্বীকৃতির স্পষ্টতা। আজও যেসব লোকে বোঝে না যে, যৌনক্রিয়ার ফলেই স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয়ে থাকে সেরূপ লোককে অত্যন্ত অনুন্নত ও আদিম বলা যেতে পারে।

Intichiuma উৎসবের সাহায্যে টোটেমবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রেজার হঠাৎ টোটেম ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। তিনি দেখেন, টোটেম ব্যবস্থা মানুষের একান্ত চাহিদা পূরণের জন্য সম্পূর্ণ ব্যবহারিক একটি সংস্থা। (উপরোল্লিখিত হাডনের বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয়।[২৭]) ব্যবস্থাটি একটি অসাধারণ 'সমবায়ী ইন্দ্রজাল মাত্র। আদিম মানুষদের এই ব্যবস্থাকে একটি ম্যাজিক উৎপাদন ও খাদন ক্লাব বলা যেতে পারে। প্রত্যেকটি টোটেম গোষ্ঠী এক এক খাদ্যের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভার নিয়েছিল। টোটেম যদি কোনো অনিষ্টকারী প্রাণী, বৃষ্টি, বাতাস বা ঐ ধরনের অভক্ষণীয় কোনো কিছু হয় তাহলে প্রকৃতির এই দিকটাকে বশে রাখার ও এর

২৭. এ সম্বন্ধে কোনো অস্পষ্ট বা রহস্যময় কিছুই নেই, কোনো অধিবিদ্যক গোঁড়া নেই। কোনো কোনো লেখক মানুষের দূর কল্পনার অকিঞ্চিৎকর আরম্ভের উপর ভেল্কি দেখাতে ভালবাসেন; কিন্তু বর্বরদের সহজ ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং স্থূল ব্যবহারের কাছে সেগুলি নেহাতই বেখাপ্পা। (Totemism and Exogamy 1., p. 117).

অনিষ্টকারিতা দূর করার দায়িত্ব টোটেম গোষ্ঠীর। প্রত্যেক গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা ছিল যাতে অন্য গোষ্ঠীর কল্যাণ হয়। যখন কোনো গোষ্ঠী টোটেমের মাংস ভক্ষণ করত না বা খুব সামান্যই করত তখন তারা অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে ঐ মূল্যবান দ্রব্যটি বিতরণ করত। তেমনি অন্য কোনো গোষ্ঠী যখন তাদের টোটেম-কর্তব্য পালনের জন্য কোনো সামাজিক নিয়ম পালন করত তখন আবার তাদের আদরের সামগ্রী থেকে অন্যদেরও ভাগ দিত। Intichiuma উৎসবের এই ব্যাখ্যা থেকে ফ্রেজারের মনে হয়েছে, টোটেম-মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে নিষেধ যেন পর্যবেক্ষকদের ভুল পথে চালিত করেছে, যে জন্য সম্পর্কের আরো নিবিড় দিকটাকে তারা উপেক্ষা করেছে, যেমন অন্যদের প্রয়োজনে যে ক'টি দেওয়া সম্ভব সে-ক'টি ভক্ষণীয় টোটেম দেবার আদেশ।

প্রত্যেক টোটেম-গোষ্ঠী তার টোটেম ভক্ষণ করেই জীবনধারণ করত, সে-সম্বন্ধে কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। অরুন্‌তাদের এই প্রাচীন প্রথাকে ফ্রেজার মেনে নিয়েছেন। এর পর যে-ক্রমবিকাশ ঘটল, যার ফলে তারা নিজেরা টোটেম ভক্ষণে বিরত থাকলেও খুশি হয়েই অন্যদের টোটেম-মাংস দিতে থাকল, এর অর্থ বোঝা কঠিন হল। ফ্রেজার আরও মনে করেন যে, এই বিরতি কোনোরূপ ধর্মীয় সম্মান দেখানোর ফলে ঘটেনি, এ হয়েছে বর্বরদের পর্যবেক্ষণের ফলে। তারা দেখছে যে, কোনো জাতি তার নিজের কাউকে খায় না। এইভাবে টোটেমের সঙ্গে একাত্মীকরণে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় বর্বরদের পক্ষে টোটেমের চেয়ে শক্তিমান হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হলো। কিংবা হয়ত, প্রাণীটিকে নিস্তার দিয়ে তাকে তুষ্ট করার চেষ্টাও হতে পারে। এরূপ করার অসুবিধার কথা ফ্রেজার গোপন করেননি[২৮]; কিংবা অরুন্‌তাদের পৌরাণিক কাহিনীতে তাদের যে টোটেমের মধ্যেই বিবাহের কথা উল্লেখ আছে সেই প্রথা পরিবর্তিত হয়ে কিভাবে তাদের বহির্বিবাহ প্রথা প্রচলিত হলো, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করার দুঃসাহস তিনি দেখাননি।

Inhictiuma-র ওপরে ভিত্তি করেই ফ্রেজারের থিওরি বা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব অরুন্‌তা সংস্থার আদিম প্রকৃতির স্বীকৃতির উপর ফ্রেজারের মতবাদের উত্থান-পতন নির্ভর করছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে ডার্কহাইম[২৯] (Durkheim) ও ল্যাঙ[৩০] (Lang)-এর আপত্তিকে খণ্ডন করা অসম্ভব বলেই মনে হয়, বরং দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে অরুন্‌তারা সবচেয়ে উন্নত ও টোটেম-বাদের প্রাথমিক অবস্থায় না থেকে তারা টোটেমবাদের সীমায় এসে পৌঁছেছে বলেই মনে হয়।

পৌরাণিক কাহিনী ফ্রেজারের মনে এইরূপ ছায়াপাত করেছে তার কারণ অরুন্‌-তাদের পক্ষে টোটেম ভক্ষণ করতে ও সজ্ঞাতি বিবাহ করতে কোনো বাধা নেই, যা-আজকের চলতি প্রথার বিপরীত। এই কথা স্বীকার করে নিলে এগুলিকে ইচ্ছা-

---

২৮. ছোট হরফ, ১২০ পৃষ্ঠা।

২৯. L' Annee Sociologique, Vol. 1, V, VIII এবং এ ছাড়া অন্যত্র। বিশেষ করে Sur Je Totemisme, Vol, V, 1901 দ্রষ্টব্য।

৩০. Social Origins and The Secret of the Totem.

মনশ্চিত্র (wish fantasies) বলে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং সত্যযুগের পৌরাণিক কাহিনীর মতো এইগুলিকে অতীত দিনের মধ্যে প্রক্ষেপ করা হয়ে থাকে।

গ. মনোবৈজ্ঞানিকের মতবাদ

স্পেনসার ও গিল্লেনের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই ফ্রেজারের প্রথম যে-মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ গঠিত হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল 'বহিরাগত আত্মা'র[৩১] প্রতি বিশ্বাস। সম্ভাব্য বিপদ থেকে দূরে রাখার জন্য যে-আশ্রয়ে আত্মাকে সংরক্ষিত করা যায় সেই নিরাপদ স্থানকেই টোটেম বলে মনে করা হোত। আদি মানব তার টোটেমের মধ্যে নিজের আত্মাকে গৃহবদ্ধ করার পর সে নিজে বিপদমুক্ত হলো মনে করত এবং তার আত্মার বাহক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য স্বভাবতই সে সতর্ক থাকত। কিন্তু সারা প্রজাতির মধ্যে কে তার আত্মার ধারক সে-খবর সে জানে না, সেইজন্য সে সমস্ত প্রজাতির সম্বন্ধেই সতর্ক হয়ে থাকত। আত্মার প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল টোটেমের এই ব্যাখ্যা ফ্রেজার পরে পরিত্যাগ করেছেন।

যখন তিনি স্পেনসার ও গিল্লেনের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন তখন পূর্ব-বর্ণিত সামাজিক মতবাদ তিনি প্রবর্তন করেন। কিন্তু তখন নিজে দেখলেন যে, যে-উদ্দেশ্যে তিনি টোটেমবাদের অর্থ করলেন তা অত্যন্ত বেশি 'যুক্তিমূলক' (rational) এবং যে-ধরনের সামাজিক চিত্র এজন্য তিনি কল্পনা করেছিলেন তা এতই জটিল যে কোনোক্রমেই তাকে আদিমসমাজ বলা চলে না।[৩২] এখন তাঁর কাছে ম্যাজিক-সমবায়-দল টোটেমের মূল না হয়ে ফল বলে প্রতীত হচ্ছে। টোটেমবাদের অর্থের জন্য তিনি এই সকল ব্যবস্থার অন্তরালে বর্বরীয় কুসংস্কাররূপ কোনো এক সহজতর বিষয়ের সন্ধানে ছিলেন। তখন তিনি অরুন্তাদের (Aruntas) অদ্ভুত গর্ভধারণ তত্ত্বের মধ্যে মূল বিষয়টির সন্ধান পান।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গর্ভধারণ এবং যৌন ক্রিয়ার মধ্যে যে কোনো সম্পর্ক আছে তা অরুন্তাদের জানা নেই। যদি কোনো স্ত্রীলোকের মা হবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে, নিকটবর্তী কোনো প্রেতাত্মার আবাস থেকে কোনো একটি আত্মা পুনর্জন্ম নেবার জন্য এতদিন সুযোগের অপেক্ষা করছিল, সেই মুহূর্তে ঐ স্ত্রীলোকেটির শরীরে প্রবেশ করে সন্তানরূপে সে জন্মগ্রহণ করল। যেসব প্রেতাত্মা ঐ স্থানটিতে ঘোরাঘুরি করে তাদের টোটেমই এই শিশুটির টোটেম হবে।

কিন্তু আমরা যদি আরও একস্তর গভীরে যেতে চাই এবং বিশ্বাস করি যে, স্ত্রীলোকটি তার অন্তঃসত্ত্বা হওয়াকে যখন প্রথম উপলব্ধি করল সেই মুহূর্তে সে যদি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে থাকে যে, কোনো পশু, উদ্ভিদ, প্রস্তর কিংবা অন্য যে-

---

৩১. The Golden Bough, Vol. II, p. 332.

৩২. 'বর্বর জাতিরা যে স্বেচ্ছায় প্রকৃতির রাজ্যকে নানাভাগে ভাগ করে সেগুলি এক-একটি ঐন্দ্রজালিক দলের দখলে দিয়ে দেবে এবং যাতে দলগুলি সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য তাদের রাজ্যে ইন্দ্রজালের কাজ করে যাবে এবং সম্মোহনের জাল বুনবে এরূপ আদেশ দেবে, এমন কথা বিশ্বাস হয় না।' Totemism and Exogamy, Vol. V. p. 57.

কোনো বস্তু সত্যিই তার শরীরে প্রবেশ করেছে ও তার সহযোগে মনুষ্য আকৃতিতে জন্ম নিয়েছে তাহলে মায়ের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে মানুষের সঙ্গে তার টোটেমের অভিজ্ঞতা সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং এই বিশ্বাস থেকেই টোটেমের অন্য সমস্ত বিধি-নিষেধের (জ্ঞাতি-বহির্ভূত বিবাহ বাদে ব্যাখ্যা সহজেই করা যেতে পারে। মানুষ বিশেষ কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ ভক্ষণ করবে না, কারণ তা আত্মভক্ষণের নামান্তরমাত্র হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে তারা কোনো কোনো টোটেম খেতে বাধ্য হবে কারণ তাহলে টোটেমের সঙ্গে তাদের একাত্মীকরণ দৃঢ়তর হবে। এটা টোটেমবাদের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এইরকম একটি ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ব্যাঙ্ক দ্বীপের (Banks Island) অধিবাসীদের সম্বন্ধে ডব্লু. এইচ. রিভার্স যে উক্তি করেছেন তাতে মনে হয় যে, মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি তাদের টোটেমের একাত্মতা এই-রকম একটি ধারণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।[৩৩]

তাহলে দেখা যায় যে, টোটেমবাদের মূলে রয়েছে মানুষ ও পশুর প্রজনন সম্বন্ধে বর্বরদের অজ্ঞতা, বিশেষ করে গর্ভাধান ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এরূপ অজ্ঞতা আরো প্রশ্রয় পেয়েছে গর্ভাধান ও শিশুর জন্ম কিংবা নড়াচড়ার প্রথম অনুভূতির মধ্যে সময়ের ব্যবধান অধিক হওয়ার জন্য। অতএব দেখা যাচ্ছে, টোটেম-বাদ নারী-মনের রচনা, পুরুষ-মনের নয়। অন্তঃসত্ত্বা নারীর অসুস্থ কল্পনাই হচ্ছে এর মূল। সে নিজে মা হয়েছে, এ-বোধ সর্বপ্রথম যখন কোনো নারীর হয়, নারীজীবনের সেই অদ্ভুত ক্ষণটিতে গর্ভস্থ শিশুর সঙ্গে যে-কোনো কিছু একাত্মীকরণ তার পক্ষে সহজেই সম্ভব। এই অতি স্বাভাবিক এবং আপাতদৃষ্টিতে অতি বিশ্বজনীন এই মাতৃমনের কল্পনাকেই টোটেমবাদের মূল বলে মনে হয়।[৩৪]

ফ্রেজারের দ্বিতীয় মতবাদ, অর্থাৎ সমাজবৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধে যে-আপত্তি দেখানো হয়েছে, তাঁর এই তৃতীয় মতবাদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা ওঠে। টোটেম-বাদের আরম্ভ থেকে অরুন্তাস্‌রা অনেক দূরে সরে গেছে বলেই মনে হয়। তাদের পিতৃত্বের অস্বীকৃতি যে বর্বরীয় অজ্ঞতার জন্য নয় তা স্পষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের পৈতৃক উত্তরাধিকার বর্তমান রয়েছে। পূর্বপুরুষের সম্মান দেখাতে গিয়ে তারা পিতৃত্বের দাবিকে বিসর্জন দিয়েছে।[৩৫] আত্মা কর্তৃক নিষ্কলঙ্ক গর্ভাধানের পৌরাণিক কাহিনী থেকে গর্ভাধানের সাধারণ তত্ত্বে পৌঁছনোর কথা তারা ভুলতে পারে কিন্তু তাই বলে প্রজননের নিয়ম সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতার প্রশংসা আর আমরা করতে পারি না, যদিও খ্রিস্টীয় পুরাণের অভ্যুত্থানের দিনে পুরনো জাতিদের ক্ষেত্রে একবার আমরা এমন করেছি।

টোটেমবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে দিনেমার লেখক জি. এ. উইলকেন (G. A. Wileken) আর একটি মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ সংগঠন করেছেন। এই মতবাদ আত্মার পরিভ্রমণ ও টোটেমবাদের মধ্যে একটি সম্পর্কের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। 'মৃত

৩৩. Totemism and Exogamy, Vol. II, p. 89 and Vol. IV, p. 59.

৩৪. Totemism and Exogamy, Vol. IV, p. 63.

৩৫. 'এরূপ বিশ্বাস বর্বরীয়ের অনেক উর্ধ্বে, ইহা দর্শন পদবাচ্য', Andrew Lang, The Secret of the Totem, p. 192.

ব্যক্তির আত্মা, সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী, যে প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণী স্বজ্ঞাতি অর্থাৎ পূর্বপুরুষে পরিণত হয়েছে।' কিন্তু প্রাণীর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করে থাকে এই বিশ্বাস তো টোটেমবাদ থেকেই সহজে প্রতিপন্ন হয়, বিপরীতটা হয় না।[৩৬]

আমেরিকার জাতিবিদ্যায় সুপণ্ডিত ফ্রানজ বোয়াজ (Franz Boas), হিল-টাউট (Hill-Tout) এবং আরও অনেকে মিলে টোটেমবাদের আরও একটি তত্ত্ব প্রবর্তন করেছেন। এই তত্ত্ব টোটেমীয় ইণ্ডিয়ান* আদিম জাতিদের পর্যবেক্ষণের উপাত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, যে-কোনো পূর্বপুরুষের অভিভাবক আত্মাই হচ্ছে টোটেম। এই পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নের মাধ্যমে একে পেয়েছে, পরে অধস্তন পুরুষদের তা দিয়ে গেছে। একটিমাত্র ব্যক্তি থেকে পুরুষানুক্রমিকভাবে টোটেমবাদের উৎপত্তি বিষয়ে অসুবিধার কথা আমরা আগেই শুনেছি; তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার পর্যবেক্ষণ কোনোক্রমেই অভিভাবক-আত্মার সঙ্গে টোটেমকে যুক্ত করা সমর্থন করে না।[৩৭]

ভুণ্ড বর্ণিত শেষ মনোবিদ্যাতত্ত্ব থেকে দুইটি তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রথম—আদি ও সর্বাধিক টোটেম প্রাণী হচ্ছে একটি পশু এবং দ্বিতীয়—সর্বপ্রথম টোটেম প্রাণীটি এমন একটি প্রাণীর অনুরূপ যার আত্মা ছিল।[৩৮]

পাখি, সাপ, টিকটিকি, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণী তাদের গতিশীলতার জন্য, বায়ুর মধ্য দিয়ে তাদের গতিবিধির জন্য এবং ভয় ও আশ্চর্যের উদ্রেক করতে পারার বৈশিষ্ট্যের জন্য দেহত্যাগকারী আত্মার বাহক হবার উপযুক্ত। প্রেতাত্মার রূপান্তরিত প্রাণীর অধস্তন পুরুষ হচ্ছে টোটেমপ্রাণী। অতএব ভুণ্ডের মতো আত্মার প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে কিংবা সর্বপ্রাণীদের সঙ্গে টোটেমবাদ সরাসরিভাবে যুক্ত।

(b) এবং (c) বহির্জ্ঞাতি বিবাহের উৎপত্তি এবং টোটেমবাদের সঙ্গে এর সম্বন্ধ

টোটেমবাদ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত পেশ করেছি সে সম্বন্ধে যথেষ্ট খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি; কিন্তু সব সময়ই সংক্ষিপ্ত করার দরকার হওয়াতে, আমার সন্দেহ হয়, হয়ত বিষয়টি আমি প্রাঞ্জল করতে পারিনি। এই প্রসঙ্গে আরও যেসব প্রশ্ন উঠবে, পাঠকের সুবিধার জন্য সেইগুলিকে সংক্ষিপ্ত করার স্বাধীনতা আমি নিচ্ছি। টোটেমীয় জাতিগুলির বহির্বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অন্যান্য যেসব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেই সব বিষয়ের জন্যই আলোচনা খুব জটিল হয়ে গেছে, সুর হারিয়ে গেছে, এমনকি বলা যায়, তালগোল পাকিয়ে গেছে। সৌভাগ্যবশত এই বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টায় কতকগুলি পথনির্দেশ স্থির করে দেওয়া এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞ লেখকদের লেখার পুনঃপুনঃ নজির দেখানো এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয়।

---

৩৬. Franz, Totemism and Exogamy, Vol, IV, p. 45.

৩৭. Franz, l.c. p. 48

৩৮. Wundt, Elemente der volker—Psychologie, p, 190.

* রেড ইণ্ডিয়ান বুঝতে হবে।—অনুবাদক।

বহির্বিবাহ সম্বন্ধে কোনো লেখক যে-মতই সমর্থন করুন না কেন তা নিশ্চয়ই টোটেম তত্ত্বগুলির প্রভাবমুক্ত হবে না। টোটেম তত্ত্বের কতকগুলি ব্যাখ্যার সঙ্গে বহির্বিবাহের কোনো সম্পর্ক নেই, এ-দুটি সংস্থাকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। এইভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী মত দেখতে পাই। এর মধ্যে একটি মত বহির্বিবাহকে পুরনো টোটেমতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বিশ্বাস করে। এই-ভাবে দুটি সংস্থা আদিকাল থেকে যুক্ত। অপর মতটি এরূপ সম্বন্ধের সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করে এবং এই দুটিকে সুপ্রাচীন সংস্কৃতির দুইটি বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক মিলন বলে মনে করে। ফ্রেজার সাহেব তাঁর পরবর্তী লেখার মধ্যে এই শেষোক্ত মতটিকেই দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। 'টোটেমবাদ ও বহির্বিবাহ এই দুই সংস্থা যদিও অনেক আদিবাসীর মধ্যে আকস্মিকভাবে মিলেমিশে গেছে তথাপি উৎপত্তি ও প্রকৃতিতে তারা যে মূলত পৃথক এইটাই সর্বদা মনে রাখার জন্য আমি পাঠকদের অনুরোধ করব।' (*Totemism and Exogamy* I preface XII) অন্য মতটি গ্রহণ করলে যে অশেষ অসুবিধা এবং ভুল বোঝার সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন। অপরপক্ষে, অনেক গ্রন্থকার বহির্বিবাহকে টোটেমবাদের মূল বক্তব্যের অবশ্যম্ভাবী ফল বলেই মনে করেন।

ডার্কহাইম (Durkheim) তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন, টোটেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো টাবু, এই টোটেমভুক্ত কোনো নারীর সঙ্গে যৌনসম্ভোগের নিষেধাজ্ঞার সাথে কেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মানুষের সঙ্গে টোটেমের একই রক্ত-সম্পর্ক এবং এই কারণে রক্ত-নিষেধেই (কুমারিত্বনাশ ও রজস্বলা সম্পর্কে) একই টোটেমভুক্ত নারীর সঙ্গে যৌনসম্ভোগের অন্তরায়।[৩৯] অ্যান্ড্রু ল্যাঙ (Andrew Lang) ডার্কহাইমের সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত। তিনি এখনও বিশ্বাস করেন যে, একই আদিম জাতির মধ্যে নারী সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞার জন্য রক্ত নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না। যেমন, যে টোটেম-নিয়ম অনুসারে টোটেম-বৃক্ষের ছায়ায় বসা যে-কোনো লোকের পক্ষে অপরাধ বলে গণ্য হয়, সেই সাধারণ নিয়মই এক্ষেত্রেও কার্যকর হতে পারত। অ্যান্ড্রু ল্যাঙ বহির্বিবাহের ওপর আর একটি টীকা করার পক্ষপাতী (নিম্নে দ্রষ্টব্য) এবং এই দুইটি পুরনো ব্যাখ্যার মধ্যে যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে সে-বিষয়েও তিনি সন্দিহান।

সময়ের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, অধিকাংশ লেখকের মতে বহির্বিবাহের তুলনায় টোটেমবাদ সংস্থাটি প্রাচীন, বহির্বিবাহ পরবর্তীকালের।

যেসব সিদ্ধান্তে টোটেমবাদ ছাড়াই বহির্বিবাহের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যেগুলিতে অজাচার সমস্যার প্রতি লেখকদের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে কেবলমাত্র সেইগুলিই এখানে উল্লেখযোগ্য।

ম্যাকলেন্নান (Mac Lennan)[৪০]-এর ধারণা এবিষয়ে খুব স্পষ্ট। তিনি মনে করেন যে, নারীধর্ষণের প্রাথমিক রূপনির্দেশক আচার বা প্রথার ধ্বংসাবশেষ থেকেই

---

৩৯. Wundt, Elemente dervölker—Psychologie, p. 190.

৪০. Primitive Marriage, 1865.

বহির্বিবাহ প্রথার উৎপত্তি হয়েছে। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, নতুন কোনো আদিম জাতি দেখলে তাদের মধ্য থেকে নারী সংগ্রহ করাটা একটি প্রাচীন প্রথা ছিল। এইভাবে ক্রমশঃ একই জাতির মধ্যে বিবাহ করাটা 'অস্বাভাবিক বলে অসমীচীন' হয়ে পড়েছিল। জন্মকালেই কন্যাসন্তানকে হত্যা করার প্রথাজনিত কারণে এইসব জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের অভাব ঘটে। এই কারণটিকেই ম্যাকলেন্নান বহির্বিবাহ প্রথার কারণ বলে ধরে নেন। ম্যাকলেন্নানের অনুমানকে প্রকৃত তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় কিনা সে বিচার বর্তমানে আমরা করতে চাই না, আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো একটি জাতির পুরুষরা তাদের মুষ্টিমেয় স্ত্রীলোকের মধ্যে নিজেদের রক্ত সঞ্চারিত করা অসম্ভব বলে মনে করল কেন? এর কোনো ব্যাখ্যা এইসব প্রকল্পের মধ্যে নেই। ঐ সঙ্গে অজাচার সমস্যাটি যেভাবে উপেক্ষিত হয়েছে, তা কেন হলো আমাদের জানা দরকার।[৪১] অপর পক্ষে অন্যান্য লেখকরা মনে করেন, এইটাই বেশী সমীচীন, অজাচার প্রতিরোধ করার অস্ত্র হিসাবেই বহির্বিবাহ প্রথার ব্যাখ্যা হওয়া উচিত।[৪২]

আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার বিবাহবিধির ক্রমবর্ধমান জটিলতার পরীক্ষা করে দেখি তাহলে মর্গান, ফ্রেজার, হিউইট (Hewitt) এবং বলডুইন (Baldwin) স্পেন্সারের মতের সঙ্গে একমত হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। এঁদের মতে ফ্রেজার যেমন বলেছেন এই ব্যবস্থাগুলি হচ্ছে 'ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনা'র স্মারক ও চিহ্ন এবং এগুলির ক্ষেত্রে যা-যা ঘটেছে তাতে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছে।

এমন একটি কঠিন সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব হোত না বলেই মনে হয়।[৪৩]

প্রথম যখন শ্রেণী-বিবাহ শুরু হলো তখন অধস্তন বংশধরদের মধ্যে যৌন স্বাধীনতা খর্ব হলো, এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থাৎ ভাইবোন ও মাতাপুত্রের অজাচার সম্পর্ককে বেশি করে আঘাত করল। কিন্তু পিতা-পুত্রী সম্পর্কে ভালবাসা, কেবলমাত্র আইনগতভাবে রহিত হলো।

সে যাই হোক, বহির্বিবাহ সংক্রান্ত যৌন-নিষেধের সঙ্গে আইনের কি সম্বন্ধ তার সন্ধান করলে এই সংস্থাটি যে-উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয়েছে সেই উদ্দেশ্যকে বুঝতে আমাদের কোনো সুবিধা হবে না। বহির্বিবাহের উৎপত্তি কোথায় জানতে হলে, অজাচার ভীতির উৎস কোথায় শেষপর্যন্ত সেইটা আমাদের জানতেই হবে। রক্ত-সম্পর্কীয় লোকেদের প্রতি সহজ প্রবৃত্তিবশত যৌনক্রিয়ার প্রতি বিরাগের অর্থাৎ অজাচার ভীতির সৃষ্টি হয়েছে এরকম ব্যাখ্যা খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে, এই সহজ প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে অজাচার বিরল নয় এবং দেখা যায় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অজাচারীর বিবাহকে নিয়ম বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এমন নজিরও ইতিহাসে রয়েছে।

---

৪১. Frazer, l.c., p. 73 to 92.

৪২. প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনীয়।

৪৩. Frazer, l.c., p. 106.

ওয়েস্টারমার্ক (Westermarck)[৪৪] অজাচার ভীতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এইরকম, শিশুকাল থেকে যারা একসঙ্গে বসবাস করে তাদের পরস্পরের মধ্যে যৌন-সঙ্গমের প্রতি স্বাভাবিকভাবে বিতৃষ্ণা থাকে। এবং যেহেতু এমন লোকদের মধ্যে রক্ত-সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী সেজন্য এই বিতৃষ্ণা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে যৌনসঙ্গমের প্রতি ঘৃণার মাধ্যমে নানা প্রথা ও নিয়মের সৃষ্টি করে এটিকে স্বাভাবিক করে নিয়েছে। হ্যাভলক এলিস্ (Havlock Ellis) তাঁর *Studies in psychology of sex* পুস্তকে ওয়েস্টারমার্ক উল্লিখিত বিতৃষ্ণার সহজ প্রবৃত্তি প্রকৃতির বিরোধিতা করলেও অন্যান্য দিক থেকে ওয়েস্টারমার্কের ব্যাখ্যার মূলনীতিকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন: 'যেখানে ভাইবোন কিংবা ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে শিশুকাল থেকে বাস করে তাদের ক্ষেত্রে সঙ্গম-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশের অভাবকে বিশুদ্ধ নঞর্থক (negative) ঘটনা বলা যেতে পারে। কারণ এইসব পরিস্থিতিতে সঙ্গম-প্রবৃত্তির উদ্রেক করার জন্য যেসব পূর্ববর্তী অবস্থার প্রয়োজন হয় সেরূপ অবস্থার সম্পূর্ণ অভাব থাকে···। কারণ যেসব ব্যক্তি শিশুকাল থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে পরস্পরকে দেখা, শোনা, স্পর্শ করার মধ্যে যে কামজ আকর্ষণ থাকে, অভ্যাসের বশে তা ভোঁতা হয়ে যায় এবং এর ফলে সঙ্গমকালীন প্রস্তুতির জন্য যে কামীয় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার অভাব-বশত পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা কেবল একটা সুপ্ত আসক্তিতে পর্যবসিত হয়।

জীববিদ্যায় বলছে, জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে প্রজনন সীমিত থাকলে প্রজাতির ক্ষতি হয়। সেই সঙ্গে ওয়েস্টারমার্ক বলেছেন, শিশুকালে একসঙ্গে বসবাস করার জন্য স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যৌনক্রিয়ার প্রতি সহজাত বিরাগ জন্মে। ওয়েস্টামার্কের এই ধারণাটি যেন জীববৈজ্ঞানিক সত্যের মানসিক রূপ—আমার মনে হয় এই বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয়। রক্ত-সম্পর্কীয়দের ক্ষেত্রে অন্তঃপ্রজনন ক্ষতিকারক, এটা জীববিজ্ঞানসম্মত; কিন্তু রক্ত-সম্পর্ক ছাড়া ঘরের অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেও জীববৈজ্ঞানিক সহজ প্রবৃত্তির প্রভাব অনিষ্টকারক হবে তা কি সম্ভব? এ সম্বন্ধে ওয়েস্টারমার্কের মতের বিরুদ্ধে ফ্রেজারের সমালোচনা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না।

আজকের দিনে যৌন অনুভূতি ঘরোয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে যৌনক্রিয়ার বিরোধী নয়, অথচ অজাচার ভীতি, যা সঙ্গমের অনিচ্ছার একটি অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়, আজ সেইটাই দুর্মনীয় হয়ে পড়েছে এ-কথা ফ্রেজার চিন্তাই করতে পারেন না। ফ্রেজারের অন্যান্য মন্তব্যগুলি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। টাবু পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আমার যুক্তির সঙ্গে তাঁর যুক্তি মূলত অভিন্ন, তাই তাঁর মন্তব্যগুলি সংক্ষিপ্ত না করেই আমি নীচে তুলে দিচ্ছি:

'মানুষের কোনো গভীর সহজ প্রবৃত্তিকে কেন আইনের ধারা সুরক্ষিত করতে হয় তা সহজবোধ্য নয়। পান-আহারের ব্যাপারে কিংবা আগুনে হাত দেওয়া থেকে নিরস্ত করার জন্য মানুষের উপর কোনো আইন জারি করা হয় না। মানুষ খায়দায় ও আগুনে হাত দেওয়া থেকে নিরস্ত থাকে, সহজ প্রবৃত্তিবশেই। এই সহজ প্রবৃত্তির

৪৪. Origin and Development of Moral Conceptions, Vol. II: Marriage (1909). এখানে প্রচলিত আপত্তির বিরুদ্ধে লেখকের আত্মপক্ষ সমর্থন দ্রষ্টব্য।

বিরুদ্ধাচরণের অনিবার্য ফলস্বরূপে সে শাস্তি পায়, আইনের দ্বারা নয়। মানুষের সহজ প্রবৃত্তি তাকে যে-কাজ করতে প্ররোচিত করে কেবল সেই সব কাজ থেকে নিরস্ত করার জন্যই আইন। প্রকৃতি নিজেই যাতে বাধা দিতে পারে বা শাস্তি দিতে পারে সেখানে আইনের সাহায্যে শাস্তি দেওয়া বা সংযত করা বাহুল্যমাত্র। অতএব, যেসব অপরাধের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে সেইসব অপরাধ নিবারণের জন্যই আইন প্রযুক্ত হয়ে থাকে, এ-কথা আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি। অপকর্ম করার এরকম প্রবণতা যদি না-থাকত তাহলে অপরাধের কোনো প্রশ্নই উঠত না এবং যদি কোনো অপরাধ কেউ না-করত তাহলে অপরাধ থেকে নিরস্ত করার কথা ওঠে কি করে? অতএব অজাচার নিষেধকে আইনের চোখ দিয়ে না দেখে, অর্থাৎ অজাচারের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক বিরাগ আছে এ-কথা মনে না করে আমাদের মনে করা উচিত যে, অজাচারের প্রতি একটি স্বাভাবিক ঝোঁক আছে এবং আইন তাকে দমন করে। কারণ সুসভ্য লোক মনে করে যে, যদি এই প্রবৃত্তিকে দমন না করা যায় তাহলে সমাজের পক্ষে তা হানিকর হবে।'[৪৫]

ফ্রেজারের এই মূল্যবান যুক্তির সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের অভিজ্ঞতা যুক্ত করে বলতে পারি যে, অজাচারীর সম্পর্কের প্রতি এই প্রকার সহজাত বিরাগ একেবারেই অসম্ভব। বরং দেখা যায় উল্টোটাই। শিশুদের প্রাথমিক যৌন-আবেগ সব সময়ই অজাচারীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং এই অবদমিত আবেগই যে পরবর্তী জীবনে উদ্‌বায়ু রোগের কারণ সেকথা বলাই বাহুল্য।

অতএব সহজাত সহজ প্রবৃত্তি যে অজাচার ভীতির কারণ এই ব্যাখ্যা বাতিল করা উচিত। আর একটি বহুজন সমর্থিত ব্যাখ্যা, যথা—আদিম জাতিরা বহু আগেই লক্ষ করেছিল যে অন্তঃপ্রজনন তাদের জাতির ক্ষতিসাধন করছে এবং তখনই তারা সজ্ঞানে এই অজাচার-নিষেধ আইন প্রবর্তন করেছিল—এই ব্যাখ্যাটিকেও বাতিল করা উচিত। এই ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আপত্তির অন্ত নেই।[৪৬] অজাচার-নিষেধ সমস্ত গৃহপালিত পশুর প্রজনন অপেক্ষা প্রাচীন তো বটেই তা ছাড়া বংশধর-বৈশিষ্ট্যের প্রতি অন্তঃপ্রজননের ফলাফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা মানুষ গৃহপালিত পশুর কাছ থেকেই পেয়েছে। কিন্তু এই অন্তঃপ্রজননের কুফল আজও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি, আর মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রমাণ করা তো আরোই কঠিন। এ ছাড়া বর্তমান কালের বর্বর জাতীয়দের মধ্যে যা দেখা যায় তাতে বহু পূর্ববর্তী পূর্বপুরুষরা যে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভালমন্দের চিন্তা করত এমন ধারণা খুবই অসম্ভব বলে মনে হয়। এই ধরনের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুপ্রজনন সম্বন্ধীয় বিবেচনা আমাদের সভ্যতার মধ্যেই যখন বিরল, তখন এইসব অসভ্য জাতিরা, যারা আগামীকালের ভাবনা পর্যন্ত ভাবত না, তারা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য যে এ পরিমাণ ভাবিত হোত এ-ধারণা নেহাতই হাস্যোদ্দীপক।[৪৭]

---

৪৫. l.c., p. 97.

৪৬. ডার্কহাইমের La Prohibition de l' Incest (L'annee Sociologique, I, 1896-97).

৪৭. চার্লস ডারউইন, বর্বর জাতিদের সম্বন্ধে বলেছেন—'তারা তাদের সন্তান সন্ততিদের ভাবী বিপদ-আপদের কথা চিন্তা করে না বলেই মনে হয়।'

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, আমাদের সমাজ অজাচারকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখে তার সম্যক ব্যাখ্যার পক্ষে অন্তঃপ্রজনন যে জাতির দুর্বলতার কারণ হতে পারে, এমন যুক্তি যথেষ্ট নয়। কারণ এ-যুক্তি ব্যবহারিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের চিন্তাপ্রসূত। আমি অন্যত্র দেখিয়েছি,[৪৮] এই অজাচার বিভীষিকা সভ্য সমাজের তুলনায় আজকের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে প্রবল ও সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে।

অজাচার ভীতির কারণ নির্ধারণ করার সময় এখানেও সমাজবৈজ্ঞানিক, জীববৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যকেই জীববৈজ্ঞানিক প্রভাবের প্রতিনিধি হিসাবে ধরে নিতে হবে। তবুও সব শেষে ফ্রেজারের হতাশাব্যঞ্জক বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলতেই হয় যে, অজাচার ভীতির মূল কারণ কি তা আমরা জানি না, এমনকি অনুমান করতেও পারি না। এই হেঁয়ালির সমাধানের জন্য আজ পর্যন্ত যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার কোনোটাই সন্তোষজনক নয়।[৪৯]

অজাচার ভীতির মূল কারণের ব্যাখ্যা দেবার আর একটি প্রচেষ্টার কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব ব্যাখ্যার কথা বলা হয়েছে এটি তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে।

এই প্রচেষ্টা মানুষের সামাজিক পদমর্যাদার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে চার্লস ডারউইনের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। উচ্চ শ্রেণীর বানরদের অভ্যাসের ধারা দেখে তিনি মনে করেন, মানুষও প্রথম যুগে ছোট ছোট দল বেঁধে বাস করত এবং দলের সবচেয়ে বয়স্ক ও শক্তিশালী ব্যক্তির ব্যাভিচার-সংশয় যৌন-স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতা খর্ব করেছে। 'প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পুরুষ চতুষ্পদ প্রাণীদের অনেকেরই দেহে বিশেষ প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্র আছে। এইসব পুরুষ-চতুষ্পদের ব্যাভিচার-সংশয় সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় যথেচ্ছ যৌন-সঙ্গম ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম···। অতএব আজকের দিনের মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা বিবেচনা করে যদি আমরা বহু প্রাচীনকালের কথা চিন্তা করি তাহলে যা সবচেয়ে সম্ভব বলে মনে হয়, তা হচ্ছে, তখনকার কালে মানুষ একটি, কিংবা বেশি শক্তিশালী হলে, একাধিক স্ত্রী নিয়ে ছোট ছোট দল বেঁধে বাস করত, কিংবা হয়ত সে সামাজিক জীব ছিল না কিংবা হয়ত সে গরিলাদের মতো কয়েকটা স্ত্রী নিয়ে বাস করত, কেননা, যে-কোনো দলের মধ্যে কেবলমাত্র একটি পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষকেই দেখা যায়, এ কথা প্রত্যেক আদিবাসীই স্বীকার করবে। যখন কোনো নবীন পুরুষ বড় হয়ে ওঠে তখনই প্রভুত্বের লড়াই শুরু হয় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষদের হয় হত্যা করে নতুবা তাদের বিতাড়িত করে নিজে সেই দলের দলপতিত্বে অধিষ্ঠিত হয়। (Dr. Savage in Boston—Journal of Natural History, Vol. V, 185-87, দ্রষ্টব্য।) অল্পবয়স্ক পুরুষেরা এইভাবে তাড়িত হয়ে যতত্র ঘুরতে ঘুরতে শেষে যখন একটি সঙ্গিনী সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় তখন

---

৪৮. প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৯. অতএব বহির্বিবাহের মূল উদ্দেশ্য এবং সেইসঙ্গে অজাচারীয় নিরম-কানুনগত-সমস্যা কেননা, আচার নিবারণের জন্যই বহির্বিবাহের প্রচলন করা হয়—পূর্বের মতো যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল।—Totem and Exogamy I. p. 165.

তার এইভাবে সাথী নির্বাচনের দ্বারাই নিজের পরিবারের গণ্ডির মধ্যে কোনো ব্যক্তির সহিত প্রজনন ব্যাহত হয়।[৫০]

ডারউইনের এই দলপ্রধান মতবাদের শর্তগুলি যে কার্যত যুবকদের মধ্যে বহির্বিবাহের প্রবর্তক হতে পারে সেই বিষয়টি সম্ভবত অ্যাট্‌কিনসন (Atkinson)[৫১] সর্বপ্রথম সমর্থন করেন। এইভাবে প্রত্যেকটি বিতাড়িত নবযুবক শেষে এক একটি দল সংগঠন করেছে এবং সর্বপ্রধান দলপতির ব্যাভিচার-সংশয়ের কল্যাণে সর্বদলেই যৌন-সঙ্গমের বিরুদ্ধে একই নিষেধ বলবৎ হয়েছে, কালে এই শর্তগুলি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আজ সেইগুলি হয়েছে আইন, যথা, একই দলের কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যৌন-সঙ্গম নিষিদ্ধ। টোটেমবাদ প্রবর্তন হবার পর এই নিয়ম ভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে, যথা, একই টোটেমের মধ্যে যৌন-সঙ্গম নিষিদ্ধ।

অ্যান্ড্রু ল্যাঙ[৫২] বহির্বিবাহের এই ব্যাখ্যাকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ঐ একই পুস্তকে তিনি ডার্কহাইমের অন্য মতটিকেও সমর্থন করেছেন। এই মতটি হলো টোটেম নিয়মাবলির ফলস্বরূপ বহির্বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাখ্যাকে যুক্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। প্রথম ব্যাখ্যাটির অর্থ হলো টোটেমবাদের আগেই বহির্বিবাহের চলন ছিল এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হলো টোটেম-নিষেধ প্রবর্তনের ফলে বহির্বিবাহ প্রথার চলন হয়েছে।[৫৩]

০

এই অন্ধকারের মধ্যে একটিমাত্র আলোকশিখা আমরা মনঃসমীক্ষণের কল্যাণে দেখতে পাই।

আদিম মানুষ শিশু ও পশুর মধ্যে অনেক মিল লক্ষ করেছে। পূর্ণ বয়স্ক সভ্য মানুষ তার নিজের প্রকৃতিও অন্যান্য প্রাণীর প্রকৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদচিহ্ন টেনে যখন গর্বিত বোধ করে তখন শিশুর মধ্যে সেই গর্বের কণামাত্র দেখা যায় না।

---

৫০. The Origin of Man, Vol. II Chap. 20.pp. 603-4.

৫১. Primal Law, London, 1903 (Andrew Lang, social origin).

৫২. The Secret of the Totem, pp. 143, 144.

৫৩. ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী যদি মেনে নেওয়া যায় যে, টোটেম নিয়মাবলি প্রবর্তনের জন্য 'পবিত্র' অনুমোদন পাবার আগেই বহির্বিবাহ প্রথা চালু ছিল, তাহলে আমাদের কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে প্রথমতম কার্যকর নিয়ম হবে নবযুবকের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ পিতার আদেশ; 'আমার তাঁবের কোনো স্ত্রীলোককে স্পর্শ করবে না, করলে নির্বাসন দণ্ড। 'কালে সেই নিয়ম অভ্যস্ত হয়ে' দাঁড়াল, 'স্থানীয় দলের কোনো মেয়েকে বিবাহ করা চলবে না'। তারপর ধরা যাক, এই দলগুলির এক-একটি নাম দেওয়া হলো, যেমন—এম্‌, বায়ন Opossums (আমেরিকার একপ্রকার পাখি), কাদাখোঁচা প্রভৃতি। এবং নিয়মটিও বদলে দাঁড়াল, 'কোনো জীববিশেষের নামধারী দলের পক্ষে সেই দলের কাউকে বিবাহ করা চলবে না'। যদি সেই সময়েও প্রধান প্রধান দলগুলির মধ্যে বহির্বিবাহ চালু না হয়ে থাকে তাহলে স্থানীয় ছোট ছোট দলগুলির প্রাণী, গাছ বা অন্যান্য নাম থেকে যখনই টোটেমীয় অতিকথা এবং টাবুর উৎপত্তি হয়েছে তখনই বহির্বিবাহ চালু হয়েছে।—Secret of the Totem, p. 143। যাই হোক, অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙ এ বিষয়ে (Folklore, December 1971) তাঁর শেষ বক্তব্য বলেছেন যে, 'সাধারণ টোটেমীয়' টাবু থেকে বহির্বিবাহের উৎপত্তি হয়েছে, এই ব্যাখ্যাটি তিনি নাকচ করেছেন।

তখন শিশু নির্বিবাদে পশুকে সমগুণী বলে মনে করতে পারে। যে মানুষ শিশুর চাওয়া-পাওয়ার অনুমোদন করার মালিক, সেই অদ্ভুত লোকটির তুলনায় শিশু বোধহয় পশুকে তার নিকটতর আত্মীয় বলে মনে করে।

শিশু এবং পশুর মধ্যে এই মধুর সম্বন্ধের মধ্যে কিন্তু অদ্ভুত রকমের অসুবিধা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। হঠাৎ সে কোনো এক জাতীয় প্রাণীকে ভয় করতে শুরু করে এবং এই জাতীয় ভয়ংকর প্রাণীকে যাতে দেখতে ও ছুঁতে না হয় সেজন্য নিজে দূরে দূরে থাকে। এইরকম ব্যবহার পশুভীতি রোগের একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ। এই বয়সের সমস্ত বায়ুরোগের মধ্যে এই অসুখটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এইটিই সম্ভবত বায়ুরোগের প্রথমতম রূপ। দেখা যায়, কোনো প্রাণী সম্বন্ধে এই যে ভয় সেই প্রাণীটি এক সময়ে শিশুর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু এ দ্বারা মনে করা উচিত হবে না যে, ঐ বিশেষ প্রাণীটির সঙ্গে শিশুর এই ভীতির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। শহরে ভয় পাবার মতো প্রাণী যথেষ্ট নেই। এখানে আছে ঘোড়া, কুকুর বিড়াল—পাখির সংখ্যা তো আরোই কম। এবং ছারপোকা জাতীয় কীট, প্রজাপতির মতো প্রাণীও আশ্চর্য রকম কম। কখনো কখনো ছবির বইয়ের বা রূপকথার পশুপাখি শিশুর মনে একটা অর্থহীন এবং অজ্ঞাত দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে—এই ভীতির মাধ্যমে সেইগুলি প্রকাশ পায়। কি করে যে কোনো প্রাণী সম্বন্ধে এই দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় তার কারন কদাচিৎ পাওয়া যায়। ড. কার্ল আব্রাহাম (Dr. Karl Abraham) একটি ঘটনা বিবৃত করেছেন, এজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এই ঘটনায় একটি শিশু নিজেই ভিমরুল সম্বন্ধে তার ভয়ের কারণ ব্যাখ্যা করেছে। শিশুটি বলেছে—বাঘ সম্বন্ধে সে যা-কিছু শুনেছে তাই থেকে তার মনে বাঘ সম্বন্ধে যে ভয় জন্মেছে, ভিমরুলের রঙ ও তার গায়ের ডোরাগুলি দেখে তার সেই বাঘের কথা মনে পড়ে যায়।

জীবভীতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত সামীক্ষণিক গবেষণা আজও শুরু হয়নি। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হবার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা এই বিষয়টির রয়েছে। এত কচি বয়সের শিশুদের সমীক্ষণ করার অসুবিধার জন্যই বোধ হয় এই বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। অতএব এ ধরনের রোগের কারণ আমাদের জানা আছে, এ-কথা জোর করে বলা যায় না। এবং একই অর্থ যে সবসময় খাটবে তাও আমি মনে করি না। তবে বৃহৎ জন্তুর ভয়ের বহুসংখ্যক ঘটনার সমীক্ষণ সম্ভব হয়েছে এবং সমীক্ষকের কাছে তাদের গূঢ় রহস্য ধরা পড়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণটা দেখা গেছে একই ঃ শিশু যদি বালক হয় তাহলে দেখা গেছে ভয়ের মূল হচ্ছে—বাবাকে ভয়। এই ভয় জন্তুর উপর অভিক্রান্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে জন্তু-ভয়।

সমীক্ষণ সম্বন্ধে যার যতটুকুই অভিজ্ঞতা থাক এমন ঘটনা তিনি নিঃসন্দেহে লক্ষ করেছেন এবং একই ধারণা তাঁরও নিশ্চয়ই হয়েছে। তবে আমি এ-সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি রিপোর্টের বিষয় বিবরণ এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই সব ঘটনার বিবরণের মধ্যে এগুলিকে অঘটন বলা যেতে পারে। তাই বলে কেবলমাত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণের উপাদানেই আমাদের এই সাধারণ উক্তির ভিত্তি হবে এমন উপসংহার করা চলে না। উদাহরণস্বরূপ আমি একজন লেখকের (M. Wulff of Odessa) কথা

উল্লেখ করছি। ইনি খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে শিশুকালীন বায়ুরোগের আলোচনা করেছেন। তিনি একটি অসুখের বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন যে, একটি নয় বৎসর বয়স্ক বালক চার বছর বয়স থেকে কুকুরকে ভয় করে আসছে। "সে যখন কোনো কুকুরকে রাস্তায় দৌড়ে যেতে দেখে তখন সে কাঁদে আর চিৎকার করে বলতে থাকে: 'লক্ষ্মীটি, কুকুর তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, আমি ভালো হব'। এই 'ভালো হব'র অর্থ হচ্ছে 'আর কখনো লিঙ্গ নিয়ে খেলা করব না'।" (স্বমেহন অভ্যাস)[৫৪]

পরে এই লেখকই নিম্নোক্তরূপে উপসংহার করেছেন: "তার এই কুকুর ভীতির আসল অর্থ হলো পিতৃ-ভীতি, তা কুকুরের উপর অভিক্রান্ত হয়েছে। শিশুর অদ্ভুত বাচন: 'কুকুর, আমি ভালো হব'—অর্থাৎ, আমি পাণিমেহন করব না—এ-কথা আসলে বাবাকেই বলা হচ্ছে, কেননা তিনি পাণিমেহন করতে নিষেধ করেছিলেন"। তারপর তিনি একটি মন্তব্য যুক্ত করেছেন যেটি আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে হুবহু এক এবং সেই সঙ্গে এইরকম অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য সম্বন্ধেও এটি একটি সাক্ষ্যস্বরূপ; আমার মনে হয় এরকম ভীতি (ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, মুরগীর বাচ্চা এবং অন্যান্য গৃহপালিত জীব) শিশুকালে নিদ্রিত অবস্থায় বুকচাপা কষ্টের মতোই ব্যাপক। এই ভীতি পিতা বা মাতার যে-কোনো একজনের ভয় থেকে অন্য কোনো প্রাণীর ওপর অভিক্রান্ত হয়, এই সত্য সমীক্ষণকালে উন্মোচিত হয়েছে। তাই বলে সর্বজনবিদিত সাধারণ ইঁদুর ও গেছো ইঁদুরের ভয়ের কারণ যে একই হবে তা আমি জোর করে বলতে চাই না।

আমি 'একটি পাঁচ বছর বয়সের বালকের আতঙ্কের সমীক্ষণ'[৫৫] প্রকাশ করেছি। বালকটির পিতা এই ছোট্ট রোগীটিকে আমার হাতে দিয়েছিলেন। বালকটি ঘোড়া দেখে আঁৎকে উঠত, যার ফলে সে রাস্তায় বেরতে পারত না। তার ভয় হোত ঘোড়াটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে এবং তাকে কামড়ে দেবে। এটা তার কু-ইচ্ছার শাস্তি। অতএব এইজন্য তার ইচ্ছা হোত ঘোড়াটা উল্টে পড়ে যাক (মরে যাক)। যখন তাকে আশ্বাস দেওয়া হলো যে, বাবার কাছ থেকে তার ভয়ের কোনো আশঙ্কা নেই তখন দেখা গেল তার বাবার অবর্তমান অর্থাৎ প্রস্থান বা মৃত্যু হোক এই ইচ্ছার সঙ্গে সে লড়াই করছে। সে খুব সরল মনেই বলল যে, তার যৌন-ইচ্ছামুকুল যে-মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হবার অস্পষ্ট পূর্বভাস সে অনুভব করেছিল সেই মায়ের আনুকূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সে তার বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। অর্থাৎ মাতাপিতার প্রতি পুরুষ-শিশুর যে মনোভাবকে আমরা 'ঈডিপাস গুটেষা বলি এবং যার মধ্যে বায়ুরোগের জড় আমরা খুঁজে পাই এই শিশুটির মনোভাব তাই ছিল। এই ছোট্ট 'জন-এর সমীক্ষণের দ্বারা যে সত্য আমরা জানলাম তা টোটেমবাদের দিক থেকে বেশ মূল্যবান। যথা, এমন অবস্থায় শিশু তার মনোভাবের খানিকটা বাবার উপর থেকে উঠিয়ে কোনো পশুর প্রতি আরোপ করে।

৫৪, M. Wulff, 'Contributions to Infantile Sexuality', Zertralbl. F. Psychoanalyze, 1912, II, No. 1. p. 15.

৫৫. Gesammelte Schriften, vol. VIII English translation, in Collected Papers, Vol, III.

মৌলিক ও আকস্মিক উভয়প্রকারের অনুষঙ্গের পথই সমীক্ষণ দেখিয়ে দিয়েছে, যার মাধ্যমে এই অভিক্রান্তি ঘটেছে। এর থেকে অভিক্রান্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও অনুমান করা যায়। মায়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশত যে ঘৃণারজন্ম হয় তার ফলে বালকের মানসিক জীবন বাধাগ্রস্ত না হয়ে পারে না। প্রথম থেকেই এই প্রতিদ্বন্দ্বী পিতাকে সে প্রেম এমনকি শ্রদ্ধাও নিবেদন করে এসেছে। অতএব শিশুকে তার বাবার প্রতি দুটি প্রক্ষোভীয় মনোভাব অর্থাৎ উভয়বলীয় মনোভাবের আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং এই উভয়বলীয় দ্বন্দ্বের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বাবার কোনো-এক প্রতিকল্পের প্রতি তার আক্রমণাত্মক ও উৎকণ্ঠিত মনোভাবকে অভিক্রান্ত করেছে। একদিকে মনের এই টান এবং অন্যদিকে আক্রমণাত্মক মনোভাব এই দুয়ের মধ্যে আপস করে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করা কিন্তু অভিক্রান্তির দ্বারা সম্ভব হয়নি। বরং যাকে অভিক্রান্তির আধার করেছে তার প্রতি দ্বন্দ্ব থেকেই গেছে এবং তার প্রতি উভয়বলতাও বিস্তৃতি লাভ করেছে। ছোট্ট 'জন' ঘোড়াকে শুধু যে ভয়ই করত তা নয়, ঘোড়ার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল। যখন তার ভয়টা কমত তখন সে ভয়ংকর জীবটির সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলত। তখন সে ঘোড়ার চারদিকে ঘোড়ার মতোই লাফালাফি করত এবং তখন সে নিজেই বাবাকে কামড়াত।[৫৬] ফোবিয়া।সমাধানের আর একটি পর্যায়ে সে বাবাকে আরো প্রকাণ্ড জন্তুর সঙ্গে এক করে দেখতেও দ্বিধা করেনি।[৫৭]

শিশুদের এই পশুভীতির মধ্যে টোটেমবাদের কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ নঞর্থক রূপ নিয়ে ঘুরে আসে, এরকম ধারণা আমরা করতে পারি। কিন্তু এস. ফেরেঞ্জি (S. Ferenezi) তাঁর যে একটি সুন্দর পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন সেজন্য আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এই ঘটনাটি শিশুর মধ্যে সদর্থক (positive) টোটেম-বাদের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৫৮]

বালক অর্পাদ (Arpad)-এর উল্লেখ করে ফেরেঞ্জি যে বলেছেন, টোটেমীয় ব্যাপারে আকর্ষণ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে ঈডিপাস গুটেষার সরাসরি যোগ নেই, আছে স্বকামীয় ব্যাপারে, অর্থাৎ উপস্থছেদের ভয়ের সঙ্গে—সে কথা ঠিকই। ছোট্ট 'জন'-এর ইতিহাস যিনিই মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করবেন তিনিই প্রচুর প্রমাণ পাবেন যে, বাবার উপস্থটি খুব বড় বলে মনে হওয়ায় বাবাকে 'জন'-এর অত ভালো লাগে এবং নিজের উপস্থ-ব্যাপারে শাসনের ভয়ের জন্যই সে বাবাকে অত ভয় করে। ঈডিপাস গুটেষা এবং উপস্থছেদন গুটেষা উভয় ক্ষেত্রেই পিতার ভয় শিশুকালীন যৌন আকর্ষণের ক্ষেত্রে শঙ্কাজনক প্রতিদ্বন্দ্বীর মতোই শিশুর জীবনে কাজ করে থাকে। উপস্থচ্ছেদ বা তার বদলে অন্ধত্ব স্বীকার করাই হচ্ছে তার শাস্তি।[৫৯]

---

৫৬. I.c., p. 41.

৫৭. 'The Phantasy of the Giraffe, I.c., p, 30.

৫৮. S. Ferenezi, Contributions to Psychoanalysis, p. 204. Ernes Jones কৃত অনুবাদ। (Badeger, Bostan, 1916).

৫৯. উপস্থছেদনের জন্য ঈডিপাস কাহিনীর মধ্যে অন্ধত্বের প্রতিকল্প সম্বন্ধে, Reüler Ferenezi, Rank ও Eder-এর বক্তব্য তুলনীয়। Intern, Zeitschrift f. artzl. Psychoanalyze, 191 No. 2.

ছোট্ট অর্পদ-এর বয়স যখন আড়াই বছর, সেই সময়ে গ্রীষ্মাবাসে থাকাকালীন সে যখন একটি মুরগীর খাঁচার মধ্যে প্রস্রাব করার চেষ্টা করে তখন একটি ছোট্ট মুরগী তার উপস্থটি কামড়ে দেয় বা ঠুকরে দেয়। এক বছর পরে অর্পদ যখন আবার সেই জায়গায় আসে তখন সে নিজেই মনে মনে মুরগীরমতো হয়ে গেছে। মুরগীরখাঁচাটার প্রতি এবং সেখানে আর যা-কিছু ঘটেছে সেই সবের প্রতি তার সবচেয়ে আগ্রহ এবং মানুষের ভাষা ছেড়ে দিয়ে কেবল মুরগীর ডাক সে ডাকতে থাকে। পর্যবেক্ষণ কালে, যখন তার বয়স পাঁচ বছর তখন আবার তার মুখে ভাষা ফুটল। কিন্তু তখন সে কেবলমাত্র শিশু মুরগী ও অন্যান্য মুরগীর কথাই বলত। সে তখন এমন কোনো খেলনার জিনিস নিয়ে খেলত না বা এমন কোনো গান গাইত না যার মধ্যে মুরগী বা মুরগি সংক্রান্ত কোনো-না কোনো বিষয় না থাকত। তার টোটেমের প্রতি ব্যবহার ছিল দ্বিধাজড়িত। তার আচরণের মধ্যে ঘৃণা ও ভালবাসা অস্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ত। শিশু মুরগীকে হত্যা করাতেই ছিল তার অপার আনন্দ। মুরগী হত্যা করা তার কাছে একটা উৎসব। মুরগীর মৃতদেহের চারদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সে মহা উল্লাসে নৃত্য করত।[৬০] কিন্তু তারপর সে মৃত জীবটিকে ধরে চুমো খেত এবং আদর করে চাপড়াতে থাকত। যার প্রতি সে দুর্ব্যবহার করেছে তার মৃত দেহটাকে সে সস্নেহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করত।

'অর্পদ' নিজেই বুঝতে পেরেছিল যে, তার এই অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ চাপা থাকবার নয়। মাঝে মাঝে সে তার ইচ্ছার প্রকাশকে টোটেমীয় পদ্ধতি থেকে টেনে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এনে ফেলত। বলত, 'এখন আমি ছোট্ট, এখন আমি শিশু মুরগী। আমি যখন বড় হব তখন আমি হব মুরগী। যখন আমি আরো বড় হব, তখন আমি হব মোরগ।' অন্য কোনো এক সময়ে আবার সে হয়ত বলত, ঐ 'রান্না-মা' (pottcd mother অর্থাৎ বড় মুরগীর রান্না মাংস) খেতে তার খুব ইচ্ছা করে। তার নিজের জননেন্দ্রিয় নিয়ে মশগুল থাকার জন্য তাকে যেমন ভয় দেখানো হোত তেমনি সেও খোলাখুলিভাবে অন্যদের উপস্থছেদনের ভয় দেখাতে খুব ওস্তাদ ছিল।

মুরগীর খামারের কাণ্ডকারখানার প্রতি ছেলেটি এত আগ্রহশীল হওয়ার কারণ সম্বন্ধে ফেরেঞ্জির কোনো সন্দেহই ছিল না, 'ঐ স্থানে মোরগ ও মুরগীর সদাসর্বদা যৌনক্রিয়া, ডিমপাড়া এবং ডিম থেকে বাচ্চা হওয়া'[৬১] তার যৌন কৌতূহল তৃপ্ত করেছিল এবং তা আসলে পারিবারিক জীবনের দিকে প্রচলিত হয়েছিল। সে যখন তার প্রতিবেশীকে বলছে, 'আমি তোমাকে এবং তোমার তিন বোনকে বিয়ে করব, এবং আমার তিনজন জ্ঞাতি বোনকে এবং রাঁধুনীকেও—না রাঁধুনীর বদলে আমি আমার মাকে বিয়ে করব' তখন বুঝতে হবে যে, তার পাত্রী নির্বাচন ঐ মুরগীর জীবনযাত্রা অনুযায়ী হয়েছে।

এইসব পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আমরা পুরোপুরিভাবে পরে বলতে

৬০. S, Ferenezi, l.c., p. 209.
৬১. S. Ferenezi, l.c., p. 212.

পারব। আপাতত এখানে কেবলমাত্র দুটি গুণের (Traits) কথা উল্লেখ করব, যাদের সঙ্গে টোটেমবাদের খুব ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায়। একটি হচ্ছে, টোটেম প্রাণীর সঙ্গে পূর্ণভাবে একাত্মীকরণ[৬২] এবং অন্যটি হল—টোটেম প্রাণীর প্রতি দ্বিধাগ্রস্ত আধুনিক মনোভাব। এইসব পর্যবেক্ষণ অনুসারেই পুরুষের টোটেমবাদ ফরমুলার ক্ষেত্রে টোটেম প্রাণীকে আমরা নিশ্চয়ই পিতার প্রতিনিধি হিসাবে ধরতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে, এমন মনে করার মধ্যে কোনো নতুন বা বিশেষ দুঃসাহসিকতা কিছু নেই। কেননা আদিম লোকেরা নিজেরাই এ-কথা বলে এবং আজও যেসব টোটেম প্রথা প্রচলিত রয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে টোটেমকে আদিপুরুষ হিসাবে গণ্য করা হয়। আমরা এইসব জাতির একটি বাক্য আক্ষরিকভাবেই কেবল গ্রহণ করেছি, সে-কথাটি নিয়ে জাতিতত্ত্ববিদ্‌রা কি করবেন তা ভেবে না পেয়ে তাকে নেপথ্যে ফেলে রাখাই সাব্যস্ত করেছিলেন। অপর পক্ষে, এই বিষয়টির উপরই জোর দেওয়া সম্বন্ধে এবং টোটেমবাদের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এই বিষয়টিকে যুক্ত করার ব্যাপারে মনঃসমীক্ষণ আমাদের সতর্ক করে দেয়।[৬৩]

আমাদের প্রতিকল্প নির্ধারণের প্রথম ফল অতি চমৎকার। টোটেম প্রাণীটি যদি পিতার প্রতীক হয়, তাহলে টোটেমবাদের দুটি প্রধান অনুশাসন—দুটি টাবু-নিয়ম যা এর কেন্দ্রস্থল—যথা, টোটেম প্রাণীকে হত্যা না-করা এবং রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যে একই টোটেমভুক্ত কোনো স্ত্রীলোককে ব্যবহার না-করা, এই দুটি ঈডিপাসের দুটি অপরাধের আধেয়ের সঙ্গে মিলে যায়। এই ঈডিপাস তার পিতাকে হত্যা করেছিল যাকে তার স্ত্রী করেছিল। এবং আরো মিল দেখা যায়—শিশুর দুটি আদিম বাসনার সঙ্গে শিশুর অসম্পূর্ণ অবদমন বা তার পুনর্জাগরণ খুব সম্ভবত সমস্ত উদ্‌বায়ু রোগের কেন্দ্রস্থল। এই সাদৃশ্য যদি কেবলমাত্র দুর্ঘটনার ছলনা ছাড়াও বেশি কিছু হয় তাহলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের টোটেমবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করা আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ঈডিপাস গুটেষা সংক্রান্ত অবস্থা থেকেই টোটেম ব্যবস্থার উৎপত্তি। ঠিক যেমনটি 'ছোট্ট জন'-এর পশুভীতি এবং 'ছোট্ট অর্পদ'-এর মুরগীর প্রতি কামবিকৃতি ঈডিপাস গুটেষা থেকেই ঘটেছিল—এই সম্ভাবনাকে সফল করে তুলতে পারব। এই সম্ভাবনা ধরে সন্ধান করতে হলে আমাদের, যাকে বলে টোটেম ব্যবস্থার বিশেষত্বর কিংবা বলা যায়, টোটেমীয় ধর্মের গবেষণা, আমাদের করতে হবে। এই বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে।

---

৬২. ফ্রেজার মনে করেন, এই একাত্মীকরণের মধ্যেই রয়েছে টোটেমবাদের আসল কথা। তিনি বলেছেন, 'টোটেমবাদের সঙ্গে কোন মানুষের একাত্মীকরণই হল টোটেমবাদ।'—Totemism and Exogamy, IV, p. 5.

৬৩. এই সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করার জন্য আমি Otto Rank-এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই ঘটনাটি একটি বুদ্ধিমান লোকের কুকুর-ভীতি সম্পর্কে। লোকটি কী করে এরকম ভীতিগ্রস্ত হলো সেই কাহিনীর সঙ্গে উপরি-উক্ত Aruntas-এর টোটেম তত্ত্বের আশ্চর্য রকমের মিল দেখা যায়। সে তার বাবার কাছে শুনেছিল যে, কোনো এক সময়ে অন্তসত্ত্বা অবস্থায় তার মাকে কুকুর দিয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল।

৪

ডব্লু. রবার্টসন স্মিথ (W. Robertson Smith) মারা গেছেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ্, বাইবেল সমালোচক, প্রত্নতত্ত্ববিদ ঃ এবং একজন বিশারদ ও উদার ধর্মমতাবলম্বী মানুষ। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Religion of the Semites* নামক গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথাকথিত টোটেম-ভোজ নামে একটি অদ্ভুত উৎসব গোড়া থেকেই টোটেমীয় ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে। তাঁর এই ধারণার সপক্ষে তাঁর হাতে তখন যে প্রমাণ ছিল তা হচ্ছে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রচলিত এরকম কাজের একটি বিবরণ। তিনি অবশ্য জানতেন কেমন করে প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত বলিদানের প্রকৃতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর ধারণার প্রতি উচ্চ মানের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে হয়। উচ্চ মার্গের ধর্মীয় কর্ম থেকে তার নিম্নতম স্তর টোটেমবাদ পর্যন্ত আলোচনা করে দেখা যায় বলিদান একটা দেবতুল্য লোকের অস্তিত্বের বিশ্বাস অনুযায়ী।

আমি এখন রবার্টসন স্মিথ (Robertson Smith)-এর অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তকখানি থেকে বলিদানের আবিষ্কার ও তার অর্থ এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উক্তিগুলি আমাদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করবে সেইগুলি এখানে উল্লেখ করব। আকর্ষণীয় হলেও আমি খুঁটিনাটি বিষয়গুলি থেকে খুব বেশি উল্লেখ করব না, এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী কালের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত অংশগুলিও বাদ দেব। এইরূপে সংক্ষিপ্তসার দিয়ে পাঠকদের কাছে বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল করা বা মূল রচনার যুক্তির জোর বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

রবার্টসন স্মিথ দেখিয়েছেন যে বেদিমূলে বলি দেওয়া প্রাচীন ধর্মব্যবস্থার মধ্যে একটি অবশ্যকরণীয় প্রথা। সব রকমের ধর্মের মধ্যে এর কাজ একই প্রকার। সুতরাং যেখানে কাজের ফলাফল একই সেইসব ক্ষেত্রের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি সাধারণ কারণ হিসাবে এর অস্তিত্বের সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই উৎসর্গ বা বলিদান, এই পবিত্র প্রক্রিয়া আদিতে বর্তমান অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ বোঝাত—দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁকে উপহার দেওয়া, কিংবা তাঁকে দয়া পরবশ করার জন্য চেষ্টা করা। পরে এই শব্দের অপব্যবহার দ্বারা স্বার্থত্যাগ বলে গৌণ এক অর্থের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রথম বলি বা নৈবেদ্য 'দেবতা ও পূজারী এই দুয়ের মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজ' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

খাদ্য ও পানীয় বস্তু উপহার হিসাবে আনা হোত। মাংস, দানা, শস্য, ফলমূল, মদ ও তেল যা খেয়ে নিজেরা জীবন ধারণ করত সেই সবই মানুষ ঈশ্বরকে নিবেদন করত। কেবলমাত্র উৎসর্গীয় মাংস সম্বন্ধে ব্যতিক্রম ও নিয়মের বাঁধাধরা ছিল। দেবতা পূজারীদের সঙ্গে একই পশুমাংস ভক্ষণ করতেন, আর উদ্ভিদ দ্রব্য তাঁর একার জন্যই দেওয়া হোত। পশুবলি যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং কোনো সময়ে পশুবলিই যে একমাত্র বলির উপহার ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। উদ্ভিদ দ্রব্য বলি দেওয়ার প্রথা ভূমির প্রথম ফল উপহার দেওয়া থেকেই শুরু হয়েছে। এবং

তা ভূমির দেবতাকে খাজনা দেওয়ারই সামিল। কিন্তু কৃষিকাজের তুলনায় পশুবলি প্রাচীন।

দেবতাকে যে বলির উপচার দেওয়া হোত সেটা যে তাঁর সত্যিকারের খাদ্য তার প্রমাণ ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়। ক্রমশ দেবতা যখন বস্তু-নিরপেক্ষ হয়ে উঠলেন তখন এই ধারণা আপত্তিকর হয়ে ওঠে, এবং তখন দেবতাকে খাদ্যের কেবল তরল অংশটুকু দেওয়া হয়। পরে আগুন ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বলির মাংস যখন বেদি থেকে ধোঁয়া রূপে শূন্যে উঠল তখন এই আগুনের সাহায্যে মানুষের খাদ্যকে দেবতার ভোগের জন্য আরো উপযোগী করে তৈরি করা সম্ভব হলো। পানীয় উপচার আগে ছিল বলিদানের পশুর রক্ত। এই রক্তের পরিবর্তে পরে মদ ব্যবহৃত হয়েছে। আদিম অধিবাসীরা আগে মদকে বলত—'আঙুরের রস'। এ-কথা আমাদের কবিরা আজও বলে থাকেন।

অতএব আগুনের ব্যবহার জানার এবং কৃষিকাজ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান হবার বহু-পূর্বে পশুবলি দেওয়ারই প্রচলন ছিল, এবং এই বলিদানের পশুর রক্ত-মাংস দেবতা ও ভক্ত সকলে একসঙ্গে মিলে ভক্ষণ করত। এর মধ্যে একই খাদ্য উভয়ে মিলে গ্রহণ করাটা ছিল অপরিহার্য।

এই বলিদানের ব্যাপারটা ছিল সর্বসাধারণের উৎসব, সমস্ত গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান। সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানই ছিল সাধারণের অনুষ্ঠান। ধর্মকর্ম করাটা ছিল একটা সামাজিক কর্তব্যকর্ম। সমস্ত জাতির মধ্যেই বলিদান ও উৎসব এই দুই কাজ একসঙ্গেই হয়ে থাকে। আর বলিদান মানেই ছুটি, বলিদান ছাড়া কোনো ছুটির অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। এই বলিদান উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোনো ব্যক্তির মনের আগ্রহ আনন্দের মাধ্যমে ঊর্ধ্বগামী হোত এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে ও দেবতাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হোত।

সর্বজনীন বলি ভোজের নৈতিক শক্তির মূলে ছিল সকলে মিলে একসঙ্গে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার তাৎপর্য সম্বন্ধে আদিম ধারণা। একসঙ্গে সকলে মিলে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা ছিল একটা প্রতীক, এবং এই সঙ্গে সামাজিক বন্ধনকেও পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধকে স্বীকৃতি দেওয়ার উপায়। ঈশ্বর এবং তার উপাসকরা যে একই সমাজভুক্ত তা এই বলিদান ভোজের দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত। এইভাবে এই প্রথা উভয়ের মধ্যে যাবতীয় সম্পর্ককে সমর্থন করে। মরুভূমির আরবদের মধ্যে আজও যে-প্রথা প্রচলিত রয়েছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে, একসঙ্গে একই খাদ্য খাওয়ার জন্য যে সংঘশক্তি তা ধর্মীয় শক্তি নয়, পরন্তু এইভাবে খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমেই পরবর্তী কালে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ জন্মেছে। এইরূপে বেদুইনদের সঙ্গে বসে যে-কেউ সামান্য এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করেছে, কিংবা তার এক ঢোঁক দুধ পান করেছে তার আর ঐ ব্যক্তিকে শত্রু মনে করে ভয় করবার কোনো হেতু নেই, বরং তাকে বিপদে রক্ষক ও সহায়ক হিসাবে গণ্য করে নিশ্চিন্ত হতে পারে। তাই বলে এই সম্পর্ক চিরকালের জন্য স্থায়ী হবে না। সঠিক করে বললে বলতে হয়, যে পর্যন্ত ঐ অন্ন তার পেটে স্থায়ী হবে সেই পর্যন্তই এই সম্পর্ক টিকে থাকবে। এই সম্পর্ককে স্থায়ী রূপ দিতে

হলে পুনরাবৃত্তির দ্বারা ঐ মিলনসূত্রকে দৃঢ় করা দরকার; এতই বাস্তব বুদ্ধি প্রণোদিত এই মিলনভোজ।

কিন্তু একসঙ্গে খাদ্য পানীয় গ্রহণের মধ্যে কেন এই সংঘশক্তি জড়িত? অতি আদিম সমাজের মধ্যে একটিমাত্র শর্তহীন এবং অব্যর্থ বন্ধন আছে, তা হলো জ্ঞাতিত্বে। সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরস্পর সংঘীভূত হয়ে বা খণ্ড খণ্ড রূপে যুক্ত থাকে, একদল লোক যাদের জীবন বাস্তবে এরকমভাবে একীবন্ধ যে তাদেরকে একই সাধারণজীবনের বিভিন্ন অংশ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, এরাই হচ্ছে জ্ঞাতি। অতএব জ্ঞাতিদের মধ্যে একজনকে হত্যা করলে তারা বলবে না যে, অমুকের রক্তপাত হয়েছে, বলবে আমাদের রক্তপাত হয়েছে। যে হিব্রু প্রবাদবাক্য দ্বারা আদিম জাতির পরস্পর সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা হচ্ছে, 'তুমি আমার অস্থি, তুমি আমার মাংস'। অতএব জ্ঞাতিত্বের অর্থ হচ্ছে সমগ্রতারই অংশমাত্র। এই জ্ঞাতিত্বের ভিত্তি যে শুধু আমরা গর্ভধারিণী মায়ের সত্তার অংশ বলে বা তাঁর স্বাস্থ্যদায়িনী স্তনদুগ্ধের জন্য তা নয়, এ ছাড়া পরবর্তীকালে যে খাদ্য খেয়ে আমাদের শরীরের সংগঠন হয়েছে তাও জ্ঞাতিত্ব অর্জনে ও তাকে শক্তিশালীকরণে সাহায্য করেছে, এরূপ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যদি কেউ তার দেবতার খাদ্যের অংশীদার হয় তাহলে তার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, তার দেবতার ও তার নিজের শারীরিক উপাদান একই। এইজন্য কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে একত্রে খাদ্য গ্রহণ বর্জনীয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বলির খানাপিনা আসলে ছিল জ্ঞাতিবর্গের ভোজ। নিয়ম অনুসারে জ্ঞাতি ছাড়া আর কেউ এই ভোজে অংশগ্রহণ করবে না। আমাদের সমাজে ভোজনই পরিবারের সকল ব্যক্তিকে এক জায়গায় টানে। কিন্তু বলির ভোজের সঙ্গে পারিবারিক ভোজনের কোনো সম্পর্ক নেই। জ্ঞাতিত্ব পারিবারিক জীবন থেকেও প্রাচীন। যতদূর জানা যায়, বিভিন্ন জ্ঞাতিত্বের বন্ধনে যুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠনই হচ্ছে প্রাচীনতম পরিবার। পুরুষেরা অজানা গোষ্ঠীর স্ত্রীলোকদের বিয়ে করেছে এবং সন্তান সন্ততিরা পুরুষানুক্রমে মায়ের গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে পরিবারের অন্য সভ্যদের কখনো জ্ঞাতিবন্ধনের সৃষ্টি হয়নি। এরকম অবস্থায় কখনো পরিবারের সকলের জন্য একই আহার্য ছিল না। এমনকি এখনও বর্বর জাতীয়েরা একা ভিন্নভাবে আহার্য গ্রহণ করে এবং খাদ্য সম্বন্ধে টোটেমবাদের ধর্মীয় বিধিনিষেধের জন্য স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আহার করা প্রায় অসম্ভব।

এখন বলিদানের পশুটির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। শোনা যায় যে, পশুবধ ছাড়া জ্ঞাতিদের কোনো সমাবেশ হোত না। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এমন গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান ছাড়া কখনও পশুবধও করা হোত না। লোকে ফল, শিকারের মাংস এবং গৃহপালিত পশুর দুধ বিনা দ্বিধায় খেয়েছে, কিন্তু ধর্মীয় নিষেধ থাকায় নিজের ব্যবহারের জন্য পালিত পশুকে হত্যা করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। রবার্টসন স্মিথ বলেছেন,—ইহা সন্দেহাতীত যে প্রত্যেকটি বলি আদিতে গোষ্ঠীর বলি। এবং কোনো বলিদানের **পশুকে বধ করা আদিতে যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এরূপ বলিদান তখনই সম্ভব হোত যখন গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত লোক তার দায়িত্ব গ্রহণ করত।** আদিম মানুষেরা কেবল

একই শ্রেণীর কাজ করতে পারত, যে-কাজের সঙ্গে সারা গোষ্ঠীর একই রক্তের পবিত্রতার সম্পর্ক থাকত। যে জীবনের অবসান কোনো একজন ব্যক্তি ঘটাতে পারে না, এবং তা করতে গেলে গোষ্ঠীর সমস্ত ব্যক্তির সম্মতি দরকার হয় সেরকম জীবন ত গোষ্ঠীরই একজন ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে সমান। বলিদানের ভোজে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই নিহত পশুর মাংস অবশ্য ভক্ষণীয়; এই প্রথার অর্থই হলো যে, গোষ্ঠীর একজন যে অপরাধ করেছে সে দায় গোষ্ঠীভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ বলিদানের পশুটিকে গোষ্ঠীভুক্ত একজন বলে গণ্য করা হয়েছে। বলি দিচ্ছে যে-সমাজ সেই সমাজের দেবতা এবং বলির পশু একই রক্ত-সম্পর্কীয় এবং একই গোষ্ঠীর সভ্য।

রবার্টসন স্মিথ বহুপ্রমাণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, বলির পশু ও টোটেম পশু উভয়ে একই পরবর্তী যুগে দেখা যাচ্ছে বলিদান দু রকমের,—এক হচ্ছে গৃহপালিত পশুর বলি, যার মাংস সচরাচর ভক্ষণ করার চল ছিল, এবং অন্য আর এক বলি, যা সচরাচর ঘটে না, অশুচি বলে নিষিদ্ধ। আরো অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, এই অশুচি প্রাণীটিই পবিত্র বলে গণ্য হয়েছে। এইসব প্রাণীদের সেইসব দেবতার কাছে বলি দেওয়া হয় যাদের কাছে এরা পবিত্র। এই প্রাণীরা আদিতে ঐসব দেবতার সঙ্গে একাত্মীকৃত ছিল এবং বলিদানকালে ভক্তেরা কোনো এক উপায়ে ঐ প্রাণী ও দেবতার সঙ্গে তাদের নিজেদের রক্ত-সম্পর্ক জাহির করত। কিন্তু আরো আগের যুগে সাধারণ ও 'রহস্যপূর্ণ' (mystic) বলির মধ্যে পার্থক্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। আদিতে সব পশুই পবিত্র বলে গণ্য হোত। তাদের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; হয়ত আর সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে কেবলমাত্র গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেটা ভক্ষিত হোত।

গৃহপালিত পশুদের পোষ মানানো এবং পশুর বংশবৃদ্ধির জন্য প্রাচীনকালের শুদ্ধ এবং কঠোর নিয়মানুভুক্ত টোটেমবাদ লুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়।[৬৪] কিন্তু আজও গৃহপালিত পশুদের প্রতি যে পবিত্রতা সংযুক্ত হয়ে রয়েছে, যাকে 'গ্রাম্য-ধর্ম' বলা যেতে পারে, তার মধ্যে টোটেমীয় বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্টই লক্ষ করা যায়। এমনকি আরো পরবর্তীকালে, ক্লাসিক্যাল যুগে—বলিদানের পর ঘাতকের দৌড়ে পালানোর প্রথা অনেক স্থানে দেখা যায়; এ যেন প্রত্যাঘাতকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। ষাঁড়কে হত্যা করা সত্যিকারের পাপ কাজ, এমন ধারণা এককালে গ্রীসে নিশ্চয় সকলে বিশ্বাস করত। বোফেনিয়ার এথেনীয় উৎসবে বলিদান কালে উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে হাজির থাকতে হুকুম করা হোত, বলিদানের পর দস্তুর মতো বিচারসভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিচারে শেষপর্যন্ত অপরাধ বলিদানের খাঁড়ার ওপরে আরোপ করা হোত এবং ঐ অস্ত্রটিকে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দেওয়া হোত।

একজন জ্ঞাতি হিসাবে পশুটিকে হত্যা করা পাপ, এই ভয় থাকা সত্ত্বেও মাঝে

---

৬৪. নজির হচ্ছে যে, টোটেমবাদ যে গৃহপালনের সূত্রপাত করেছে (যখন যে-কোনো পশুকে পোষ মানানো যায়) সেই গৃহপালনই টোটেমবাদের সর্বনাশের কারণ হয়েছে।'
Jevous Introduction to the History of Religion, 1911, Fifth Edition, p. 120.

মাঝে কোনো পবিত্র স্থানে তাকে হত্যা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং তার রক্তমাংস গোষ্ঠীভুক্ত সকল ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এইরকম কাজের পিছনে যে মনোভাব রয়েছে তা বলিদানের তাৎপর্যের নিগূঢ় অর্থকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। আমরা শুনেছি যে পরবর্তীকালে প্রত্যেকটি সর্বজনীন ভোজে যে-বস্তু তাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে সে-বস্তুর অংশ গ্রহণের দ্বারা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি পবিত্র বন্ধনের সৃষ্টি হয়। অতি প্রাচীন যুগে মনে হয়, কেবলমাত্র বলিদানের পবিত্র রক্তমাংস সম্বন্ধেই এরকম ধারণা প্রযুক্ত ছিল। **কেবলমাত্র এই উপায়েই সেই পবিত্র বন্ধন স্থাপন করা যায়, অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরকে এবং সকলকে তাদের দেবতার সঙ্গে একসূত্রে বাঁধতে পারে, এইভাবে বলিদানের রহস্যকে সমর্থন করা হোত।**[৬৫]

এই বন্ধনসূত্র বধ্য প্রাণীর জীবন ছাড়া আর কিছুই নয়। যে জীবন রয়েছে তার রক্তে মাংসে এবং বলিদান অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সকলেই ভোজের মাধ্যমে সেই রক্তমাংস ভক্ষণ করেছে। আরো পরবর্তী যুগে মানুষ যে রক্ত-সম্পর্কের মাধ্যমে পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ সেসবের মূলেই রয়েছে এমনএকটি ধারণা। বস্তুর সঙ্গে একাত্মীকরণের মতো রক্ত-সম্পর্কের বাস্তব ধারণা থেকেই বলিদান উৎসব ভোজের মতো বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাঝে মাঝে এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তার তাৎপর্য অনুভব করা যায়।

আমরা রবার্টসন স্মিথ-এর চিন্তাধারা থেকে আর উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করব না, এখন তাঁর বক্তব্যের একটা নির্যাস এখানে দেব। যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা উঠল তখন বলিদান দেবতার কাছে উপহার হিসাবে গণ্য হলো, যেন মানুষের সম্পত্তি থেকে দেবতার সম্পত্তিতে হস্তান্তর। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় বলিদানের আনুষ্ঠানিক আচারাদির বৈশিষ্ট্যকে বাদ দেওয়া হয়। অতি প্রাচীনকালে বলির পশু নিজেই ছিল পবিত্র এবং সকল ব্যক্তিই অংশগ্রহণ করত এবং তারা এজন্য পাপের ভাগও নিত। গোষ্ঠীর সকল সভ্যই নিশ্চিত ছিল যে ভোজের খাদ্যের মাধ্যমে তারা পরস্পরের সঙ্গে এবং তাদের দেবতার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বলিদান হচ্ছে একটা ধর্মানুষ্ঠানএবং বলিদানের পশু, গোষ্ঠীরই একজন। বাস্তব ক্ষেত্রে এটা পুরনো টোটেম প্রাণী, প্রত্যক্ষ আদিম দেবতা, যাকে হত্যা করে এবং যার রক্তমাংস ভক্ষণ করে গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা পুনর্জীবন লাভ করেছে এবং দেবতার সঙ্গে নিজেদের একাত্মীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে।

বলিদান সম্পর্কে এইরকম ব্যাখ্যা থেকে রবার্টসন স্মিথ উপসংহার করলেন যে,—যখন **নরত্বারোপিত দেবতাকে পূজ্যপাদ মনে করা হোত** তারও আগে কখনো কখনো টোটেম প্রাণী হত্যা ও ভক্ষণ টোটেম ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। তাঁর বিশ্বাস এইরকম টোটেম ভোজের জাঁকজমক পরবর্তীকালে আমাদের মধ্যে বলিদান হিসাবে রয়ে গেছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে সিনাই (Sinai) মরুভূমির

৬৫. l.c., p. 313.

বেদুইনদের একটি বলিদান প্রথার কথা বলেছেন সেণ্ট নিলাস (Saint Nilus)। বলির পশুটি হচ্ছে একটি উট। উটটি বাঁধা অবস্থায় কঠিন পাথরে বধ্যভূমির উপর পতিত। আদিম জাতির দলপতির আদেশে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা গান গাইতে গাইতে বধ্যভূমির চারিদিকে তিনবার ঘুরে এল। দলপতি উটটির দেহে প্রথম অস্ত্রাঘাত করল, এবং বিচ্ছুরিত রক্তধারা লোভাতুরের মতো পান করল। তারপর ঐ সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক পশুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্পমান মাংসপিণ্ডকে তাদের তরবারি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে সেই কাঁচা মাংস এত দ্রুত খেয়ে ফেলল যে—শুকতারা ওঠার পর থেকেই, যে শুকতারার জন্যই এই বলিদান—সূর্যের আলোর আভায় তা মিলিয়ে যাবার আগেই ঐ বলির পশুটির মাংস, চর্ম, হাড় এবং নাড়ী-ভুঁড়ি—সব কিছুই উদরস্থ হয়ে গেল। যে-কোনো প্রামাণ্যের নজিরে এই বর্বরোচিত প্রথা (এ যে বহু প্রাচীন প্রথা তা সহজেই অনুমেয়) কিন্তু বিরল নয়। এটি টোটেম বধের একটি সাধারণ আদিরূপ, যা পরবর্তীকালে বহুরূপে রূপান্তরিত হয়েছে।

টোটেম ভোজের এই ব্যাখ্যাকে অনেক লেখক কোনো গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেছেন, কারণ টোটেমবাদের সমসাময়িক কালের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা এই ধারণাকে সমর্থন করা যায় না। রবার্টসন স্মিথ কতকগুলি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এইগুলি বলিদানের ধর্মীয় ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ দেয়। যেমন অ্যাজটেকস্ (Aztecs) ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষবলির বিষয়, যা টোটেম ভোজের নিয়মকানুনকে স্মরণ করিয়ে দেয়; আমেরিকার আউয়াটাউয়াকস্ (Ouatoouaks)-দের শূকর গোষ্ঠীর শূকর ভোজের কথা এবং জাপান দেশের আইনো (Ainos)-দের শূকর ভোজের কথা। ফ্রেজার সাহেব এইসব এবং অন্যান্য গোষ্ঠী সম্বন্ধে তাঁর শেষ প্রকাশিত বিখ্যাত পুস্তকে[৬৬] বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার এক আদিম জাতি বৃহদাকার একপ্রকার শিকারী পাখিকে (Buzzard) পবিত্র বলে মনে করে। এই পাখিকে বছরে একদিন আড়ম্বরের সঙ্গে হত্যা করে। এই অনুষ্ঠানে পাখিটির জন্য শোক প্রকাশ করা হয় এবং তার ছাল ও পালক সংরক্ষণ করা হয়। নিউ মেক্সিকোর জনি-ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী তাদের পূজ্য কাছিম নিয়েও ঐ একই রকম অনুষ্ঠান করে থাকে।

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের 'ইনতিচিউমা (Intichiuma) উৎসবে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে যেটা রবার্টসনের অনুমানের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। প্রত্যেক জাতি, যারা তাদের টোটেমের বৃদ্ধির জন্য ম্যাজিকের ব্যবহার করে থাকে এবং যে টোটেমকে ভক্ষণ করা তাদের নিষিদ্ধ, কোনো উৎসবের সময় অন্য জাতিদের কেউ স্পর্শ করার আগে সেই টোটেমেরই একাংশ ভক্ষণ করা তাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। ফ্রেজারের মতে ধর্মগত কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠান ব্যতীত ভক্ষণীয় নয় এমন টোটেমের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায় পশ্চিম আফ্রিকার বিনি (Bini) জাতির কবর দেওয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে।[৬৭]

---

৬৬. The Golden Bough, Part V ; Spirits of the Corn and of the Wild, 1912, ও Eating of the God and Killing Divine Animal—দ্রষ্টব্য।

৬৭. Frazer, Totem and Exogamy, Vol. II. p. 590.

যাই হোক, ধর্মগত সংস্কারমূলক হত্যা এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ টোটেম পশু ভক্ষণ হচ্ছে টোটেম ধর্মের একটি বিশেষ লক্ষণ, রবার্টসনের এই ধারণাকেই আমরা গ্রহণ করব।[৬৮]

৫

এখন এমন একটি টোটেম ভোজের দৃশ্য অনুধাবন করা যাক ; এবং সেইসঙ্গে, আগে সম্যকভাবে আলোচনা করা যায়নি এমন কতকগুলি সম্ভাব্য উপাদান দিয়ে একে সুষ্ঠুতর করার চেষ্টাও করা যাক। আনুষ্ঠানিকভাবে টোটেমকে হত্যা করে, রক্ত মাংস হাড় সমেত তাকে ভক্ষণ করে এরকম আদি মানব গোষ্ঠী আমরা দেখেছি। সেইসঙ্গে এরকম গোষ্ঠীর সভ্যরা এমনভাবে টোটেমের অনুকরণের দ্বারা আত্মগোপন করে এবং টোটেমের ডাক ও চাল-চলন অনুকরণ করে যা দেখে মনে হয় যেন টোটেমের সঙ্গে যে তারা অভিন্ন সেইটাই জোরের সঙ্গে প্রতিপন্ন করতে তারা সচেষ্ট। যে-কাজ গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি ব্যক্তির পক্ষে এককভাবেসম্পন্ন করা নিষিদ্ধ সেই কাজই সকলে মিলে সম্পন্ন করলে দোষ হয় না, যাতে টোটেম হত্যা ও টোটেম ভোজ থেকে গোষ্ঠীর কেউ যদি না যায়—এটাও আমাদের সম্যক উপলব্ধি হয়েছে। হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হবার পর মৃত জন্তুটির জন্য বিলাপ ও শোক প্রকাশ করা হয়। এই মড়াকান্নাটা অবশ্যই করণীয়, এটি প্রতিশোধাত্মক ভয়প্রসূত এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনুরূপ ঘটনা উপলক্ষে রবার্ট স্মিথ যে মন্তব্য করেছেন, যে হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা।[৬৯]

কিন্তু এই শোক প্রকাশের পরই শুরু হয় বন্ধনমুক্ত আবেগ সমন্বিত এবং সর্ব-প্রকারের বাসনা তৃপ্তির স্বাধীন জাঁকজমকপূর্ণ আনন্দোৎসব। এইখানেই আমরা ছুটির দিনের (holiday) অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সহজেই ধরতে পারি।

ছুটির দিন হচ্ছে এমন একটি দিন যখন বাড়াবাড়িটা মঞ্জুরযোগ্য শুধু নয়, এটাই নিয়ম ; যেদিন নিষেধাজ্ঞাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভঙ্গ করা হয়। মাত্রাধিক্যটাই ছুটির দিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ছুটির দিনে খোশ মেজাজে থাকাটাই নিয়ম হয়ে গেছে বলে লোকে সীমা লঙ্ঘন করে না, কারণ ছুটির দিনের মধ্যেই তোঅমিতাচারের স্বাধীনতা রয়েছে। অন্য সময়ে যা নিষিদ্ধ সেই নিয়ম শিথিল হলেই মনে ছুটির দিনের মেজাজ লাগে।

কিন্তু টোটেম প্রাণীর এই মৃত্যুশোকের সঙ্গে আর ছুটির দিনের মেজাজ সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক কি ? যে হত্যা অন্য সময়ে নিষিদ্ধ সেই টোটেমকে হত্যা করে যদি মানুষ আনন্দই পায় তবে তার জন্য আবার শোক তারা প্রকাশ করে কেন ?

আমরা শুনেছি যে টোটেম ভক্ষণ করে গোষ্ঠীর সভ্যরা পবিত্র হয় এবং টোটেম

---

৬৮. Merillier, Hubert, Mauss এবং অন্যরা বলিদান সম্বন্ধে এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি তুলেছেন যেসব কথা আমি জানি না তা নয়, কিন্তু Robertson Smith-এর তত্ত্বকে সত্যি করে নাকচ করতে পারেন নি।

৬৯. Religion of the Semites, Second Edition, 1907, p. 412.

প্রাণীর সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তাকে সুদৃঢ় করে ও নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে। টোটেমের দেহাংশ পবিত্র জীবনের দ্বারা সম্পৃক্ত এবং সেই উপাদান আত্মসাৎ করে তারা সেই পবিত্র জীবনের অংশীদার হয়। একথা সত্যি হলে ছুটির দিনের মেজাজ এবং তৎসংক্রান্ত সবকিছুর পরিণামের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

টোটেম প্রাণী আসলে পিতার প্রতিরূপ, এই সত্য মনঃসমীক্ষণ আবিষ্কার করেছে। এর সাহায্যে সাধারণভাবে টোটেম প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করা ছুটির উৎসবের দিনে তাকে হত্যা করা এবং তাকে হত্যা করে আবার তার জন্য বিলাপ করা, এই সমস্ত অসঙ্গতির একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যে উভয়বলি প্রক্ষোভীয় মনোভাব আজও আমাদের শিশুদের মনে পিতৃ-গুঢ়ৈষার পরিচায়ক এবং যা প্রায়ই বয়স্ক জীবনেও প্রসারিত হচ্ছে তা-ই পিতার প্রতিরূপ টোটেম প্রাণীর প্রতিও সম্প্রসারিত হয়।

মনঃসমীক্ষণ কর্তৃক টোটেমের এই ব্যাখ্যাকে যদি আমরা টোটেম ভোজ এবং ডারউইন-এর প্রকাশ অনুযায়ী মনুষ্য সমাজের আদিম অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করি তাহলে এ সম্বন্ধে গুরুতর অর্থবোধ সম্ভব হয়; এবং উদ্ভট মনে হলেও একটি প্রকল্প পেশ করা যায়, যার সাহায্যে বর্তমানের বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব।

আদিম গোষ্ঠীবদ্ধতা সম্বন্ধে ডারউইন-এর ধারণা অবশ্য টোটেমবাদের প্রারম্ভিক অবস্থায় খাটে না। সেই অবস্থায় পিতা প্রচণ্ড এবং হিংসাপরায়ণ ছিল। সে সমস্ত স্ত্রীলোককে নিজের দখলে রেখে সমস্ত উঠতি বয়সের ছেলেদের দূর করে তাড়িয়ে দিত। সমাজের এই আদিম অবস্থা কোথাও চাক্ষুষ করা যায়নি, যে আদিমতম সমাজের কথা আমরা জানি, যা এখনো কতকগুলি আদিবাসীর মধ্যে বর্তমান তা হলো, সমান অধিকারের অধিকারী পুরুষদের সংঘ (Association of men)। এই সংঘ টোটেমবাদের নিষেধাজ্ঞার অধীন, এবং মাতৃতন্ত্রের ওপর এর ভিত্তি বা মাতৃবংশ উদ্ভূত[৭০]। একটা কি অপরটার ফলস্বরূপ? এবং কি করে তা সম্ভব হলো?

টোটেম উৎসবের ওপর আমাদের যুক্তি প্রয়োগ করে আমরা এখন একটা উত্তর দিতে পারি: 'একদিন[৭১] বিতাড়িত ভ্রাতৃবৃন্দ সংঘবদ্ধ হলো, পিতাকে হত্যা করে তাকে ভক্ষণ করল; এবং এইভাবে পিতৃদলের নিধন হলো। এইভাবে একের পক্ষে যা অসাধ্য ছিল দলবদ্ধ হয়ে সেই অসাধ্য সাধন করল। হতে পারে কিছুটা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য, যেমন কোনো নতুন অস্ত্রের ব্যবহার, তাদের মনে এই শক্তিমত্তা সঞ্চারিত করেছে। অবশ্য এই নরখাদক বর্বররা তাদের শিকারকে ভক্ষণ করেছিল। এই দুর্ধর্ষ আদিম পিতা নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি ভাইয়ের কাছে ভয় এবং প্রতিহিংসার প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়েছিল। এখন সেই পিতাকে ভক্ষণ করে তার সাথে নিজেদের

---

৭০. এ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক রচনার জন্য G. T. Emmous প্রণীত The Whole House of the Chirkat (American Museum Journal, Vol, XVI, No. 7) দ্রষ্টব্য [Dr. A. A. Brill-এর মন্তব্য]।

৭১. পাঠক একটি ভুল ধারণা সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন, যে ধারণা পরবর্তী অধ্যায়ের শেষ বাক্যটিকে গ্রহণ করার জন্য এই ব্যাখ্যা থেকে মনে হতে পারে।

একাত্মীকরণ সম্পূর্ণ করল এবং প্রত্যেকেই পিতার শক্তির অংশভাগী হলো। টোটেম ভোজ, যা খুব সম্ভবত মানবজাতির সর্বপ্রথম উৎসব, বারবার ঘুরে আসবে এবং আমাদের মনে করিয়ে দেবে সেই স্মরণীয় অপরাধকর্মকে, যার সঙ্গে আরো কত কিছু —যেমন সামাজিক সংস্থা, নৈতিক বিধি-নিষেধ এবং ধর্ম, শুরু হয়েছিল।"[১২]

এইসব ফলাফল গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমাদের অনুমান ব্যতীত আর একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন। তা হচ্ছে যে, ভাইদের সংঘবদ্ধ দলগুলি পিতা সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হোত, যেটা আমরা আমাদের শিশু ও উদ্‌বায়ুদের মধ্যে পিতৃ-গুঁষোর উভয়বলতার উপাদান বলে প্রমাণ করতে পারি।

যৌন চাহিদা এবং কর্তৃত্ব করার ইচ্ছার দিক থেকে যে পিতা এত শক্তিশালী ছিল তাকে তারা ঘৃণা করত। পিতাকে অপসারণ করে তাদের ঘৃণাভাব সন্তুষ্ট হলে এবং পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণ করার ইচ্ছা পূরণ হলে মনের দমিত কোমল আবেগগুলির

---

১২. বিতাড়িত পুত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় অত্যাচারী পিতা পরাজিত ও নিহত হয়েছিল আপাত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর এই ধারণা অ্যাট্‌কিনসন্ (Atkinson) সমর্থন করেছেন। তিনি একে ডারউইনের আদি গোষ্ঠীর শর্তাবলির সরাসরি ফলস্বরূপ মনে করেন। 'ভাইদের একটি নবযুবকদল একসঙ্গে কৌমার্য অবস্থায় থাকতে কিংবা বড়জোর একটি মাত্র নারীর সঙ্গে বহুবল্লভের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। এমন গোষ্ঠী প্রাক যৌবন অবস্থায় স্বভাবতই দুর্বল থাকে, কিন্তু সময়কালে যখন তারা শক্তি সঞ্চয় করে তখন দলগতভাবে পুনঃ পুনঃ আক্রমণের দ্বারা তারা নিশ্চয়ই অত্যাচারী পিতার হাত থেকে জীবন ও নারী দুই আদায় করে নিয়েছে। **Primal Law**, ২২০–২১ পৃষ্ঠা। অ্যাট্‌কিনসন্ নিউ ক্যালিডোনিয়াতে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং আদিবাসীদের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা করার অসাধারণ সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ডারউইন আদি গোষ্ঠী সম্বন্ধে যেসব শর্তাবলী আরোপ করেছেন, সেই শর্তগুলি বন্য বিড়াল এবং বন্য ঘোড়ার মধ্যে খুব সহজেই লক্ষ করা যায়। এই জানোয়াররা মাঝে মাঝে পিতৃনিধনে বাহির হয়। তিনি আরো মনে করেন যে, গোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙন ধরেছে। পিতৃসংহারের পরে এইভাবে জয়ী পুত্রগণের মধ্যে তিক্ত লড়াইয়ের মাধ্যমে এক নতুন সামাজিকসংস্থা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে; যে পুত্রগণ এই একক অত্যাচারী পিতার প্রতি পুনঃ পুনঃ দুর্ধর্ষ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল তাদেরই পিতৃহন্তা হস্ত শীঘ্রই ভ্রাতৃহত্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল (২২৮ পৃষ্ঠা))। মনঃসমীক্ষণের বক্তব্য অ্যাট্‌কিনসনের জানা ছিল না, তিনি রবার্ট স্মিথের গবেষণার কথাও জানতেন না, তাই তিনি আদি গোষ্ঠী থেকে পরবর্তীকালের সামাজিক অবস্থার, যখন বহু ব্যক্তি একসঙ্গে শান্তিতে বাস করছিল, পরিবর্তনকে ততটা প্রচণ্ড মনে করেননি। তিনি মাতৃপ্রেমকেই শান্তিপূর্ণ সমাজ সংগঠনের হেতু বলে মনে করেছেন। যে মাতৃপ্রেম সেদিন কেবল কনিষ্ঠ পুত্রকেই গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান দিয়েছিল এবং পরে অন্যরাও সেই গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এই পুত্ররাও প্রতিদানে যৌন ব্যাপারে পিতার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে এবং তাদের মা ও বোনদের প্রতি যৌন সম্বন্ধকে সংযত করেছে।

এই হলো অ্যাট্‌কিনসনের প্রখ্যাত তত্ত্ব, পূর্বোল্লিখিত তত্ত্বের সঙ্গে মূলত এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, এর জন্য এই তত্ত্বের আরো অনেক কিছু পরিত্যাগ করার প্রয়োজনও হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা যে অনিশ্চিত প্রকৃতির এবং এর মধ্যে মধ্যবর্তীকালীন সময়কে

যেন জোরদার হবার দরকার হয়ে পড়ে।[৭৩] এই ভাবগুলি তখন তীব্র অনুতাপের রূপ নিয়েছে, একটি অপব্যয়ভাব জন্ম নিয়েছে, যাকে আমরা এখানে সাধারণভাবে অনুতাপবোধ বলছি। জীবিতের তুলনায় মৃত বেশি শক্তিশালী হয়েছিল; এমনকি আজকে মানুষের ভাগ্য বিধানে আমরা যা দেখছি তার চেয়েও বেশি। যে-পিতৃকুলের উপস্থিতি আগে বাধাস্বরূপ ছিল আজ তারাই 'পরবর্তীকালীন আজ্ঞানুবর্তিতা' এই মানসিকতায় নিষেধাজ্ঞার রূপ নিয়েছে; মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে এরূপ সম্ভাব্যতা আমরা খুব ভাল করেই জানি। পিতৃ-প্রকল্প টোটেমকে বধ করা নিষিদ্ধ করে এবং তাদের কর্মপ্রচেষ্টার ফলস্বরূপ প্রাপ্তযুক্ত স্ত্রীলোকদের ভোগ না করে তারা নিজেদের কর্মকেই অস্বীকার করেছে। এইভাবে তারা পুত্রের অপরাধবোধের জন্য টোটেমবাদের দুটি মৌলিক টাবুর সৃষ্টি করেছে। এবং বিশেষ করে এই কারণেই ঈডিপাস গুটেষার দুটি অবদমিত ইচ্ছার সঙ্গে এদের মিল থাকতে বাধ্য। যে-কেহ অস্বীকার করেছে সেই কেবল এই দুটি অপরাধে অপরাধী হয়েছে, এবং আদিম সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করেছে।[৭৪]

টোটেমবাদের যে দুটি টাবু থেকে মানুষের নৈতিক জীবন শুরু হয়েছে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে তাদের মূল্য কিন্তু এক নয়। একটি অর্থাৎ টোটেম প্রাণীকে রেহাই দেওয়া নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে প্রক্ষোভীয় উদ্দেশ্যের ওপর। পিতা অপসৃত হয়েছে, এর প্রতিবিধান ইহজগতে আর কিছু নেই। কিন্তু দ্বিতীয়টির, অর্থাৎ সদাচার নিষেধের ক্ষেত্রে, একটা ব্যবহারিক ভিত্তি আছে। যৌন চাহিদা মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে না, পরন্তু এটা তাদের বিভেদ আনে। পিতাকে পরাস্ত করায় যদিও ভায়েরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকে প্রতিদ্বন্দ্বী হলো। তারা প্রত্যেকেই পিতার মতোই সকল স্ত্রীলোককে নিজের দলে রাখতে চেয়েছিল এবং একের বিরুদ্ধে অন্যের এই দ্বন্দ্বে তাদের নতুন সংস্থা বিনষ্ট হলো, কারণ তাদের মধ্যে কোনো একজন অন্য সকলের তুলনায় বেশি শক্তিশালী ছিল না যে পিতার স্থান নিজে দখল করতে পারত। ভাইয়েরা একসঙ্গে বসবাস করতে চাইলেও এইভাবে তাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকল না, একমাত্র অজাচার নিষেধ প্রবর্তন

উপেক্ষা করা হয়েছে সেকথা আমাকে বলতেই হয়। এবং বিষয়টির প্রকৃতি অনুযায়ী তার যা চাহিদা সেই তুলনায় উপাদানের গাদাগাদি সম্বন্ধে সংযমের অভাব থেকে গেছে। এইসব উপাদান থেকে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা সেই রকম অর্থহীন হবে যেমন এর থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু আশা করাটা হবে অসমীচীন।

৭৩. একথাও ঠিক যে, এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে কেউই তাদের কর্মের জন্য পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি; এর জন্যও তাদের এরকম প্রক্ষোভীয় মনোভাবের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এখনো বলা চলে যে, তাদের কর্মতৎপরতা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ পুত্রদের মধ্যে কেউই তাদের পিতার স্থান অধিকার করার যে মূল ইচ্ছা তা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু আমরা জানি অকৃতকার্যতা সফলতার চেয়ে নৈতিক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে বেশি অনুকূল।

৭৪. রক্ত (সম্পর্ক) সম্বন্ধে পবিত্র নিয়মের বিরুদ্ধে হত্যা এবং অজাচার, কিংবা অনুরূপ কোনো অপরাধ আদিম সমাজে অন্য সমস্ত অপরাধের মধ্যে একমাত্র অপরাধ; যার সম্বন্ধে গোষ্ঠী স্বভাবতই সবিশেষ দৃষ্টি রাখে। Religion of the Semites, p. 419.

করা ছাড়া—খুব সম্ভবত বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর যার ফলে যে নারীদের তারা কামনা করেছিল এবং যাদের জন্য তারা পিতাকে হত্যা করেছিল সেই নারীদের তারা সকলেই ভোগ করার আশা ত্যাগ করেছিল। এইভাবে যে সংস্থাটি তাদের শক্তিশালী করেছিল, তাদের সমকামী মানসিকতা ও কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের নির্বাসনকালেই যে সংস্থা খুব সম্ভবত প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই সংস্থাকে তা রক্ষা করল। খুব সম্ভবত এইরকম অবস্থাতেই তখনকার পিতৃ শাসিত পরিবার ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে ব্যাকোফেন (Bechofen) আবিষ্কৃত মাতৃ-শাসিত সংস্থার বীজ উপ্ত হয়েছিল।

অপরপক্ষে ধর্মীয় ব্যাপারে টোটেমবাদের দাবির বিবেচনা করতে হবে অন্য টাবুটির দিক থেকে, যে টাবুর সাহায্যে টোটেম প্রাণীর জীবন রক্ষা পেয়েছিল। পুত্রদের মনোভাব স্বাভাবিক এবং সুষ্ঠুভাবেই প্রাণীর মধ্যে পিতার প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু এর প্রতি তাদের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ব্যবহার দেখে মনস্তাপ প্রকাশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তারা করেছে। অপরাধের জ্বালাকে প্রশমিত করতে এবং পিতার সাথে একটা বোঝাপড়া করার জন্যই সম্ভবত পিতার প্রতিনিধির প্রয়োজন হয়েছে। টোটেমীয় ব্যবস্থা, পিতার সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার মতো। পিতার জীবনকে সম্মান দেখানোর পরিবর্তে শিশু কল্পনায় পিতার কাছ থেকে যা-কিছু পাবার আশা করে নিরাপত্তা, তত্ত্বাবধান, ক্ষমা সেই সমস্তই পিতা দিতে রাজী থাকবে; যে কর্মের দ্বারা আসল পিতা বিনষ্ট হয়েছে টোটেম প্রাণীর প্রতি সেই কর্মের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। টোটেমবাদের মধ্যে যুক্তির পুনর্গঠনের চেষ্টাও দেখা যায়। 'পিতা যদি আমাদের প্রতি টোটেমের মতো ব্যবহার করত তাহলে আমরা কখনই তাকে হত্যা করার জন্য প্রলুব্ধ হতাম না।' এইভাবে টোটেমবাদ আসল ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে এবং যে ঘটনা এজন্য মূলত দায়ী সেইটিকে ভুলে যেতে সাহায্য করেছে।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি উপাদান রূপ নিয়েছে যেগুলি পরবর্তীকালে ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে আসছে। টোটেম ধর্মের শুরু হলো ছেলেদের মনের অপরাধ-বোধের উপশম করার চেষ্টার দ্বারা এবং পরবর্তীকালে আনুগত্য স্বীকার করে আহত পিতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টার মধ্যে। পরবর্তীকালীন সব ধর্মই ঐ একই সমস্যার সমাধানের চেষ্টার ফল বলে প্রমাণিত। **তফাৎ কেবল সংস্কৃতির প্রগতির** যে-অবস্থাতে এটা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছে সেইখানে এবং যে-পথে এটি চালিত হয়েছে তার ওপর। যাই হোক, যেখানে সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছে এ সমস্তই সেই একই চরম ঘটনার প্রতি প্রতিক্রিয়া এবং এটা সেই থেকে আজ পর্যন্ত মানুষকে বিশ্রাম দেয়নি।

ধর্মের মধ্যে আরো একটি বৈশিষ্ট্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে রক্ষিত হয়ে এসেছে, যা টোটেমবাদের ঐ অবস্থাতেই পরিস্ফুট হয়েছিল। সম্ভবত উভয়বলতার চাপ এত বেশি ছিল যে, কোনো প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা তাকে উপশমিত করা সম্ভব হয়নি, কিংবা এই পরস্পরবিরোধী মনোভাবকে কোনো একটি বোঝাপড়ার মধ্যে আনার পক্ষে মনো-

বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতি সর্বদিক থেকেই প্রতিকূল ছিল। পিতৃ-গুঁষের সঙ্গে যে উভয়বলতা যুক্ত হয়ে রয়েছে টোটেমবাদের মধ্যেও এবং সাধারণভাবে ধর্মের মধ্যে তাই প্রবাহিত হয়ে চলেছে, এটা অবশ্যই লক্ষ করবার বিষয়। টোটেমবাদের ধর্মের মধ্যে যে কেবল মনস্তাপের প্রকাশ এবং বোঝাপড়া করার চেষ্টাই রয়েছে তা নয়, এর মধ্যে পিতাকে জয় করার আনন্দকে স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থাও রয়েছে। এইভাবে যে সন্তুষ্টি পাওয়া গেল তার ফলেই টোটেম ভোজের স্মরণীয় উৎসবের মধ্যে পরবর্তী-কালীন আনুগত্যের বিধি-নিষেধকে মুলতুবি রাখা হয়েছে এবং যতবারই এই লাভ-জনক অনুষ্ঠানে, যেমন পিতৃ-সম্পত্তির ভোগ, জীবনের পরবর্তী প্রভাবের ফলে লুপ্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ততবারই টোটেম প্রাণী বধ করে পিতৃহত্যার অপরাধকে পুনরুজ্জীবিত করা কর্তব্য বলে মনে হয়েছে। যদি পুত্রের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা পরবর্তীকালীন অনেক ধর্মব্যবস্থার মধ্যে প্রায়ই অতি আশ্চর্যজনক ছদ্মবেশ ধরে এবং বিপর্যয়ের (invertion) মধ্য দিয়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে বলে দেখি তাহলে আমরা আশ্চর্য হব না।

আমরা যদি বুঝে থাকি যে, ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেশাবলির মধ্যে কিন্তু টোটেম-বাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই—পিতার প্রতি কোমল আবেগগুলি অনুতাপে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে, একথা ভুললে চলবে না যে, মনের যে ঝোঁকগুলি পিতাকে বধ করতে বাধ্য করেছে, সেইগুলিই শেষপর্যন্ত জয়মাল্যকে দখলে রেখেছে। সামাজিক এবং ভ্রাতৃত্ববোধ যার ওপরেই এই বিরাট পরিবর্তন প্রতিষ্ঠিত সেই থেকে বহুদিন যাবৎ সমাজের প্রগতির ওপর চরম প্রভাব বিস্তার করে আসছে। জ্ঞাতি সম্পর্কের (common blood) বিশুদ্ধিকরণে এবং গোষ্ঠীর মধ্যেকার জীবনের সংঘবদ্ধতার ওপর জোর দেওয়ার মধ্যে এগুলি প্রকাশমান হয়। এইভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে ভাইয়েরা এই কথাই প্রমাণ করল যে, তারা যেভাবে তাদের পিতার প্রতি ব্যবহার করেছে তেমন ব্যবহার তারা নিজেদের কারো প্রতি করবে না। পিতার ভাগ্যের পুনরাবৃত্তিকে তারা আগে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিল। ভ্রাতৃহত্যার বিরুদ্ধে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা এখন যুক্ত হলো টোটেম প্রাণী বধের সঙ্গে, যা ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। জাতির সভ্যদের প্রতি নিষেধাজ্ঞাকে বাতিল করতে ধর্মীয় আদেশের এখনো বহুদিন সময় লাগবে এবং সহজ সরল ভাষায় বলতে পারবে ; তুমি হত্যা করবে না। প্রথমে ভ্রাতৃগোষ্ঠী স্থান নিয়েছে পিতৃসঙ্ঘের এবং রক্ত-সম্পর্কের দ্বারা সুরক্ষিত থাকার জামিনদারি হয়েছে। সমাজ এখন সাধারণ অপরাধের জটিলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত অপরাধবোধ এবং তজ্জনিত অনুতাপের ওপর, আর নীতিবোধের মূল আংশিকভাবে সমাজের চাহিদার ওপর এবং অংশত এই অপরাধেরই দাবি, প্রায়শ্চিত্তের ওপর।

এইভাবে মনঃসমীক্ষণ টোটেমীয় মতবাদের নূতনতর ধারণার বিপরীত এবং প্রাচীনতর ধারণার সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ টোটেমবাদ এবং বহির্বিবাহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং সেইসঙ্গে তাদের যুগপৎ উৎপত্তির বিষয়ে তর্কের অবকাশ রাখে।

৬

আমার মন এখন অনেকগুলি শক্তিশালী উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত। তারাই আমাকে টোটেমবাদের মধ্যে ধর্মবলির উৎপত্তির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাদের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা থেকে নিরস্ত করেছে। এদের টানা-পোড়েনের মধ্যে যে-দুটিকে আমি বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখছি কেবলমাত্র সেই সূত্র দুটি ধরেই আমি অগ্রসর হব, যথা টোটেম বলির উদ্দেশ্য এবং পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ।[৭৫]

রবার্টসন বলেছেন, পুরনো টোটেম ভোজই-বলির প্রারম্ভিক রূপ নিয়ে ফিরে আসছে। ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য একই: পঙ্‌ক্তি ভোজে অংশগ্রহণ করে পাপমুক্ত হওয়া। অপরাধবোধকে সমস্ত অংশগ্রহণকারীর সঘনবদ্ধতার মাধ্যমেই প্রশমিত করা গেলে কিছুটা অবশিষ্ট থেকে গেছে। উপরন্তু আদিম জাতির দেবতা আছে, যার কল্পিত উপস্থিতিতে বলিদান সম্পন্ন হয়, যে-গোষ্ঠীর অন্যান্য সভ্যের মতো ভোজে অংশগ্রহণ করে এবং যার সঙ্গে বলি-ভোজ গ্রহণের মাধ্যমে একত্বীকরণ সম্পন্ন হয়। কি করে দেবতা এই পরিবেশের মধ্যে এল, আদিতে যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল?

সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে: ইতিমধ্যে, কখন তা কেউ জানে না, ঈশ্বরের ধারণা আবির্ভূত হয়েছে এবং ধর্মীয় জীবনের সবটুকুই অধিকার করে বসেছে। এবং জীবিত থাকতে ইচ্ছুক এমন সবকিছুর মতোই টোটেম ভোজও নিজেকে নতুন ব্যবস্থার মধ্যে মানিয়ে চলতে বাধ্য হয়েছে। যাই হোক, ব্যক্তির মনঃসামীক্ষণিক গবেষণা থেকে আমরা বিশেষ করে জানতে পারি যে, সর্বক্ষেত্রে পিতার অনুরূপ করেই দেবতা পরিকল্পিত হয়েছে; এবং দেবতার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত-সম্পর্ক নির্ভর করে বাস্তবে পিতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ওপর। তাই সে-সম্পর্ক চপল ও পরিবর্তনশীল। ঈশ্বর আসলে মহিমান্বিত পিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। টোটেমবাদের বিশ্বাসীরা যেমন টোটেমকে তাদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করত তেমনি ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে পিতা বলে মনে করে। এখানেও মনঃসমীক্ষণের পরামর্শ হচ্ছে এই আস্তিকদের বিশ্বাস করা। মনঃসমীক্ষণকে যদি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করাই হয় তাহলে ঈশ্বরের কল্পনায় পিতার দাবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য ঈশ্বর সংক্রান্ত আর সমস্ত উৎপত্তিতত্ত্ব ও অর্থের কথা, যাদের সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণ কোনো আলোকপাত করতে পারে না, সেই সব বাদ দিয়েই আমি বলছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আদিম বলিদানের মধ্যে পিতা দুবার প্রতিনিধিত্ব করছে—প্রথম ঈশ্বর রূপে; দ্বিতীয় টোটেম প্রাণী-বধ রূপে। মনঃসমীক্ষণ যে সীমিত সংখ্যার ক্ষেত্রে সমাধান দিতে সমর্থ হয়েছে তার প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েই আমরা তাহলে বলব, এটা কি করে সম্ভব, এবং ইহার অর্থই বা কি হবে?

আমরা জানি পূত প্রাণীর (টোটেম বধ্য প্রাণী) সঙ্গে দেবতার বহুরকম সম্পর্ক রয়েছে—১. সাধারণত প্রত্যেক দেবতার একটি পবিত্র প্রাণী আছে, কখনো-বা

---

৭৫. C. G. Jung প্রণীত Transformation and Symbols of the Libido, যার মধ্যে কিছু মতের অমিলের কথা উল্লিখিত হয়েছে তার সঙ্গে তুলনীয়।

একাধিক আছে, ২. কোনো কোনো বিশেষ পবিত্র বলিদানের ক্ষেত্রে তথাকথিত 'গুপ্ত-রহস্যমূলক' বলিদানের ক্ষেত্রে দেবতার মাধ্যমে যে-সমস্ত প্রাণীকে পূত-পবিত্র করা হয়েছে তাদের প্রত্যেককেই ঐ দেবতার কাছে বলি দেওয়া হয়,[৭৬] ৩. দেবতা প্রায়ই প্রাণীর প্রতিকৃতিতে পূজ্য হয় ; কিংবা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, টোটেমবাদ পর্বের বহুকাল পরে প্রাণীরা দেবতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা ভোগ করে আসছে, ৪. উপকথার দেবতা পুনঃ পুনঃ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়, যে-প্রাণীটি তার কাছে প্রিয় প্রায়ই সেইটির রূপ নিয়ে ; এই থেকে ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, দেবতা নিজেই প্রাণী ছিল এবং ধর্মীয় মনোভাবের পরবর্তী স্তরে সে টোটেম প্রাণী থেকে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু টোটেম প্রাণী পিতার প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছুই নয়, এই ধারণা আর সমস্ত আলোচনাকেই নিরর্থক করে দেয়। টোটেম পিতৃ-প্রতিনিধির প্রথম রূপ হতে পারে, এবং দেবতা পরবর্তী রূপ, যার মধ্যে পিতা আবার নিজের রূপ ফিরে পেয়েছে। যদি সময়কালে পিতার সঙ্গে এবং সম্ভবত প্রাণীর সঙ্গেও কোনো রূপ অপরিহার্য পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে সমস্ত ধর্মীয় বিবর্তনের মূল থেকে এরূপ নতুন সৃষ্টি, যেমন পিতার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা—সম্ভব হতে পারে। এমনকি যদি আমরা প্রাণী থেকে মানসিক বিচ্ছিন্নতার সুরকে উপেক্ষা করি এবং ঐ সঙ্গে পশুকে গৃহপালিত করার জন্য টোটেমবাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এসেছে বলে মনে করি তাহলে এমন পরিবর্তনকে খুব সহজেই দৈব অ্যাখ্যা দেওয়া যায়। পিতাকে অপসারণ করার জন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেজন্য এমন একটা কিছু ঘটেছে যার ফলে সময় কালে পিতাকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটা অস্বাভাবিক রকমের আকুতি জন্মেছে। ভাইদের মধ্যে যারা পিতৃ-নিধনে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেকের মনেই পিতার মতো হবার আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হয়েছিল, এবং টোটেম ভোজে পিতৃ-প্রতিনিধির কিয়দংশ উদরস্থ করে এই ইচ্ছার প্রকাশকে রূপ দিয়েছিল। ভ্রাতৃগোষ্ঠীর শৃঙ্খল পরস্পরের প্রতি যে চাপের সৃষ্টি করেছিল তারফলে এই ইচ্ছা অপূর্ণ থাকতে বাধ্য। তাদের মধ্যে কেউ পিতৃশক্তির অনুরূপ শক্তি, যা তাদের সকলেরইকাম্য ছিল, তা অর্জন করতে পারেনি বা তাদের দেওয়া হয়নি। এইভাবে পিতার বিরুদ্ধে তিক্ততাবোধ, যা হত্যা-কাণ্ড করতে উত্তেজনা জুগিয়েছিল তা কালক্রমে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং পিতাকে পাবার জন্য অদম্য ইচ্ছা মনে জন্ম নিয়েছিল। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল একটা আদর্শের। যার আধেয় ছিল শক্তির পরিপূর্ণতা লাভ এবং বিজিত আদি পিতার বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তি তার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের ইচ্ছা। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের হস্তক্ষেপের ফলে জাতির প্রত্যেকটি সভ্যের মৌলিক গণতান্ত্রিক স্বাধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে যেসব লোক অবশিষ্ট সকলের তুলনায় নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলেছিল সেইসব লোকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবতার সৃষ্টি করে, প্রাচীন পিতৃ-আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। মানুষ দেবতা হবে এবং দেবতার মৃত্যু হবে, এ ধারণা আজকে আমাদের কাছে সাংঘাতিক ধরনের অনুমান বলে মনে হলেও উৎকৃষ্ট প্রাচীন আদর্শের কাছে কোনো ক্রমেই

৭৬. Robertson Smith, Religion of the Semities. Second Edition, 1907,

আপত্তিকর ছিল না।[৭৭] কিন্তু যে পিতা থেকেই আদিম জাতি উদ্ভূত হয়েছে সেই নিহত পিতার প্রতি দেবত্ব আরোপ করা টোটেমবাদের সঙ্গে পূর্বেকার শর্তের তুলনায় প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রে অনেক গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা।

এই বিবর্তনের মধ্যে কোথায় যে মাতৃদেবীদের স্থান নির্ণয় করব, যারা সম্ভবত সর্বত্রই পিতৃবৎ দেবতাদের অগ্রণী হয়েছেন, সেকথা চিন্তা করে কূল পাই না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে পিতার সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, পিতার অপসারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনুষ্য জীবনের অন্য দিকেও, যেমন সমাজ সংস্থা, যুক্তিসম্মতভাবে প্রসারিত। পিতৃবৎ দেবতারা স্থাপিত হলে, পিতৃহীন সমাজ আস্তে আস্তে পিতৃশাসিত সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। আদিম সঙ্ঘের পুনর্গঠিত রূপ হচ্ছে মানব পরিবার এবং প্রাক্তন আদিম সংঘের পুরনো অনেক অধিকার, পিতাকে প্রত্যার্পণ করা হয়েছিল। এখন আবার দেখা দিল পিতৃশাসন; কিন্তু ভ্রাতৃদলের কীর্তিকলাপ পরিত্যক্ত হলো না এবং নতুন পরিবার পিতৃশাসন ও বন্ধনহীন আদিম পিতার মধ্যে সত্যিকারের পার্থক্য থেকে গেল প্রচুর, যা ধর্মীয় চাহিদাকে তথা পিতার জন্য অপূর্ণ বাসনাকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আদিম দেবতার সামনে বলিদানের দৃশ্যে পিতা দুইবার দৃশ্যমান হচ্ছে। একবার দেবতা হিসাবে এবং পুনরায় টোটেমীয় বলিদানের বলি হিসাবে। কিন্তু এই অবস্থাকে বুঝতে চেষ্টা করার সময় এর ব্যাখ্যা করা সম্বন্ধে আমাদের সাবধান থাকতে হবে, কেননা, এর ঐতিহাসিক বিবর্তনের কথা ভুলে গিয়ে ভাসা-ভাসা ভাবে ইহাকে এক রূপক হিসাবে প্রতিপন্ন করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। পিতার দুই বারের উপস্থিতির দৃশ্য, পরপর দুইটি অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পিতার প্রতি উভয়বলি মনোভাব এবং সেই সঙ্গে পুত্রের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে তার ভাবপ্রবণশীল প্রক্ষোভীয় মনোভাবের জয়যাত্রা—এই দুইটিই এখানে মূর্ত হয়েছে। পিতার পরাজয়ের দৃশ্য, তার চরম অবনতিই এখানে সর্বোচ্চ আনন্দকে সূচিত করেছে। যে-কাজ তার এই অপকর্মের স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখেছে এবং তার ওপরে কলঙ্কের বোঝা চাপানোর জন্য যা পিতাকে সন্তুষ্ট করছে, তারই মধ্যে রয়েছে একান্ত মামুলী-ভাবে অর্জিত বলিদানের অর্থ।

আরো পরবর্তীকালে বলির প্রাণীর পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং বলি অনুষ্ঠানের সঙ্গে টোটেম উৎসব উদ্‌যাপনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও দূরে সরে গেছে। অনুষ্ঠান এখন দেব-দেবীকে সাধারণ অর্ঘ্য দেওয়ায় বা দেবতার জন্য আত্মপীড়নে পর্যবসিত হয়েছে।

---

৭৭. আমাদের মতো আধুনিকদের কাছে মানুষ এবং দেবতার মধ্যে পার্থক্য আজ এতই অলঙ্ঘনীয় রকম গভীর হয়েছে যে, এমন অনুকৃতিকে অপবিত্র বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রাচীনদের ধারণা অন্যরকম। তাদের কাছে ঈশ্বর এবং মানুষ ছিল সমগোত্রীয় কারণ এমন বহু পরিবার আছে যারা দেবতা সম্ভূত বলে দাবি করে এবং যাদের কাছে মানুষের ঈশ্বরত্ব সম্ভবত আধুনিক ক্যাথলিকদের কাছে সাধু-সন্তদের মাহাত্ম্য প্রাপ্তির মতোই সামান্য ব্যাপার বলে মনে হোত।'
Frazer, The Golden Bough, I: Magic Art and the Evolution of Kings II. p. 177.

স্বয়ং ভগবান এখন এত উচ্চে যে পুরোহিতের মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। সেই সঙ্গে সমাজব্যবস্থায় ঈশ্বরতুল্য নরপতির সৃষ্টি হয়েছে, যে নরপতি রাষ্ট্রের হাতে পিতৃশাসন প্রথা হস্তান্তরিত করেছে। পদচ্যুত এবং পুনঃস্থাপিত পিতার প্রতিহিংসা যে খুবই নিষ্ঠুর সে-কথা নিশ্চয় করে বলা যায়। এটা স্বাধিকারের ওপর কর্তৃত্বের প্রভাব বিস্তারে পর্যবসিত হয়েছে। কর্তৃত্বহীন পুত্রেরা তাদের অপরাধের বোঝা আরো বেশি করে লঘু করবার জন্য নতুন সম্পর্ককে কাজে লাগিয়েছে। আজকের দিনের বলির সংগঠন সম্পূর্ণভাবে তাদের দায়িত্বের বাইরে। ভগবান স্বয়ং এখন দাবিদার এবং ব্যবস্থাপক। যেসব পৌরাণিক কাহিনীতে ভগবান নিজে তাঁর পবিত্র প্রাণীকে হত্যা করেন, যা আসলে তিনি নিজেই, সেই কাহিনীগুলি হলো এই পর্যায়ের। এটাই হলো সবচেয়ে বড় অপকর্মের সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য অস্বীকৃতি, যা নিয়ে সমাজ এবং অপরাধবোধের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই বলিদানীয় প্রদর্শনের মধ্যে দ্বিতীয় অন্য একটি নির্ভুল অর্থ আছে। এই অর্থে, এই বলে খুশি প্রকাশ করা হয় যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা লাভের জন্য পূর্বেকার পিতৃ-প্রতিরূপ পরিত্যক্ত হয়েছে। এরকম দৃশ্যের ভাসা-ভাসা ভাবে রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে এক ধরনের মনঃ-সামীক্ষণিক ব্যাখ্যা,[৭৮] যথা পশু-প্রকৃতির দিকটা জয় করার জন্যই ঈশ্বরের পরিকল্পনা—মোটামুটিভাবে একই পর্যায়ে পড়ে বলে মনে হয়।

কিন্তু পিতৃশাসনের কর্তৃত্বের এই নবরূপায়ণের কালে পিতৃ-গুষ্ঠের অন্তর্গত আগ্রাসী মনোভাবের সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে এমন বিশ্বাস করা খুব ভুল হবে। অপরপক্ষে, ঈশ্বর ও রাজা এই দুইটি পিতৃ প্রতিকল্প শাসনের প্রথম পর্যায়গুলিতে, ধর্মের একান্ত বৈশিষ্ট্য যে উভয়বলতা, তার সর্বাপেক্ষা সক্রিয় প্রকাশ স্পষ্টরূপেই পরিলক্ষিত হয়।

ফ্রেজার তাঁর বিখ্যাত পুস্তক, *The Golden Bough*-এর মধ্যে তাঁর অনুমানের কথা প্রকাশ করে বলেছেন যে, লাটিন আদিম জাতিদের রাজারা ছিল বিদেশী লোক। তারা দেবতার মতো কাজ করেছে এবং বিশেষ অবকাশের দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাঁকজমকের সাথে উৎসর্গিত হয়েছে। দেবতার বাৎসরিক বলি উৎসব (আত্মবলি একটি ভিন্নরূপ) semitic মর্মের একটি অংশ বলে মনে হয়। পৃথিবীর মানব অধ্যুষিত বিভিন্ন অংশে নরবলির অনুষ্ঠান থেকে মনে হয়, ঐসব মানুষ দেবতার প্রতিনিধি হিসাবেই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করত। পরবর্তী যুগেও এই প্রথার সূত্র পাওয়া যাবে জীবন্ত মানুষের পরিবর্তে প্রাণহীন বস্তুর (পুতুল) বলিদানের মধ্যে।

---

৭৮. পুরাণে এক পুরুষের দেবতাদের কাছে আর এক পুরুষের দেবতাদের পরাজয়, এক ধর্মব্যবস্থার প্রবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সূচিত করে। এরকম সম্ভব হয় কোনো এক অপরিচিত জাতির যুদ্ধজয়ের ফলে কিংবা কোনো মনোবৈজ্ঞানিক সম্প্রসারণের ফলে। শেষের অর্থ অনুযায়ী H. Silberer-এর মতে পৌরাণিক কাহিনী 'Fundamental phenomena'র অভিমুখিন। C. G. Jung জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন (l. c.) যে দেবতা পশুকে হত্যা করেছে সে লিবিডোর প্রতীক। লিবিডো সম্বন্ধে এরকম ধারণা এখানে এতক্ষণ পর্যন্ত অনুসৃত ধারণা থেকে ভিন্ন, এজন্য আমার কাছে এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

নরদেহরূপী দেবতার বলিদানের বিষয়টি পুরনো বলিদানের পদ্ধতির তাৎপর্যের ওপর সুস্পষ্ট আলোকসম্পাত করে। কিন্তু যেভাবে পশু বলিদান বিষয়টির আলোচনা করেছি, সেরকম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার মতো যোগ্যতা দুর্ভাগ্যবশত আমার নেই।

এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বলিদানের উদ্দেশ্য সর্বকালেই এক, এখন ভগবান বলে যাকে পূজা করা হয়, অর্থাৎ কিনা পিতার সঙ্গে হুবহু এক। এখন প্রাণীবলির সঙ্গে নরবলির সম্পর্কের প্রশ্নটির সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। আদিতে পশুবলি ছিল নরবলির প্রতিকল্পমাত্র, শ্রদ্ধার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক পিতৃহত্যা এবং যখন পিতৃ-প্রতিকল্প নরদেহে রূপান্তরিত হলো, তখন পশু-প্রতিকল্প আবার নরবলিতে ফিরে আসতে পারে।

এইভাবে প্রথম বলিদানের স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে গেছে, তাকে ভোলার শতচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবং এই মুহূর্তে যখন মানুষ এর সম্ভাব্য অভিপ্রায় থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করেছে তখনই দেববলি হিসেবে এর হুবহু পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। যুক্তাভ্যাসের (rationaisation) মাধ্যমে যে ধর্মীয় চিন্তার ক্রমবিকাশ এই পুনরাবৃত্তিকে সম্ভব করে তুলেছে সে সম্বন্ধে এখানে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। রবার্টসন স্মিথ, যিনি অবশ্য বলিদানের অনুসন্ধান থেকে অনেক পিছনে মানুষের আদিম ইতিহাসের এই বিরাট ঘটনার দিকে সরে গিয়েছিলেন তিনি বলেন যে, যেসব উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরনো 'সেমাইট' বা কোনো দেবতার মৃত্যু উৎসব পালন করেছে সেগুলি পৌরাণিক বিয়োগের 'স্মৃতিচারণ' বলে আখ্যাত হয়েছে, এবং সঙ্গীর বিলাপ স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতিপ্রসূত নয়, তা বাধ্যতা-মূলক প্রকৃতির, যা স্বর্গীয় ক্রোধের ভয়ের দ্বারা আরোপিত, এমন একটা কিছুর প্রকাশ।[৭৯] এই ব্যাখ্যা ঠিক, উৎসবে যোগদানকারীদের মনোভাব মূল পরিস্থিতির দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে : এ-মতের সমর্থন এখন আমরা করতে পারি।

তাহলে ধর্মের ক্রমোন্নতির বিষয়ে রয়েছে দুটি প্রেরণা : পুত্রের অপরাধবোধ, এবং তাকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা ; এরা কখনো প্রশমিত হয়নি, এ-ধারণা এখন আমরা সত্য বলে মেনে নিতে পারি। ধর্মীয় সমস্যা সমাধানের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা এবং দুইটি বিরুদ্ধ প্রকৃতির মানস শক্তির সমন্বয়ের সমস্ত প্রয়াস ক্রমশ ধূলিস্যাৎ হয়েছে ; সম্ভবত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও অন্তঃস্থ মানসিকতার রূপান্তর এইগুলির সম্মিলিত প্রভাবে এরকম সম্ভব হয়েছে।

পিতৃদেবের স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পুত্রের চেষ্টা উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। কৃষিকার্য প্রবর্তনের সঙ্গে পিতৃশাসনাধীন পরিবারে পুত্রের কদর

---

৭৯. **Religion of the Semites**, পৃষ্ঠা ৪১২-১৩। 'শোকার্ত হওয়াটা ঐশ্বরিক বিয়োগের প্রতি সহানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নয়। পরন্তু এটি বাধ্যবাধকতাপূর্ণ এবং নৈসর্গিক ক্রোধের ভয় থেকে উদ্ভূত। এখানে শোকার্ত ব্যক্তিদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেবতার মৃত্যুর জন্য দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া। এই বিষয়টি আগেই পশুবলি সংক্রান্ত ব্যাপারে, যেমন 'এথেন্সে বৃষবলি' আমাদের সামনে এসেছে।'

বেড়েছে। সে তার অজাচার লিবিডোকে নতুনভাবে প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছে; মাতৃভূমিতে কৃষিকাজ করার মাধ্যমে যা, প্রতীক ভোগ সুখ সে তা অর্জন করেছে। এইভাবে Attis, Adonis, Tanmuz এবং অন্যান্য দেবরূপের সৃষ্টি হয়েছে; এছাড়া উদ্ভিদেরা পেয়েছে প্রাণ এবং সেই সঙ্গে তরুণ দেবত্ব। এরা সকলেই মাতৃবৎ দেবী-দের প্রশ্রয় উপভোগ করেছে এবং পিতাকে উপেক্ষা করে মাতার সঙ্গে অজাচারিতা করেছে। কিন্তু এইসব সৃষ্টির মাধ্যমেও যেসব অপরাধবোধ দূর হয়নি তা অতি-কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এইসব অতিকথার মধ্যে মাতৃরূপী দেবীদের তরুণ প্রেমিকরা অকাল মৃত্যু বরণ করেছে এবং উপস্থছেদন করে কিংবা পশুর আকৃতিধারী পিতৃরূপ দেবতার ক্রোধের দ্বারা শাসিত হয়েছে। Aphrodite-এর পবিত্র পশু শূকর হত্যা করেছে Adonisকে, Cybeleএর প্রেমাস্পদ Attis-এর মৃত্যু হয়েছে উপস্থ-ছেদনের ফলে।[৮০] এইসব দেবতাদের জন্য শোকপ্রকাশ এবং এদের পুনরুজ্জীবনে আনন্দপ্রকাশ এসব আর একটি পুত্রের আচার অনুষ্ঠানে বর্তেছে। যার ফলে দেবত্ব সৃষ্টি বহুদিন ধরে টিকে থাকতে বাধ্য।

যখন খ্রিষ্টধর্ম প্রাচীন রাজ্যে প্রবেশ করল তখন Mithra-এর ধর্মের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো এবং কোন্ দেবতা জয়ী হবে তা অনেকদিন পর্যন্ত অনিশ্চিত ছিল।

তরুণ পারসীয় দেবতার সুন্দর আকৃতি আমাদের ধারণাকে ব্যর্থ করেছে। Mithras-এর ষাঁড় হত্যার উদাহরণ থেকে আমরা এই উপসংহার করতে পারি যে, সে পুত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে, যে-পুত্র পিতাকে নিজে বলি দিয়েছে এবং এইভাবে ঐ দুষ্কর্মের জটিলতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। অপরাধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর একটা উপায় আছে, যেটি যীশুখ্রিষ্ট নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের জীবন দান করেছিলেন এবং এইভাবে আদি অপরাধ থেকে ভাইদের পরিত্রাণ করেছিলেন।

Orpheus থেকে আদি অপরাধতত্ত্বের উৎপত্তি। এটি প্রথমে গুপ্ত মতবাদ হিসাবে প্রচলিত ছিল; সেখান থেকে প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ

---

৮০. আমাদের কালের তরুণ উদ্‌বায়ু রোগীর ক্ষেত্রেও এই উপস্থছেদনের পিতাপুত্রের ভয় সম্পর্ককে বিক্ষুব্ধ করতে বিস্ময়করভাবে কাজ করে থাকে। ফেরেঞ্জির অতি সুন্দর আলোচনার মধ্যে আমরা দেখেছি, কেমন করে ছেলেটি, যে পশুটি তার ছোট্ট লিঙ্গে কামড় দিয়েছিল তার মধ্যে তার টোটেমকে চিনতে পেরেছিল। শিশুরা যখন সুন্নৎ অনুষ্ঠানের বিষয় জানতে পারে তখন তারা এই অনুষ্ঠানকে উপস্থছেদনের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে। আমাদের শিশুর মতো অন্যজাতির মনোবিদ্যার মধ্যে এরকম মনোভাবের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রাচীন কালে অসভ্য জাতিদের মধ্যে সুন্নৎ খুব ঘন ঘন ঘটত। সুন্নৎ হোত ব্রতীকরণের সময়; এর অর্থও খুঁজে পাওয়া যাবে সেইখানে। একে নেহাত গৌণভাবেই আরো অল্পবয়সে নামানো হয়েছে অসভ্য লোকদের মধ্যে সুন্নৎ, চুলছাঁটা কিংবা দাঁত তোলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিংবা এরা সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

এবং আমাদের শিশুরা, যারা এসবের কিছুই জানে না তারা যখন এইসব ব্যাপারে ভয় পায় তখন এই দুইটি ঘটনাকে উপস্থছেদনের সমতুল্য বলে মনে করে।

করেছে।[৮১] মানুষ ছিল টাইটানদের বংশধর। এই টাইটানরা যুবক Dionysos-Zagreusকে হত্যা করেছিল এবং তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছিল। এই অপরাধের ভার তাদের দুর্বিষহ হয়েছিল। Anaximanderএর একাংশ বলে যে, এই আদিম পাপের দ্বারা পৃথিবীর ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং এই থেকে যা-কিছু নির্গত হবে সবই এই পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করবে।[৮২] যদিও একদলভুক্ত করার, হত্যা করার এবং টুকরো টুকরো করার ধারা টাইটানের কাজের মধ্যে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা খুব স্পষ্ট-ভাবেই St. Nilus বর্ণিত টোটেম-বলির কথা এবং আরো প্রাচীন অতিকথা, যেমন Orpheusএর নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তবুও যেভাবে একজন তরুণ দেবতাকে হত্যা করা হলো, সে সম্বন্ধে অসমতা দেখে আমাদের খুব অস্বস্তি হয়।

খ্রিষ্টধর্মের অতিকথাতে মানুষের প্রাথমিক পাপ যে ভগবানরূপী পিতার বিরুদ্ধে অপরাধ, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এবং যদি খ্রিষ্ট নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে মানুষের আদি পাপের বোঝা লঘু করে থাকেন তাহলে এই পাপ যে হত্যা প্রসূত সে-কথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না। প্রতিশোধস্পৃহা মানবীয় অনুভূতির মূলে অবস্থিত। প্রতিশোধ আইন অনুযায়ী একটি হত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেবল আর একটি হত্যার দ্বারাই হতে পারে। আত্মহত্যার মূল রয়েছে রক্ত-সম্পর্কীয় অপরাধের মধ্যে[৮৩] এবং যদি একজনের নিজের জীবন দান, দেবতা তথা পিতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সমর্থ হয় তাহলে এদ্বারা যে-পাপের স্খালন হবে সে-পাপ নিশ্চয় কেবল পিতৃ-হত্যার দ্বারাই সম্ভব।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, খ্রিষ্টীয় মতবাদ মানুষ প্রাচীনকালের অপরাধমূলক কাজকে অত্যন্ত সংযতভাবে স্বীকার করে। কারণ এটা এখন বুঝেছে যে, পুত্রের মৃত্যুর মধ্যেই তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণতা সম্ভব। পিতার সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন আরো পূর্ণতা লাভ করেছে; কারণ এই বলিদানের সঙ্গে সঙ্গেই যার জন্য মানুষ পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল সেই স্ত্রীলোকের প্রতি সে তার দাবি ত্যাগ করেছে। কিন্তু আজও উভয়বলতার মনোবৈজ্ঞানিক নিয়তি তার ন্যায্য অধিকার দাবি করে। একই কাজের মধ্যে পিতার কাছে পুত্রের কঠিনতম প্রায়শ্চিত্ত করা হচ্ছে এবং পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের ইচ্ছাও চরিতার্থতা লাভ করেছে। সেও পিতার পাশে, বলা যায় পিতার স্থানে দেবতা হয়ে ওঠে। পিতার ধর্মের স্থানে পুত্রের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিস্থাপনের লক্ষণ হিসাবে পুরনো টোটেম ভোজ মিলনমেলারূপে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যেখানে বর্তমানে একদল ভাই, এখন পিতার নয়, পুত্রের রক্তমাংস ভক্ষণ করে; এইভাবে পুত্রেরা পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণের দ্বারা নিজেরা পবিত্র হয়। এইভাবে যুগ যুগ ধরে টোটেম ভোজের প্রাণী হত্যা, (theanthropic) নরদৈবিক, নরবলির এবং খ্রিষ্টীয় নৈশভোজের অভিন্নতা আমরা লক্ষ্য করে আসছি এবং সেই সমস্ত পবিত্র ঘটনার মধ্যে আমরা এই অপরাধের পরিণতিকে দেখিতে পাই; যে-অপরাধ

---

৮১. Rainach, Cultes, Mythes, et Religions, II. p. 75.

৮২. 'Une Sorte pe peche' proethnique' l. c., p. 76.

৮৩. আমাদের উদ্‌বায়ু রোগীদের আত্মহত্যার আবেগ যে অন্য ব্যক্তির মৃত্যু কামনা করার জন্য আত্মপীড়ন, তা নিয়মিতভাবেই প্রমাণিত হয়।

মানুষকে এত দুঃখ দিয়েছে, আবার যার জন্য মানুষ এত গর্ববোধ করেছে। যাইহোক, খ্রিষ্টীয় মিলনমেলার তাৎপর্য পিতাকে দূরে রাখার এক নতুন উপায়, যার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য একান্ত দরকার এমনি পাপের পুনরাবৃত্তি। ফ্রেজারের উক্তি, 'খ্রিষ্টীয় মিলনমেলা নিজের মধ্যে এমন একটি ধর্মসংস্কার আত্মস্থ করেছে যা নিঃসন্দেহে খ্রিষ্টধর্ম থেকে প্রাচীন'[৮৪] কতদূর যে সমর্থনযোগ্য তা আমরা বুঝতে পারি।

৭

একদল ভ্রাতার দ্বারা আদি পিতাকে অপসারণের এই প্রক্রিয়া মানব ইতিহাসে এক অনপনেয় চিহ্ন রেখে গেছে। এবং এটা বারবার যত অগণিত প্রতিকল্পরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে তত বেশি এটা স্মরণে রাখার সম্ভাবনা কমেছে।[৮৫] পুরাণে, যেখানে সহজেই এইসবের নজির পাওয়া যায় সেগুলি উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করে আমি S. Reinachএর Orpheus-এর মৃত্যু[৮৬] সম্বন্ধে ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনা অনুসরণ করে অন্য আর একটি ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

গ্রীসীয় চিত্রকলার ইতিহাসে একটি অবস্থা আছে যা রবার্টসন স্মিথ আবিষ্কৃত টোটেম ভোজের অবস্থার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে ঘনিষ্ঠ, যদিও নিগূঢ়ভাবে বিকেন্দ্রিত। এটা প্রাচীনতম গ্রীক বিয়োগান্তের অবস্থা। এক নামধারী ও একরকম পোশাক পরিহিত একদল লোক এমন একজন ব্যক্তিকে ঘিরে ধরল, যার কথা ও কাজের প্রতি তারা নির্ভরশীল। উদ্দেশ্য এই ব্যক্তির ঐকতানকে এবং নায়কের একমাত্র মূল প্রতিরূপকে মূর্ত করা। পরবর্তী সম্প্রসারণের দ্বারা খেলার মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিকল্প ও নায়কের সাঙ্গোপাঙ্গের প্রয়োজনে সৃষ্টি হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনেতা। কিন্তু নায়কের চরিত্র ও ঐকতানের দলের সঙ্গে তার সম্পর্ক অপরিবর্তিতই থেকে গেল। বিয়োগান্ত নাটকের নায়ককে দুঃখভোগ করতেই হয়েছে, আজও এইটাই বিয়োগান্ত নাটকের মূল উপাদান। নায়ক নিজে 'বিয়োগ-অপরাধী'কে বরণ করে নিয়েছে কেন তা ব্যাখ্যা করা সর্বত্র সহজ নয়; তবে অপরাধ বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি এটা তা নয়। এর মধ্যে প্রায় সব সময়ই কোনো একটি দৈব বা মাননীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিহিত রয়েছে এবং ঐকতানের দল নায়ককে সাবধান এবং সাবধান করার জন্য সহানুভূতির সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করেছে। এবং যখন নায়ক তার দুঃসাহসিক কর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে তখন তারা নায়কের বিড়ম্বিত ভাগ্যের জন্য শোকপ্রকাশ করেছে।

---

৮৪. Eating the God, p. 51....যিনি এই বিষয়ের রচনা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত তিনি কখনো মনে করবেন না যে, খ্রীষ্টীয় মিলনমেলাকে টোটেম ভোজের সঙ্গে যুক্ত করাটা এই পুস্তক রচয়িতার নিজস্ব চিন্তা।

৮৫. Ariel in the Tempest : পাঁচ হাত নীচে তোমার পিতা শুয়ে আছে : তার হাড়গুলো পলা-পাথরে পরিণত হয়েছে : চোখগুলো হয়েছে তার মুক্তা ; তার কিছুই ম্লান হয়নি কিন্তু পরিবর্তনের মাত্রা হবে সাগরপ্রমাণ, যদিও সেগুলিও আজ আশ্চর্যজনক ও মূল্যবান।

৮৬. La Mort d' Orphee, Mythes, et Religious, Vol. II, p. 100.

কিন্তু বিগোয়াস্ত নাটকের নায়কের ভাগ্য বিড়ম্বিত কেন হবে? এবং তার 'বিয়োগী' অপরাধের অর্থ কি? চট্‌পট্‌ একটা উত্তর দিয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে চাই। নায়ককে দুঃখভোগ করতে হয়েছে, কারণ সে হচ্ছে আদি পিতা, সেই আদিম বিয়োগী নাটকের নায়ক যার পুনরাবৃত্তি এখানে একটি প্রবণতাকে নির্দেশ করছে; এবং বিয়োগী অপরাধ হচ্ছে সেই অপরাধ যা তাকে ঐকতানীদের মুক্ত করার জন্য নিজের উপর নিতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক দৃশ্যকে বিকৃত করার চেষ্টার মাধ্যমেই মঞ্চের দৃশ্য পরিকল্পিত হয়েছে কিংবা, বলতে ইচ্ছে করে এটা মার্জিত ভণ্ডামির ফল। সত্যিকার আদি অবস্থায় ঐকতানের সভ্যরা নিজেরাই নায়কের দুর্ভাগ্যের মূল। অপরপক্ষে, এখানে তারা সহানুভূতি এবং দুঃখে ভেঙে পড়েছে এবং দুর্ভাগ্যের জন্য নায়ককেই দায়ী করা হচ্ছে। বিশিষ্ট কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযান ও দুঃসাহসিকতার জন্য যে অপরাধ তার উপরে চাপানো হয়েছে, যেটা অতীতে ঐকতানের সহকর্মীদের পীড়ন করেছে, যেমন ভ্রাতৃবৃন্দের দল, তার সঙ্গে এটা অভিন্ন। এইভাবে বিয়োগী নায়ককে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ঐকতান দলের ত্রাণকর্তা তৈরী করা হয়েছে।

কারো যদি গ্রীসীয় নাটক অভিনয়ে স্বর্গীয় ছাপ Dionysos এর দুঃখভোগের কথা এবং তাঁর অনুসরণকারী সমব্যথী ছাগকুলের শোকালাপের কথা স্মরণ থাকে তাহলে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে কিভাবে সেই অবলুপ্তপ্রায় নাটক মধ্যযুগে Passion of Christ নাটকে পুনর্জীবন লাভ করেছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপসংহারে আমি বলতে চাই যে, ধর্ম, নীতি, সমাজ এবং চিত্রকলার শুরু ঈডিপস গূঢ়ৈষা থেকে। মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কারের সঙ্গে এটা সর্বতোভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আজ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান যতটা প্রসারিত হয়েছে তা থেকে দেখা গেছে যে, সমস্ত উদ্বায়ুর মূল রয়েছে ঈডিপস্‌ গূঢ়ৈষার মধ্যে। তাছাড়া হাতি—মনোবিদ্যার সমস্যাগুলিও, পিতার সঙ্গে সম্পর্ক, এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সমাধান করা যায় এটি আমার কাছে খুব চমকপ্রদ মনে হয়েছে। সম্ভবত আর একটি মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যাকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করাতে হবে। সত্যিকারের প্রক্ষোভীয় উভয়বলতা অর্থাৎ একই বস্তু বা ব্যক্তির জন্য একই সঙ্গে প্রেম ও ঘৃণার অস্তিত্ব, যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংগঠনের মূলে অবস্থান করছে, দেখাবার অবকাশ আমাদের বহুবার হয়েছে। এই উভয়বলতার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এটাকে আমাদের প্রক্ষোভীয় জীবনের ভিত্তিমূলক ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার কাছে অন্য একটি সম্ভাবনা বিবেচনার যোগ্য বলে মনে হয়: উভয়বলতা আদিতে আমাদের প্রক্ষোভীয় জীবনে অবান্তর ছিল, পিতৃগূঢ়ৈষা থেকে মানুষ এটা অর্জন করেছে।[৮৭] ব্যক্তির মনঃসমীক্ষণিক অনুসন্ধানের ফলে আজও এর বলিষ্ঠতম প্রকাশ লক্ষিত হয়।[৮৮]

---

৮৭. একেই বলে মাতৃ-পিতৃ গূঢ়ৈষা।

৮৮. আমাকে ভুল বোঝার ব্যাপারটি আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। সেইজন্যই এইসব সিদ্ধান্ত করার ফলে যেসব ঘটনাবলীর জটিল প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে যে আমি সম্পূর্ণ সচেতন সে কথাটি স্পষ্ট করে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি। আমি এইটুকু মাত্র দাবি করি যে পূর্বেই আমাদের যা জানা ছিল, কিংবা ধর্মের মূল সম্বন্ধে নৈতিকতা ও সমাজ সম্বন্ধে যা আজও অজানা

শেষ করার আগে আমরা নিশ্চয়ই বিচার করে দেখব যে এইসব দৃষ্টান্তের সাহায্যে যে আশ্চর্য রকমের সমকেন্দ্রিকতায় এবং একটিমাত্র সর্বব্যাপী সম্পর্কে আমরা পৌঁছেছি তা যেন আমাদের অনুমানের অনিশ্চয়তা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছনর অসুবিধার কথা ভুলিয়ে না দেয়। এইসব অসুবিধের মধ্যে আমি মাত্র দুটির কথা এখানে উল্লেখ করবো যে-দুটি হয় তো অনেক পাঠকের মনকে নাড়া দিয়েছে।

প্রথমতঃ, আমরা যে সব কিছু একটি অনুমানের ভিত্তিতে করেছি তা নিশ্চয়ই কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। আমাদের অনুমান ব্যক্তির মানসিক জীবনের অনুরূপ, জনসমষ্টিরও মানস আছে, এবং তার মধ্যেও মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। এছাড়া আমরা বলছি কোন কর্মসংক্রান্ত অপরাধ-বোধ হাজার হাজার বছর জাগরূক থাকে, বংশ পরম্পরায় যারা ঐ কাজের বিন্দুবিসর্গও জানে না তাদের মধ্যেও সক্রিয় থাকে। পিতাদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহারপ্রাপ্ত পুত্রদের বংশপরম্পরার মধ্যে যে প্রক্ষোভীয় প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা নতুন অধস্তন বংশাবলীর, যারা পিতাকেই সরিয়ে দিয়ে ঐরূপ দুর্ব্যবহারকে এড়িয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে সম্প্রসারিত হতে দিতে আমরা রাজি। এগুলো বাস্তবিকই বিশেষ আপত্তিকর মনে হতে পারে। অন্য যে কোন ব্যাখ্যা, যা এরূপ অনুমানসাপেক্ষ নয় তা গ্রহণীয়।

কিন্তু আরো একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে এরূপ দুঃসাহসিকতার জন্য সমস্ত দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে নেবার প্রয়োজন নেই। জনমনের কল্পনা ব্যতিরেকে কিংবা মানব জাতির প্রক্ষোভীয় জীবনের অবিচ্ছিন্নতার, যার জোরে আমরা ব্যক্তির বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের সূত্রে মানসিক কাজের বিচ্ছিন্নতাকে উপেক্ষা করতে পারি এরূপ ধারণা ছাড়া সমাজমনোবিজ্ঞানের অস্তিত্বই থাকত না। যদি একপুরুষের মানসিক ক্রিয়া পরবর্তী পুরুষে প্রসারিত না হোত, যদি প্রত্যেককে জীবনের প্রতিন্যাস নতুন করে সংগঠন করতে হোত, তাহলে এক্ষেত্রে কোন প্রগতি হোত না এবং উন্নতিও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। আমরা এখন দুটি প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম ঃ বংশাবলীর মধ্যে মানসিক সম্প্রসারণকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে ; এবং পরবর্তী পুরুষে সম্প্রসারণ করার জন্য তদানীন্তন পুরুষ কি কি উপায় অবলম্বন করে থাকে ? এই সমস্যাগুলির যে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিংবা, এখনই যা কারো মনে হবে এই দুরূহ সমস্যার জন্য খোলাখুলি আলোচনা এবং পুরুষানুক্রমিকভাবে হস্তান্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়েছে তা আমি মনে করি না। বংশপরম্পরার মানস-জীবনেপ্রয়োজনমত সম্প্রসারণ কি উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে সমাজ-মনোবিদ্যা সাধারণত কোন খোঁজ রাখে না। মনে হয় দুরূহ কাজের খানিকটা সম্পন্ন হয় বংশানুক্রমে প্রাপ্ত মানসিক প্রবণতার দ্বারা ; অবশ্য ব্যক্তির জীবনে সক্রিয়ভাবে কার্যকরী হওয়ার জন্য এই প্রবণতাকে কিছুটা উদ্দীপ্ত করার প্রয়োজন হয়। কবির

ছিল আমাদের মনঃসমীক্ষণিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত একটি নতুন উপাদান তার সঙ্গে যোগ করেছি। এই সমস্ত ব্যাখ্যার সংশ্লেষণ করার ভার অন্য কারো হাতে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই নতুন সংযোজনের প্রকৃতি থেকেই বোঝা যাবে যে এরূপ সংশ্লেষণে একে প্রধান ভূমিকায় ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় অংশ নিতে বলা যেতে পারে না। এই বিরাট গুরুত্বকে মেনে নিতে হলে অবশ্য বিপুল আধানিক বাধাকে জয় করতে হবে।

বক্তব্য : "তুমি তোমার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে যা পেয়েছ তাই নিজের মধ্যে গ্রহণ করার চেষ্টা কর" ; খুব সম্ভব এই অর্থই বহন করে। আবার আমরা যদি এমন মানসিক আবেগের অস্তিত্ব স্বীকার করি, যা এমনভাবে অবদমিত করে রাখা যায় যে তার কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাহলে সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেরকম কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। পূর্ণতম দমনের ক্ষেত্রেও বিকৃত প্রতিকল্প ও তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পথ থাকবেই। যদি তাই হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, কোন বংশই তার পরবর্তী বংশের কাছ থেকে নিজের গুরুত্বপূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়াগুলি গোপন রাখতে পারে না। কারণ মনঃসমীক্ষণ থেকে আমরা শিখেছি যে প্রত্যেক মানুষ তার নির্জ্ঞান মানসক্রিয়ার মধ্যে এমন একটি যন্ত্র পেয়েছে যার সাহায্যে সে অন্যের প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে পারে। অর্থাৎ, অন্য লোকের মনোভাব প্রকাশর সময় যে কৃত্রিমতা থাকে, সেই বক্রতাকে দূর করতে পারে। আদি পিতার সঙ্গে মৌলিক সম্পর্কজনিত যে-সব প্রথা, উৎসব এবং বিধিনিষেধ আমরা পেয়েছি, নির্জ্ঞান মনের জানার এই পদ্ধতির দ্বারা পরবর্তী পুরুষও এই মনোভাবের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকবে। আর একটি আপত্তি আছে। মনঃসমীক্ষণের দিক থেকেই এই আপত্তি উঠতে পারে।

আমরা আদিম সমাজের নীতিবোধ এবং নৈতিক বাধানিষেধের প্রথম নিয়মের ব্যাখ্যা করার সময় বলেছি যে, এই নীতিবোধ এমন একটি কাজের প্রতিক্রিয়া. যা থেকে কর্তা পাপের ধারণা লাভ করেছে। তারা এই কাজের জন্য অনুতপ্ত, এর পুনরাচরণ চায় না এবং এর সম্পাদনের দ্বারা কোনই লাভ হবে না, এই সক্রিয় অপরাধবোধ আমাদের কালেও শেষ হয়নি। আমরা এর সমাজ লাজুক অস্তিত্বের প্রমাণ পাই উদ্বায়ুগ্রস্তদের ব্যবহারে, যা থেকে নতুন নৈতিক নিয়মের সৃষ্টি হয়েছে এবং কৃত অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, কিংবা অপকর্মের প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্কতাস্বরূপ বিধিনিষেধ বলবৎ থেকেছে।[৮৯] কিন্তু আমরা যখন এই প্রতিক্রিয়াশীল কার্যাবলীর জন্য এইসব উদ্বায়ুদের পরীক্ষা করি তখন হতাশ হতে হয়। সেখানে আমরা কোন কর্মের সন্ধান পাইনা, পাই কেবলমাত্র আবেগ এবং অনুভূতির যা অশুভকে খুঁজে বেড়িয়েছে কিন্তু কর্মসম্পাদনা করা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। উদ্বায়ুদের অপরাধ-বোধের মূলে বাস্তব সত্যতা নেই, এটা কেবল মাত্র মানসিক সত্য। সত্যিকারের বাস্তবের উর্ধ্বে মানসিক বাস্তবের প্রাধান্য দেওয়াটা উদ্বায়ুদের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিস্থ লোকেরা কেবলমাত্র সত্যিকারের বাস্তবের প্রতি যেরূপ প্রতিক্রিয়াশীল হয়, উদ্বায়ুরা মানসিক বাস্তবের প্রতিও তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল হয়।

আদিম মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যে একই রকম, তা কি সত্যি বলে মনে হয় না? তাদের স্বকামজসংস্কার আংশিক প্রকাশ হিসাবে আমরা যদি তাদের মানসিক ক্রিয়ার অভিনব অতি-মূল্যায়ন করে থাকি তাহলে আমরা ঠিকই করেছি।[৯০]

এই অনুমান অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবেগ এবং পিতাকে হনন এবং ভক্ষণ

---

৮৯. দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনীয়।

৯০. তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করার কাল্পনিক ইচ্ছাই, নৈতিই প্রতিক্রিয়া ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারত, যে প্রতিক্রিয়া থেকে টাবু ও টোটেমবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আমাদের এতো যে গর্বের বস্তু সাংস্কৃতিক সঞ্চয় তার মূল সন্ধান করতে গিয়ে, যা আমাদের সমস্ত আনুভূমিক সত্তাকে আঘাত করে এমন বিভীষিকাময় পাপকর্মের অনুসন্ধান কার্যকে এড়িয়ে যেতে পারতাম ; কার্য কারণ সম্পর্ক যা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিস্তৃত, তার কোন ক্ষতি হোত না। কারণ সমস্ত কিছুর সাফল্যের জন্য মানসিক বাস্তবই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হোত। পিতৃগোষ্ঠী থেকে ভ্রাতৃদল পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সমাজ ব্যবস্থায় একমত হওয়ার মত সত্যিকারের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই যুক্তি খুব জোরালো হলেও চূড়ান্ত নয়। এই পরিবর্তন আরো কম উগ্র করেও নৈতিক প্রক্রিয়ার প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারত। আদি পিতার অত্যাচার যতদিন প্রবল ছিল, ততদিন তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব সমর্থন-যোগ্য ছিল এবং এরূপ মনোভাবের জন্য অনুশোচনা করার বিশেষ সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয় আপত্তির মূল্য অতি সামান্য। পিতার প্রতি উভয়বলতার সম্পর্কজনিত সবকিছুর, যেমন টাবু এবংবলিদানের নিয়মাবলীর, বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রচণ্ডতম গুরুত্বও নিখুঁত বাস্তব। অনুকর্ষী উদ্বায়ুদের আচার-বিচার এবং বাধ-সমষ্টির মধ্যেও এইরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তবুও তারা কেবলমাত্র মনঃবাস্তবের প্রতি আকৃষ্ট হয় ; মনে মনে সংকল্প করে কিন্তু তা বাস্তবে কাজে পরিণত করে না। যা কেবলমাত্র চিন্তার বা ইচ্ছার বিষয়, যা সভ্য জগতের বৈশিষ্ট্য এবং সভ্য সমাজে বস্তুগত মূল্যেরই প্রাধান্য, তার প্রতি যে ঘৃণা তা যেন অসভ্যজাতি ও উদ্বায়ুদের ক্ষেত্রে, যা আত্মিক সম্পদে পূর্ণ, সেখানেও না চাপিয়ে দিই সে সম্বন্ধে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

এখানে আমাদের নিশ্চিতরূপে একটি রায় দিতে হবে এবং সে কাজটা সত্যিই সহজ নয়। কিন্তু যে পার্থক্য অন্যদের কাছে খুব মৌলিক আমাদের বিচারে তা বিষয়-বস্তুর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে স্পর্শ করে না, এই কথা স্বীকার করেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। অসভ্য মানুষ যদি ইচ্ছা ও আবেগের মধ্যে বাস্তবের পূর্ণমূল্য পেয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মান অনুযায়ী তাকে সংশোধন না করে সেই ধারণাকে অনু-সরণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু সে ক্ষেত্রে উদ্বায়ুর আদিরূপ, যা থেকেই এই সন্দেহের উৎপত্তি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের আরো সতর্কতার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। এ ধারণা সত্য নয় যে অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ততার চাপে পীড়িত আজকের অনুকর্ষী-উদ্বায়ুগ্রস্তরা কেবলমাত্র প্রলোভনের মানসিক অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করে এবং যে আবেগ তারা অনুভব করেছে মাত্র তার জন্যই নিজেদের শাসন করে। একটি ঐতিহাসিক বাস্তবও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এইসব ব্যক্তিদের শিশুকালে দুষ্ট আবেগ ছাড়া আর কিছু ছিল না, এবং তাদের শিশুসুলভ অক্ষমতার মধ্যেই সেই আবেগের যতটা সম্ভব, ততটা তারা কাজে পরিণত করেছে। এইসব অতি ভাল মানুষদের প্রত্যেকের জীবনে শিশুকালীন একটি দুষ্ট পর্যায়কাল এবং অগ্রদূত হিসাবে একটি বিকৃত কাম পর্যায় ও পরবর্তীকালে একটি অতি নৈতিক-তার উৎস ছিল।

যদি আমরা ধরে নিই যে, আদিম মানুষের ক্ষেত্রে মনঃবাস্তব, যার গঠন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, ও প্রকৃত-বাস্তব প্রাথমিক অবস্থাতেই সংযুক্ত হয়ে গেছে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি অনুসারে, ঐ অসভ্য লোকেরা যা করতে চেয়েছিল তা তারা প্রকৃতই করেছিল, তাহলে অসভ্যলোক ও উদ্বায়ুদের মধ্যে সাদৃশ্য আরো মৌলিকরূপে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু উদ্বায়ুদের সঙ্গে তুলনার দ্বারা আদিম লোকদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যেন প্রভাবিত না হয়। পার্থক্যের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। অবশ্য চিন্তা ও কাজের মধ্যে যে স্পষ্ট পার্থক্য আমরা করে থাকি, কি অসভ্যদের ক্ষেত্রে, কি উদ্বায়ুদের ক্ষেত্রে, কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। উদ্বায়ুরোগী সর্বোপরি সর্বকর্মে বাধাগ্রস্ত ; তার কাছে চিন্তাই সমস্ত কর্মের প্রতিকল্প। আদিম মানুষ বাধাগ্রস্ত নয়। তার ক্ষেত্রে চিন্তা প্রত্যক্ষভাবে কার্যে পরিণত হয়। তার কাছে কাজই বলতে গেলে চিন্তার প্রতিকল্প। এবং সেইজন্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে, সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণাদি দিতে না পারলেও আমরা সঙ্গত ভাবেই ধরে নিতে পারি যে, "শুরুতে ছিল কাজ।"

পরিভাষা

অগ্রজ্ঞান anticipation
অচিৎ material
অজাচার incest
অজ্ঞাত unconscious
অজ্ঞানবাদ agnosticism
অতিকথা myth
অতিপ্রজনন overpopulation
অতিপ্রাকৃত supernatural
অতিরেক redundancy
অতীন্দ্রিয় mystic
অদ্বৈতবাদ monism
অধঃখনন undermining
অধিকর্মা superintendent
অধিবিদ্যা metaphysics
অধিষ্ঠান inherence
অধ্যাস illusion
অনন্ত infinite
অনবচ্ছেদ continuity
অনবস্থা instability
অনির্দিষ্ট indefinite
অনীশ্বরবাদ atheism
অনীহা apathy
অনুকম্পা compassion
অনুকর্ষী বায়ু compulsive neurosis
অনুকল্প alternative
অনুকাঙ্ক্ষা longing
অনুবর্তী consequent
অনুভূতি feeling
অনুমানবাক্য syllogism
অনুমিতি inference
অনুষঙ্গ association
অন্বয় aggrement
অপজাত degenerated
অপনয়ন elimination
অপরোক্ষ direct
অপেরণ observation
অপ্রতিসম assymetry
অপ্রতিসাম্য assymetrical
অপ্রধান minor
অপ্রাসঙ্গিক irrelevant
অবক্ষয় decadence
অবচয় depreciation
অবতার incarnation
অবদমন repression
অবধি limit
অবমতি contempt
অবরোহ deduction
অবহার armistic
অবিরুদ্ধ compatiable
অবেক্ষণ observation
অবেদন anaesthesia
অব্যবহিত immediate
অভয়পত্র selfconduct
অভিক্রান্তি displacement
অভিক্ষেপ projection
অভিপ্রয়াণ migration
অভিপ্রায় design
অভিব্যক্তি evolution
অভিভাবন suggestion
অভিযোজন adaptation
অভেদ identity
অভ্যাস habit
অমূল প্রত্যক্ষ hallucination
অযৌন asexual
অলোকদৃষ্টি clairvoyance
অল্পতম minimum

অসংগতি inconsistence
অন্তর্জ্ঞান the unconscious
অন্তর্দর্শন introspection
অন্তর্মুখী afferent
অসমত্ব heterogeneous
অসূয়ক cynic
অসূয়া jealousy, envy
অস্মার amnesia
অস্মিতা pesonality
অস্বভাবী abnormal
অহম ego (egoism)
অহমিকা egotism

আকস্মিক causal
আকস্মিকতা chance
আকার from
আতঙ্ক phoiba
আত্তীকরণ assimilation
আত্মসুখ subjective
আদর্শ ideal
আদিরূপ archetype
অদ্যোপলীয় eolethic
আধিবিদ্যক metaphysical
আনুষঙ্গিক accessary
আন্তর inner
আপতন accident
আপাত apparent
আপেক্ষিকতা relativity
আবাসিক resident
আবেগ impulse
আবেশ obsession
আভা tint
আরোপ imputation
আরোহ induction
আসংজ্ঞান the subconscious
ইচ্ছা wish
করণতা instrumentality
ইচ্ছাস্বাতন্ত্র frcewill
ইন্দ্রজাল magic
ইন্দ্রিয়স্থান senseorgan

ঈর্ষা envy, jealousy
ঈশ্বরবাদ deism, thcism
উৎকণ্ঠা anxiety
উৎকাঙ্ক্ষা aspiration
উৎপত্তি origin
উৎপাদ output
উত্তরলব্ধি inheritence
উদ্দীপক stimulus
উদ্দেশ্যবাদ teleology
উদ্‌গতি sublimation
উদ্‌বংশীয় ancestor
উদ্‌বর্তন survival
উদ্‌বায়ু neurosis
উপক্রান্ত incipiant
উপগম indunction
উপজাত by-product
উপমা analogy
উপযুক্তি expediency
উপযোগ utility
উপযোগবাদ utilitarianism
উপরতি abstinence
উপলেপ accretion
উপস্থছেদ castration
উভয়বলতা ambivalence

একঘেয়েমি monotony
একাত্মিকরণ identification
একান্বয় monotony

ঐকাহিক ephemeral
ঐতিহ্য mythology
ঐশ divine
নিসর্গভীতি animatism

অন্ধ আবেগ — blind impulse (?)
কল্পনা — imagination
কাণ্ডজ্ঞান — commonsense
[illegible] — aesthetic
[illegible] — aesthetics
[illegible] — sensatory (?)
[illegible] — causality
[illegible] — causal
[illegible] — paradox
[illegible] — emaciated (?)
[illegible] — technique

[illegible] — complex
চরম — maximum
[illegible] — dementia
চ্যুতি — deviation
[illegible] — dipsomania
জড়বাদ — materialism
দিবা স্বপ্ন — daydream
[illegible] — category
জাদু — magic

[illegible] — cognitive (?)
[illegible] — ontology
[illegible] — pessimism
[illegible] — dilated (?)
[illegible] — criminal

দুষ্কৃতী — criminal
দেবত্বারোপ — deification
ধর্মান্ধতা — fanaticism
ধর্ষকাম — sadism
নরত্বারোপ — personification
[illegible] — abstract
নির্জ্ঞান — the unconscious

[illegible] — purification
[illegible] — bias
[illegible] — stimulate (?)
[illegible] — [illegible]
[illegible] — insight
[illegible] — consequence
[illegible] — attitude (?)
[illegible] — auditory (?)
পরিপূরক — complementary
[illegible] — linguistic (?)
[illegible] — mutual equality
[illegible] — emotion
[illegible] — substitute
[illegible] — substitution
[illegible] — equation
[illegible] — reaction, response (?)
[illegible] — reflex (?)
[illegible] — alienation (?)
[illegible] — image
[illegible] — symmetry
প্রতীক — symbol
[illegible] — concept
[illegible] — regression
[illegible] — pragmatics (?)
[illegible] — pragmatism
[illegible] — amplification (?)
[illegible] — projection (?)
[illegible] — intuition (?)
প্রেষণা — motivation
[illegible] — immolation
[illegible] — equivocation
বাধা — inhibition
[illegible] — inhibited
[illegible] — resistance
[illegible] — psycho-neurosis

[illegible] premonition
[illegible] sadism
[illegible] analysis
[illegible] dissociation
[illegible] fetish
[illegible] [illegible]
[illegible] paranoia
[illegible] fragmentation

মন psyche
[illegible] psychic reality
[illegible] psychoanalysis
[illegible] psychology
[illegible] masochism
[illegible] mental science
[illegible] illusion
[illegible] interaction
[illegible] [illegible]
[illegible] rationalisation
[illegible] rationalism
[illegible] [illegible]
[illegible] sexual
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] libido

[illegible] identity
[illegible] identification
[illegible] self
[illegible] complexity
[illegible] conscience
[illegible] chance
[illegible] [illegible]
[illegible] sensory organ
[illegible] sensation
[illegible] hypnosis, hypnotism
[illegible] conscious
[illegible] reality
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] sociology
[illegible] union
[illegible] [illegible]
[illegible] congenital
[illegible] conditional
[illegible] theory
[illegible] affinity
[illegible] mechanism
[illegible] [illegible]
[illegible] self supporting
[illegible] inferiority complex